স্মৃতি-বিস্মৃতি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SMRITI-BISMRITI
(Glimpses of boyhood reminiscences of books and authors)
by Professor ARUN KUMAR MUKHOPADHYAY
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৫৯

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-গ্রন্থন : অনুপম ঘোষ। পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

রেণু, শুভা, শান্তা

বরুণ, অজয়, অশোক, অমিত —

আমার ভাইবোনদের

হাতে দিলাম

সূচীপত্র

কথারম্ভ

উনিশ শ' সাতষট্টির এপ্রিল। ঘাম-ঝরানো রৌদ্র-দগ্ধ দমদম অ্যারপোর্ট থেকে যখন জামেয়ারের ডাকোটা প্লেন ছাড়ল তখন পিছনে ফেলে-যাওয়া কলকাতার জীবন সম্পর্কে আমার যতটা ছিল বেদনা, ততটাই ছিল গন্তব্যস্থান সম্পর্কে আগ্রহ। দুঘণ্টা একটানা আকাশপথে ওড়বার পর সদ্য-পরিচিত সহযাত্রী বললেন, বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, এসে গেল কোচবিহার। পাঁচ হাজার ফুট উপর থেকে প্লেন ক্রমশই নীচে নামছে। চোখে পড়ল এলায়িত বালুশয্যায় শায়িত পাহাড়ী নদী, বিস্তৃত রিক্ত খেত, ঘন সবুজ অরণ্য। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে দেখছি --- এলেম নতুন দেশে। গর্জন করে ডাকোটা যখন কোচবিহার শহরের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে অ্যারপোর্টের দিকে, তখনই আমার মন বিস্ময়ে আনন্দে চীৎকার করে বললে -- 'এ কী দেখছি! এ তো নতুন নয়, পুরনো!' কতোকাল আগে দেখা সব-ছবি মনের কোন গহন স্তর থেকে উঠে এলো। একটুও মলিন হয় নি, নষ্ট হয় নি সেই-সব ছবি। চোখের সামনে যে-সব ছবি দেখছি -- লাল টালি-ছাওয়া বাঁশের বেড়া-দেওয়া বাড়ি, উত্তরবঙ্গের চাষী, পথ-চলতি মানুষ, সুপারি কাছ আর চা-বাগানের সারি। তোর্সা আর তিস্তা, ধরলা আর মানসাই নদী --- এ সবই তো আমার চেনা। মুহূর্ত-মধ্যে তিরিশ বছর পেরিয়ে গেলাম। অ্যারপোর্টে যখন নামলাম তখন আর কোনো সংশয় নেই, অনুভব করলাম -- আমি ফিরে এসেছি আমার শৈশবের স্বর্গলোকে। মনে মধ্যে একটি শিশু আনন্দে তখন চীৎকার করে উঠছিল -- 'রংপুর, রংপুর, আমার ফিরে-পাওয়া রংপুর!' সত্যি তাই! হু-হু করে কালস্রোতে উজান বেয়ে রংপুরে ফিরে গেলাম। অ্যারপোর্টের বাইরে যে গাঢ় সবুজ রেন্‌-ট্রি, সুপারি গাছ, আর টিন-ছাওয়া বেড়া-দেওয়া বাড়ি দেখছি, সে-সবই তো আমার খুব পরিচিত। বিস্মৃতির পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলো আরো কতো পরিচিত দৃশ্য। স্মৃতির সরণি বেয়ে চলে গেলেম শৈশবের হাসি-কান্নায় রঙীন দিনগুলিতে। রংপুরের সেই উদার নীল আকাশ, বর্ষণ ধৌত আকাশের গায়ে ফুটে-ওঠা কাঞ্চনজঙঘা, সেই সুপারি-জলপাই গাছের সারি, সেই বিস্তৃত প্রান্তর, সেই জেলাবোর্ডের উঁচু সড়ক --- সব একসঙ্গে ফিরে পেলাম। ফিরে পাওয়া জীবনের, সেই আনন্দময় শৈশবের স্বাক্ষর রইল এই বইখানিতে।

হাসিখুশি

স্মৃতি বড়ো স্বৈরাচারী। সে যে কাকে রাখে আর কাকে ফেলে তার হিসেব পাই না। কেন যে তুচ্ছ একটি গানের কলি মনে থাকে, আর দরকারী তথ্য ভুলে যাই তা বলা কঠিন। মন যেন সমুদ্রসৈকত। কত যত্ন করে বালির মন্দির তৈরি করলাম, পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড ঢেউ এসে সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি, সব ধুয়ে গেছে, কিন্তু কটি শাদা ঝিনুক বালির বুকে গাঁথা রয়েছে।

তাই বলছি স্মৃতি বড়ো স্বৈরাচারী। সেদিন আমার এক লেখকবন্ধুর একটি বই পড়ছিলাম। পাতা উল্টাতে উল্টাতে দেখি তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :

"স্মৃতি যেন কণ্ঠলগ্না প্রেয়সী। প্রেয়সীর আদরে অবিমিশ্র সুখ থাকে না। সুখ ও দুঃখ, এই দুই ধারার মিলনে সেখানে নোনা জলের ধারাও গড়িয়ে আসে। স্মৃতিও তেমনি। এমন কি, কণ্ঠলগ্না হয়েও তীব্র দহন সময়ে সময়ে অনুভব করি আমরা। তবুও স্মৃতি বিনা প্রাণ বাঁচে না।"

মন বললে, ঠিক ঠিক। কিন্তু স্মৃতিকে কণ্ঠলগ্না প্রেয়সী বলে ভাবতে হলে সাহস দরকার। 'কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনী' — ওরে বাবা, এতটা কি সইবে! তার চেয়ে স্মৃতি পলাতকা, সুন্দরী, মোহিনী, — একথা ভাবতে পারি।

এই কথা যখন ঘরে বসে লিখছি তখন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। জলের ছাট এসে পড়ছে ঘরে। পর্দা ভিজিয়ে দিচ্ছে। তবু উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না। বাইরের দিকে তাকালে অঝোর ধারাবর্ষণের ফাঁকে ফাঁকে ধূসর আকাশকে দেখতে পাচ্ছি, দেখছি, কালো কালো মেঘ দ্রুত ছুটে চলেছে। দেখতে দেখতে মনে হল, হু হু শব্দে স্রোতের উজান বেয়ে আমার অতিক্রান্ত শৈশবে ফিরে যাচ্ছি।

সামনে জল আর জল, বাগান আর পথ জলমগ্ন। দূরে উঁচু সড়কটা জেগে আছে। উত্তরবঙ্গের বৃষ্টি আরম্ভ হলে আর থামতে চায় না। রংপুর। এই শব্দটা শুনলেই উত্তরবঙ্গের একটি স্থানের কথা মনে পড়ে : আলমনগর। সেই সঙ্গে শৈশবের অসংখ্য স্মৃতি ভিড় করে আসে। সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধে হয়ে গেছে। ভৃত্য দেবশরণ ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছে। টানা বারান্দায় আমরা তিন ভাই বোন ছুটোছুটি করছি। বাবা গেছেন কলেজের সান্ধ্যক্লাবে। মা রয়েছেন রান্নাঘরে। আমরা মনের আনন্দে ছায়ালোকিত বারান্দায় ছুটে বেড়াচ্ছি। এমন সময় রঙ্গস্থলে মায়ের আবির্ভাব। আমাদের শান্ত করার অব্যর্থ ওষুধ মায়ের জানা ছিল। বললেন, 'এদিকে আয়, আজ 'হাসিখুশি' পড়ে শোনাব।'

বাইরে তখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। অন্ধকার জগৎ। ঘরের মাঝে হারিকেন আর শেজ জ্বলছে। আমরা ছোট্ট তিনজন — তিন ভাই বোন মায়ের মুখে ছড়া শুনছি। 'হাসিখুশি'র ছড়া শুনেই শিশুচিত্তের প্রথম উদ্বোধন।

শৈশবের সোনালী দিনগুলির কথা মনে পড়লে রংপুরের কথা মনে পড়ে, আর প্রথম

সাহিত্যাস্বাদের কথা ভাবলে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি'র কথা মনে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, তখন লেখকের নাম জানতাম না, কেবল বইটার কথাই জানতাম। ওটি আমার শৈশবের মেঘদূত। রংপুরের বৃষ্টি আর শৈশবের সাহিত্যাস্বাদের সঙ্গে 'হাসিখুশি' অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এমন বই আর হয় নি, হবে না।

অ'য় অজগর আসছে তেড়ে।
আমটি আমি খাব পেড়ে।।
ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে।
ঈগল পাখি পাছে ধরে।।

এই ছড়া আমরা তিন ভাই-বোনে মায়ের সঙ্গে আওড়েছি। মা মুখস্থের পরীক্ষা নিতেন, আমরা অনর্গল আবৃত্তি করে যেতাম।

এখন ভেবে দেখি, সেদিন 'হাসিখুশি' আমাদের মনোহরণ করে ছিল কিসের জোরে! ভাববৈচিত্র্যে? উদ্ভাবনকৌশলে? চমকপ্রদ ছন্দে? না, চকচকে ছবিতে? কিছুতেই না। 'হাসিখুশি' আমাদের মনোহরণ করেছিল তার প্রাণ-সম্পদে, তার সরল আন্তরিকতার জোরে, তার শৈশবে। মনে হয় 'হাসিখুশি' বইটার চরিত্র সবুজ। কিশলয়ের সবুজ, শৈশবের সবুজ, প্রথম প্রেমের সবুজ। শৈশবের সোনালী দিন তার সমস্ত সবুজ রং আর সুদূর ব্যাকুলতা নিয়ে আমাদের সামনে সেদিন দেখা দিয়েছিল। তার নাম 'হাসিখুশি'।

মায়ের মুখে যখন 'হাসিখুশি'র ছড়া শুনতাম, তখন তা মাতৃকণ্ঠে নবজন্ম লাভ করত। স্পষ্ট মনে পড়ছে, বর্ষার সন্ধ্যায় ঘরে হারিকেনের আলোয় বা শীতের দুপুরে অন্দরের বারান্দায় মায়ের কাছে এইসব ছড়া শুনেছি।

টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল,
ঠাকুরদাদার শুকনো গাল।

ছড়া শুনে খুব কৌতূহল হয়েছিল। রংপুরের কারমাইকেল কলেজ এলাকায় তখন মাঠ ঘাট জঙ্গলের অভাব ছিল না। এক দুপুরে আমি আর আমার বোন চুপিচুপি উঁচু সড়কের উত্তরদিকে মাঠে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম টিয়াপাখির ঝাঁক। আশ্চর্য! কি আশ্চর্য।

আমার বোন রেণু বললে, 'দেখ দাদা, টিয়াপাখির ঠোঁটটি লাল। ঠিক মিলেছে।'

সেই আবিষ্কারের আনন্দে সেদিন আমরা দুজন মশগুল হয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে বকুনির ভয় সত্ত্বেও মা'কে বলেছিলাম জানো মা, আজ দেখলাম, সত্যি সত্যি টিয়াপাখির ঠোঁটটি লাল।

শুনে মা হেসেছিলেন।

আর প্রশ্ন করেছিলাম, ঠাকুরদাদার শুকনো গাল কী করে দেখব? শুনে মা গম্ভীর হয়েছিলেন।

বলেছিলেন. তা আর দেখতে পাবে না।

পরে বুঝেছি, ঠাকুরদা আমার জন্মের বহু পূর্বেই লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এ যাত্রা আমার দেখা হল না। ঠাকুরমাকে দেখেই তাঁকে না দেখার ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে হয়েছে।

'হাসিখুশি' কি খুব রঙীন ছিল? মোটেই না. একরঙা। তা হরেক রকম রঙের মিশ্রণে চকমকে ঝকমকে একালীন শিশুতোষ বই নয়। তবু সে-বই আমাদের মনোহরণ করেছিল। বোধ করি যোগীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেই ছবি ছিল, তাই আলাদা করে তাকে ছবি ছাপতে হয় নি।

কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি।
খেঁকশিয়ালি পালায় ছুটি।।
গরু বাছুর দাঁড়িয়ে আছে।
ঘুঘুপাখি ডাকছে গাছে।।

যোগীন্দ্রনাথ শিশুমনোরঞ্জনের অব্যর্থ দাওয়াই আবিষ্কার করেছিলেন। চিড়িয়াখানার দরজা খুলে দিয়েছিলেন। রংপুরের মাঠে ঘাটে ঠোঁটলাল টিয়াপাখি, ছুটন্ত খেঁকশিয়ালি আর দাঁড়িয়ে থাকা গোরু-বাছুরের অভাব ঘটেনি। আবিষ্কারের আনন্দে 'হাসিখুশি'কে কী ভালই লেগেছিল। কাঠের ব্লকে এক-রঙা কালিতে ছাপা ঐ সব ছবির পাত্রপাত্রী-বিবরণ দৃশ্যকে আমরা চোখের সামনে আবিষ্কার করেছিলাম।

বস্তুতঃ 'হাসিখুশি'র সরলতা, হার্দ্যতা, প্রত্যক্ষতা আমাদের মনকে লুঠ করে নিয়েছিল। এই বইতে আমরা প্রথম সাহিত্যাস্বাদ পেয়েছিলাম।

ধোপা কেমন কাপড় কাচে।
নাপিত ভায়া দাড়ি চাঁচে।

জীবজন্তুর জগৎ থেকে যোগীন্দ্রনাথ মানবজগতে নিয়ে এলেন। রংপুরে সেই শৈশবে দেখেছিলাম. কাপড়ের বিরাট বোঁচকা নিয়ে ধোপা আসত সপ্তাহে একদিন। আর প্রতি রবিবার সকালে হারু নাপিত আসত ক্ষৌরকর্মের সন্ধানে। তাকে দেখে আমরা 'নাপিত ভায়া দাড়ি চাঁচে' বলে অভ্যর্থনা করতাম. প্রত্যুত্তরে সে মুচকি হাসি হাসত।

এইভাবে আমাদের শৈশবের জগৎ গড়ে উঠেছিল। বাহির বিশ্বের সঙ্গে, বিচিত্রের সঙ্গে, রূপময় জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল 'হাসিখুশি'। তার দৃশ্যতাগুণ, তার অন্তরঙ্গ হার্দ্য কণ্ঠস্বর, তার অন্তরঙ্গ-পরিবেশ, তার সরল আন্তরিকতা. তার হাসি — সবটা মিলিয়ে 'হাসিখুশি' আমাদের ছেলেবেলার সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। আমরা তিন ভাই-বোন যখন ছুটোছুটি করে বারান্দায় বা বাগানে খেলতাম তখন অলক্ষ্যে চতুর্থ সঙ্গী খেলায় যোগ দিত। তার নাম 'হাসিখুশি'। শৈশবের প্রতিটি মুহূর্তে তার ছিল আনন্দময় উপস্থিতি। সে হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য সঙ্গী। তাই সেদিন মায়ের কাছে সাহিত্যের প্রথম পাঠ আমরা নিয়েছিলাম. বর্ণপরিচয়ের বিভীষিকায় আমরা

আঁতকে উঠি নি। চোখের জলে নয়, মনে আনন্দে আমাদের বর্ণপরিচয় হয়েছিল।

আজ বহু দিনের ওপার হতে সেই পুরনো বৃষ্টিধারা 'হাসিখুশি'কে ফিরিয়ে নিয়ে এল। দেখলাম সে বর্ষাধৌত সবুজ পাতার মতই সবুজ, টিয়াপাখির ঠোঁটের মতোই লাল। আমের মতোই রসালো। সে চিরকালের।

ঠাকুরমার ঝুলি

আমি যখন শৈশবের স্বর্গলোক রংপুরে রূপকথার গল্প পড়েছি, তখন এই চিরনবীন রূপকথাব লেখকের নাম সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। পরে জেনেছি তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তখন মনে মনে এই বাসনা পোষণ করেছি, একবার এই জাদুকরের সঙ্গে দেখা করব। উত্তরবঙ্গ ছেড়ে যখন পশ্চিমবঙ্গে এসেছি তখন এই বাসনা মাঝে মাঝে আমাকে খোঁচা দিয়েছে। তারপর যা হয়, নানা স্রোতের ভিড়ে সেই ভীরু বাসনার ধারটি অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেদিন যখন এক বন্ধুর মুখে শুনলাম, দক্ষিণারঞ্জন তাঁরই পিসেমশায় এবং তাঁদেব অঞ্চলেই থাকেন, তখন আব সুযোগ নেই, বড় দেরী হয়ে গেছে, দক্ষিণারঞ্জন ইহলোক ছেড়ে গিয়েছেন।

এখন অনেক সময় ভাবি, দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে দেখা না করে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। অথবা, এ বোধ হয় ভালই হয়েছে। আমার শৈশবের জাদুকর বাস্তবের দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে না-ও মিলতে পারেন।

দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় রংপুরে। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমরা তখন পড়তে শিখেছি। তিন ভাই-বোনে রূপকথার কল্পলোকে যাত্রা করতাম। সে ছিল এক আনন্দের দিন।

রংপুরের সেই উদার আকাশ, খোলা মাঠ, সেই সুরকিরাঙা সড়ক, সেই প্রাসাদোপম কারমাইকেল কলেজ, আর বৃত্তাকারে সজ্জিত বাগান ঘেরা অধ্যাপক-নিবাসগুলি, আর কোনো নির্মেঘ শরৎ-প্রভাতে সুনীল গগন-পটে দেখা' এক আশ্চর্য ছবি — অভ্রভেদী কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিখর -- এরই মাঝে রূপকথার স্বপ্নলোকে ছিল আমাদের যাত্রা। সহৃদয়া প্রতিবেশিনীদের কল্যাণে জেনেছি, অরুণ-বরুণ-কিরণমালা : এই নামই আমাদের হওয়া উচিত ছিল। শুনে মা হাসতেন। শুনে আমি অবাক হতাম। আর কী আশ্চর্য, একদিন 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'তে এই তিনটি ভাইবোনকে 'কিরণমালা' রূপকথায় আবিষ্কার করলাম।

সেই আবিষ্কারের মূল্য যে কতখানি তা সেদিন স্পষ্ট বুঝি নি, কেবল খুশিতে মন ভরে উঠেছিল। আজ বুঝি, সাহিত্যপাঠের সবচেয়ে বড় পুরস্কার আর আনন্দ আমি সেদিনই

পেয়েছিলাম। সাহিত্যে রূপায়িত চরিত্রের সুখ দুঃখ ভাবনার সঙ্গে একাত্মীভূত হতে পেরেছিলাম। সাহিত্যপাঠের এই তো পরমা প্রাপ্তি।

এই প্রাপ্তিতে সাহায্য করেছিলেন, 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। এই কারণে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এ জীবনে অনেক গল্প, কাহিনী, উপন্যাস পড়েছি এবং ভুলে গেছি। কিন্তু ঠাকুরমা'র ঝুলির সব ক'টি রূপকথা মনে আছে। 'কলাবতী রাজকন্যা', 'ঘুমন্ত পরী', 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা', 'সাত ভাই চম্পা', 'শীত-বসন্ত', 'কিরণমালা', 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার', 'পাতাল-কন্যা মণিমালা', 'সোনার কাঁটা রুপার কাঁটা', 'শিয়াল পণ্ডিত', 'সুখ আর দুঃখ', 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী', 'দেড় আঙ্গুলে' — এই চোদ্দটি রূপকথা পড়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, তা অন্যত্র দুর্লভ।

রূপকথা আমি শুনেছি আমার মায়ের মুখে, ঠাকুরমার মুখে, ভৃত্য দেবশরণের মুখে, আর পড়েছি দক্ষিণারঞ্জনের অমর গ্রন্থ 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'তে।

এই সব গল্প শোনার বা পড়ার যথার্থ লগ্ন সন্ধ্যাবেলা। রংপুরের সেই সব শীত-সন্ধ্যা ও বর্ষা-সন্ধ্যায় এই সব গল্প শুনতে শুনতে আমরা ভাইবোনে চলে যেতাম ময়ূরপঙ্খী না'য়ে চড়ে দুধ সাগরে, বুদ্ধ-ভুতুমের সঙ্গী হয়ে গভীর অরণ্যে, হাড়ের কড়ির পাহাড় পেরিয়ে ঘুমন্ত রাজপুরীতে নিদ্রিত রাজকন্যার পালঙ্কের পাশে, খোক্কসপুরীতে নীলকমল লালকমলের সঙ্গী হয়ে।

এই গল্প শোনার মানসিক পরিবেশ আর সাহিত্যস্বাদের কথা আজ বিচার করে দেখি। কিন্তু সেদিন, শৈশবের সেই চিরন্তন স্বর্গলোকে বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ ছিল না। দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা স্নেহময়ী মায়ের মুখে তখন ভাষারূপ ধারণ করে শিশু-শ্রুতিতে অমৃত বর্ষণ করত। অপাপবিদ্ধ কৈশোরের সোনালী দিনগুলি যখন পিছনে ফেলে এসেছি, তখন অবিষ্কার করলাম ঠাকুরমা'র ঝুলির ভূমিকা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। আজ সেই ভূমিকা পড়ে শৈশবের সাহিত্যস্বাদ আর তার স্রষ্টা দক্ষিণারঞ্জনের কৃতিত্বের মূল্য অনুভব করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়ে অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য-পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাঙ্গলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশের চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

অতএব বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নয় — সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে

প্রবেশ করিয়া তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।''

এই স্নেহক্ষরা সুধামাখা মাতৃকণ্ঠের শিল্পী দক্ষিণারঞ্জন।

কবি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ''দক্ষিণাবাবুকে ধন্য। তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।''

গ্রন্থকারের নিবেদনে (ভাদ্র ১৩১৪) দক্ষিণারঞ্জন তাঁর শৈশবানুভূতি আর শিল্পবোধকে অনবদ্য ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

''এক দিনের কথা মনে পড়ে, দেবালয়ে আরতির বাজনা বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, মা'র আঁচলখানির উপর শুইয়া রূপকথা শুনিতেছিলাম।

'জ্যোচ্ছনা ফুল ফুটেছে,' মা'র মুখের এক একটি কথায় সেই আকাশ-নিখিল-ভরা জ্যোৎস্নার রাজ্যে জ্যোৎস্নার সেই নির্মল শুভ্র পটখানির উপর পলে পলে, কত বিশাল 'রাজ-রাজত্ব', কত 'অচিন্ অভিন্' রাজপুরী, কত চিরসুন্দর রাজপুত্র রাজকন্যার অবর্ণনীয় ছবি আমার শৈশবচক্ষুর সামনে সত্যকারটির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সে যেন কেমন--- কতই সুন্দর! পড়ার বইখানি হাতে নিতে নিতে ঘুম পাইত, কিন্তু সেই রূপকথা তা'রপর তা'রপর করিয়া কত রাত জাগাইয়াছে! তা'রপর শুনিতে শুনিতে শুনিতে, চোখ বুজিয়া আসিত— সেই অজানা রাজ্যের সেই অচেনা রাজপুত্র সেই সাত সমুদ্র তের নদীর ঢেউ ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত,— আমার মত দুরন্ত শিশু! — শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।''

স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পী 'নিবেদনে'র শেষে বলেছেন,

''শরতের ভোরে ঝুলিটি আমি সোনার হাটের মাঝখানে আনিয়া দিলাম। — জ্যোৎস্নাবিধৌত স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আরতিবাদ্য বাজিয়াছে। এ সুলগ্নে যাঁদের ঝুলি, তাঁদের কাছে দিয়া—বিদায় হইলাম।''

দক্ষিণারঞ্জনের রূপকথার জগৎ শরতের ভোর ও জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ। একটি শান্ত কোমল স্নিগ্ধ প্রাচীন সরলতাযুক্ত জগৎ এই রূপকথার জগৎ।

'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র সূচনায় দক্ষিণারঞ্জন উৎসর্গপত্রে একটি অপূর্ব কবিতা লিখেছেন বাংলার শিশুদের উদ্দেশে—

হাজার হাজার রাজপুত্র রাজকন্যা সবে
রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল কবে।
হাঁউ মাঁউ কাঁউ শব্দ শুনি রাক্ষসেরি পুর—
না জানি সে কোন্ দেশে না জানি কোন্ দূর!
নতুন বৌ! হাঁড়ি ঢাক,' শিয়াল পণ্ডিত ডাকে,---

হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা কোন্ রানীদের পাপে?
তোমাদেরি হারাধন তোমাদেরি ঝুলি
আবার এনে ঝেড়ে দিলাম সোনার হাতে তুলি!
ছেলে নিয়ে মেয়ে কাজে কাজে এলা,—
সোনার শুকের সঙ্গে কথা দুপুর সন্ধ্যাবেলা।
দুপুর সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মি! ঘুম যে আসে ভুলি'!
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্
সুবাস কুম কুম্
ঘুমের রাজ্যে ছড়িয়ে দিও
ঠাকুরমা'র এ ঝুলি।

এই চিরনবীন প্রাচীন সরলতাযুক্ত মাতৃস্নেহভরা 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' আমার শৈশবের স্বর্গলোকের চাবিকাঠি।

যে রূপকথাটি আমরা তিন ভাইবোন নামসাদৃশ্যে আপন করে গ্রহণ করেছিলাম, তার নাম 'কিরণমালা'।

নদীর ঘাটে স্নানার্থী নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ পর পর তিন বছরে মাটির ভাঁড়ে সদ্যোজাত দুটি শিশুপুত্র একটি শিশুকন্যাকে দেবতার আশীর্বাদরূপে পেয়েছিলেন।

"খাওয়া নাই, নাওয়া নাই, ব্রাহ্মণ দিন রাত ছেলে মেয়ে নিয়া থাকেন। ছেলে দুইটির নাম রাখিলেন, — অরুণ, বরুণ, আর মেয়ের নাম রাখিলেন, —কিরণমালা।

দিন যায়, রাত যায়— অরুণ বরুণ কিরণমালা চাঁদের মতন বাড়ে, ফুলের মতন ফোটে। অরুণ বরুণ কিরণের হাসি শুনিলে বনের পাখী আসিয়া গান ধরে, কান্না শুনিলে বনের হরিণ ছুটিয়া আসে। হেলিয়া দুলিয়া খেলে— তিন ভাই-বোনের নাচে ব্রাহ্মণের আঙ্গিনায় চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া পড়িল।"

এই বর্ণনা পড়ে রংপুরের তিনটি কিশোর-কিশোরী নিজেদের খেলাঘরের সঙ্গে অরুণ-বরুণ-কিরণমালার খেলাঘরকে মিলিয়ে নিয়েছিল। সেদিন কোথাও ছিল না বাধা, ছিল না নিষেধ, সেদিন কোথাও তাদের 'হারিয়ে যাবার নেই মানা।'

তারপর আপন পিতা রাজার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎকার। অরুণ বরুণ অরণ্যে অট্টালিকা বানায়, দেখে চমক লাগে। এক রাহী সন্ন্যাসী তা দেখে বলেন—

বিজন দেশের বিজন বনে কে-গো বোন ভাই?—
কে গড়েছ এমন পুরী, তুলনা তার নাই!

অট্টালিকা থেকে অরুণের উত্তর—

নিত্য নূতন চাঁদের আলো আপনি এসে পড়ে,
অরুণ বরুণ কিরণমালা ভাই-বোনটির ঘরে।

তারপর সন্ন্যাসীর কথায় অরুণের মায়াপাহাড় যাত্রা, সেখানে অরুণ পাথরে পরিণত

হল। তারপর বরুণের যাত্রা, তারও সেই দশা। শেষে রাজপুত্রের পোষাকধারী সশস্ত্র কিরণমালার যাত্রা। সকল মায়া কাটিয়ে শীতল ঝরনার জলে কিরণমালার সাহসে পাথরে পরিণত বহুযুগের বহু রাজপুত্র আবার মানুষে পরিণত হলেন. ভাইবোনে মিলন হল। মাথার উপর সোনার পাখী বলল,—

অরুণ বরুণ কিরণমালা
তিনটি ভুবন করলি আলা!

তারপর অপরিচিত পিতা রাজাকে নিমন্ত্রণ ও সোনার পাখীর সত্য-উদ্ঘাটন।

রাজা অবাক, তিন ভাইবোন অবাক। সোনার পাখী হারানো সুখকে ফিরিয়ে দিল। দুঃখিনী মা ফিরে এলেন, অনুতপ্ত রাজা পুত্রকন্যা কলত্রকে ফিরে নিলেন। সেই আনন্দের লগ্নে সোনার পাখী গান ধরল,—

অরুণ বরুণ কিরণ,—
তিন ভুবনের তিন ধন।
এমন রতন হারিয়েছিল
মিছাই জীবন।
অরুণ বরুণ কিরণমালা
আজ ঘুচালি সকল জ্বালা।

আমরা তিন ভাইবোনে রুদ্ধশ্বাসে অরুণ-বরুণ-কিরণমালার জীবনকাহিনীকে অনুসরণ করতাম। কোথায় সেই নদীর ঘাট, অরণ্যমাঝে অট্টালিকা, কতদূরে সেই মায়াপাহাড়, সেখানে হীরার গাছে সোনার পাখী, সঞ্জীবনী ঝরণা, ধনুক আর ডঙ্কা, আর অহল্যা-পাথর থেকে আবির্ভূত বহু যুগের বহু রাজপুত্র। এইসব স্বপ্নদৃশ্য আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেত, ঘুমের মধ্যে সঞ্চরণ করে ফিরত, খেলার মধ্যে আবির্ভূত হ'ত। তারপর দুঃখিনী মায়ের চোখের জলে মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে এল, তিনটি শিশু বহুকাল বাদে তাদের মা'কে ফিরে পেল।

"কিরণমালা" গল্প সেদিন আমাদের হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, জীবনকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।

আজ শৈশবের সেই খেলাঘর, সেই রংপুরের উদার প্রান্তর আর আকাশ বহু দূরে ফেলে এসেছি। আমরা তিন ভাই-বোনও আজ আর শৈশবের স্নেহবন্ধনে একত্রবদ্ধ নই। তবু 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' আছে, তা আমাদের বারবার সেই স্নেহস্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তাই দক্ষিণারঞ্জনকে ভুলতে পারি না।

উপেন্দ্রকিশোর

স্মৃতি স্বৈরাচারী, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক। স্মৃতির এক একটা অংশ সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে, চেষ্টা করলেও মনে করতে পারি না। আবার কোনো আকস্মিক মুহূর্তে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি আলোকিত হয়ে ওঠে। এই সত্যের প্রমাণ জীবনে বারবার পেয়েছি।

'ছোট্ট রামায়ণ', 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছোটদের মহাভারত', 'টুনটুনির গল্প'— এই সব মন-কেমন-করা বইয়ের কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল। সেদিন রাঙাদি এসেছিলেন সন্ধেবেলা। অনেকদিন বাদে দেখা। দুজনেই উল্লসিত হয়ে উঠলেম। পরস্পরের সুখদুঃখ জানা অপেক্ষা পুরনো দিনের স্মৃতিচর্চার বিরল সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হলাম। রাঙাদি কে? আমার কেউ না। আত্মীয় না, বন্ধু না , সহকর্মী না। তবে কি? কী তা বোঝানো বড় কঠিন।

আমরা তখন রংপুরে— সেই সাত'শো বিঘে জমির মাঝে প্রাসাদতুল্য কারমাইকেল কলেজ, চারিদিক ঘিরে ছবির মতো বাড়িগুলি— অধ্যাপকদের আবাস। সেই মধুর প্রভাত, সেই সুন্দর সন্ধ্যা, সেই বর্ষা, সেই শীত, এমন আর কোনদিন পেলাম না। সেদিন ছোটদের দলে অবিসংবাদিত নেত্রী ছিলেন এই রাঙাদি। সেদিন রাঙাদির হাসিতে আমাদের আনন্দ, তাঁর বিরাগে আমাদের দুঃখ, তাঁর খুশিতে আমাদের উৎসব। বস্তুত রাঙাদিকে এত ভালো লাগত, তা বলে বোঝাতে পারি না। বসে বসে সেই মধুর স্বপ্নের মতো শৈশবের দিনগুলির কথা দুজনে মনে করছিলেম।

'রাঙাদি', একটু হেসে বলি, 'তোমার মনে পড়ে, তুমি আমাকে কি ভীষণ বকুনি দিতে?'

উত্তরে রাঙাদি হেসে বললেন, 'অসভ্য! আর কত যে আদর করতাম, সে কথা বললে না?'

দুজনেই হাসি। সে হাসির মধ্যে বুঝি-বা একটু বিষাদ, একটু কারুণ্য মেশানো ছিল।

রাঙাদি আমাকে 'টুনটুনির গল্প' বইটা উপহার দিয়েছিলেন। অনেকদিন যত্ন করে রেখেছি। তারপর রংপুর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কালস্রোতের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে বই কোথায় চলে গেছে। রাঙাদিকে দেখে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা সেই সব সুন্দর বইগুলির কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য, এতদিন এদের কথা মনে পড়ে নি। আজ রাঙাদির সাহচর্যে স্বপ্নের দেশের শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর আর তাঁর লেখা বইগুলির কথা স্পষ্ট মনে পড়ে গেল।

রাঙাদির আজ বয়স হয়েছে, সেদিনের সেই দীপ্তি আর নেই। তবু রংপুরে শৈশবপ্রভাতে তাঁকে দেখে যত ভালো লাগত, তার কিছুটা আজো রয়ে গেছে। অতীতের স্রোতে আমাদের দুজনেরই মনের তলায় স্মৃতির শৈবালদলে কোলাহল জেগেছে।

'টুনটুনির গল্পে'র চরিত্রগুলির কথা কি কোনোদিন ভোলা যায়! প্রতিটি চরিত্র স্পষ্ট

হয়ে মনে ফুটে উঠল। বাঘ মামা, বোকা কুমীর, চড়াই, বোকা জোলা, সাতমার পালোয়ান, নরহরি দাস, কেনারাম বিড়াল, টুনটুনি। এই সব চরিত্র কোনদিন কি ভোলা যায়! কুঁজো বুড়ি, পান্তা বুড়ি, মজন্তালি সরকার, পিঁপড়ে আর পিঁপড়ী, সবার উপরে বুদ্ধিমান শিয়ালপণ্ডিত— যে ঝপাং দিয়ে ভতাং করে আর কুমীরকে বোকা বানায়, — এদের কথা ভোলা কঠিন।

রাঙাদি একটু হাসলেন। বললেন, 'তোমার মনে পড়ে সেই সব সন্ধেবেলার কথা। সেই যে আমি বসে 'টুনটুনির বই'-এর গল্পগুলি পড়তাম, আর তোমরা বসে বসে শুনতে আর হেসে একেবারে—'

হাত বাড়িয়ে বাধা দিলাম। বললাম, 'বোলো না, রাঙাদি, বোলো না। আজ ও কথা শুনলে কষ্ট হয়। সেদিন আর ফিরে আসবে না। তুমি গল্প পড়তে আর আমি — আজ বলতে লজ্জা নেই — তোমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। গল্প অবশ্যই শুনতাম, আর সেই সঙ্গে দেখতাম তোমাকে— তোমার চোখে মুখে হাসির দীপ্তি, তোমার কণ্ঠে গল্প কী যে ভালো লাগত।'

রাঙাদি এবার লজ্জা পেলেন। বললেন, 'থাম, প্লিজ, ওকথা আমাকে আর মনে করিয়ে দিও না।'

বসে বসে দুজনে অনেকক্ষণ সেই পুরনো দিনের কথা আলোচনা করলেম। জানি, আজ আর এতে কোনো লাভ নেই। আছে বিষাদ, আছে মন-কেমন-করা ভাব। তবু স্মৃতির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ধরা দিতেই হয়। অনেকক্ষণ গল্প করে রাঙাদি উঠলেন। 'আজ চলি ভাই। তোমার মধ্যে আমি আমার কৈশোরকে, হারানো রংপুরকে ফিরে পাই।' শেষের দিকে হয়ত তাঁর গলা একটু কাঁপল। গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। পথে নেমে রাঙাদি হাত নাড়লেন। হাত নেড়ে জবাব দিলাম। রাঙাদি চলে যাচ্ছেন। দূরে পথের আলোয় তার মূর্তি একবার দেখা গেল, তারপরই অন্ধকারে মিশে গেল।

রাঙাদি চলে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন শৈশবের মধুর স্মৃতি, মন-কেমন-করা দিনগুলি আর উপেন্দ্রকিশোরের সেই সব বইয়ের স্মৃতি। রাঙাদি 'টুনটুনির বই' দিয়েছিলেন। তারপর বাবার কাছ থেকে পেলাম 'ছোট্ট রামায়ণ'। প্রথমটি বাংলাদেশের অমর ছড়ার গদ্যরূপ, দ্বিতীয়টি মহাকাব্যের শিশুতোষ পদ্যরূপ। আহা, কি সুন্দর সেই 'ছোট্টদের রামায়ণ!' মনে হয় উপেন্দ্রকিশোর জাদুবলে শিশুমনে প্রবেশ করেছিলেন, তারপর শিশুরসনায় তাঁর অবিচল অধিষ্ঠান হয়েছিল।

কতদিন আগে রংপুরে সন্ধ্যায় বাবার মুখে শুনেছি, আজো কিছু কিছু মনে পড়ে। সেই সঙ্গে সেই দীর্ঘ বারান্দা, সেই ঘন অন্ধকার,আর আমরা তিন ভাইবোন উৎসুক হয়ে বর্ণনা শুনছি,— সেই ছবিটি ভেসে উঠছে। আশ্চর্য সুন্দর সেই বর্ণনা, কি কোমল সেই আলেখ্য, কি চিত্তহারী সেই গীতিস্পন্দন!

ঘরে ফিরে দুই ভাই না পায় সীতায়
কাতরে কাঁদেন রাম করি হায় হায়।
খুঁজিলেন বনে বনে গুহায় গুহায়,
গোদাবরী তীরে আর যত ঝরণায়।
কোথাও না পান তাঁরা দেখিতে সীতারে,
কেহ নাই, তাঁর কথা জিজ্ঞাসেন যারে।
পরে আইলেন তাঁরা জটায়ু যেথায়,
রয়েছে অবশ হয়ে পড়ে যাতনায়।
রোষেতে বলেন রাম দেখিয়া তাহারে,
'এই দুষ্ট খাইয়াছে আমার সীতারে!
রাক্ষস পাখীর মতো রয়েছে সাজিয়া,
ঘুমায় কেমন দেখ, সীতারে খাইয়া।'
এই বলি তারে রাম যান মারিবারে,
কষ্টেতে তখন পাখী কহিল তাঁহারে,
'মেরে তো আমায় বাপ গিয়েছে রাবণ,
তারপরে তুমি আর মেরো না রে ধন।
পলায়ে গিয়েছে দুষ্ট লয়ে সীতা মায়,
প্রাণ গেল, না পারিনু রাখিবারে তাঁয়।'
জটায়ুরে বুকে লুয়ে দু ভাই তখন,
কাঁদেন কাতর হয়ে শিশুর মতন।
কিন্তু হায়, সেই ক্ষণে প্রাণ গেল তার
কিছুই কহিতে পাখী পারিল না আর।

এই বর্ণনা শুনে সেদিনের শিশুচিত্ত সমবেদনায় ভরে উঠত, চোখে জল আসত, আজ একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

তারপর হাতে পেলাম 'ছেলেদের রামায়ণ' আর 'ছোটদের মহাভারত'। তখন নিজেরাই পড়তে শিখেছি। যে-সব সন্ধেবেলা বাবা ক্লাবে যেতেন আর.মা রান্নার তদারকে ব্যস্ত থাকতেন তখন নিজেরাই বই নিয়ে বসতাম।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই মহাভারতের চেয়ে রামায়ণ শিশুমন বেশি টানত। তার কারণটা এখন বুঝি। সেদিন তা বুঝি নি। না বোঝায় খুব একটা ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করি না।

রামায়ণের সেইসব যুদ্ধকাহিনী পড়তে পড়তে নেশা ধরে যেত। উপেন্দ্রকিশোরের লেখার এমনি গুণ! স্পষ্ট মনে পড়ে, মা ডাকছেন 'তোরা খাবি আয়'— ডাক শুনেও শুনছি না। অশোকবনে হনুমানের সদম্ভ সগর্ব উপস্থিতিতে লঙ্কায় যে বিষম হৈ-চৈ, সে

বর্ণনা শেষ না করে ওঠা যায় না। সেই বর্ণনা আজ নতুন করে পাতা উল্টে দেখছি— মনে পড়ছে সেই সব সন্ধ্যার কথা।

"আমি রামচন্দ্রের অনুচর— কারুকে ভয় করি না।

এই বলিয়া হনুমান বিষম হুপ্-হাপ্, দুপ্-দাপ, চড় চড়, মড় মড় শব্দে অশোক বন ভাঙিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সে সেই বনের এমন দুর্দশা করিল যে, আগুন দিয়া পোড়াইলেও তাহার চেয়ে বেশী হয় না। এইরূপে সমস্ত বাগানটিকে ছারখার করিয়া সে একটি সিংহদরজার উপরে বসিয়া দেখিতে লাগিল, রাক্ষসেরা তখন কি করে।

এদিকে রাক্ষসেরা বন ভাঙার শব্দে সেখানে আসিয়া দেখিল যে, হনুমান তাহার কাজ শেষ করিয়া সিংহদরজায় চড়িয়া গর্জন করিতেছে! তখন তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়া রাবণকে বলিল, 'মহারাজ, একটা ভয়ঙ্কর বানর আসিয়া অশোক বন লণ্ডভণ্ড করিয়াছে। বোধ হয় সে রামের লোক। সে সীতার সহিত কথা কহিয়াছে। আর তিনি যেখানে আছেন সে জায়গাটুকু ভাঙ্গে নাই।'

এই কথা শুনিয়া রাবণ রাগে তাহার কুড়ি চোখ লাল,—"

এই পর্যন্ত শুনেই আমার বোন রেণু হেসে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল— 'ও দাদা, তুই কী বললি রে! কুড়িটা চোখ লাল করে—' বলেই আবার হাসি। ছদ্মকোপে বলি, 'থাম্, থাম্, গল্পটা শোন'— আবার পড়া শুরু করি—

"রাবণ রাগে তাহার কুড়ি চোখ লাল, আর কুড়ি পাটি দাঁত কড়মড় করিয়া, অমনি হুকুম দিল, শীঘ্র ওটাকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।' হুকুম পাওয়া মাত্রই বড় বড় রাক্ষসেরা মুষল মুদ্গর হাতে মহা তেজের সহিত হনুমানকে বাঁধিয়া আনিতে চলিল। তাহাদিগকে দেখিয়া হনুমান সেই সিংহদরজার বিশাল হুড়কাটা হাতে লইয়া বলিল, — 'জয় রামচন্দ্রের জয়!'

তারপর আর কয়েক মুহূর্তের বেশী বিলম্ব হইল না। ইহারই মধ্যে রাক্ষসগুলির মাথা গুঁড়া করিয়া, আবার সেই সিংহদরজায় উঠিয়া ভাল মানুষের মত বসিয়াছে, যেন সে কিছুই জানে না।"

তারপরে নয়, সেই সঙ্গেই হাতে এলো 'ছোটদের মহাভারত'। আশ্চর্য মনে হয়, বর্ণনার লঘু পাখায় ভর করে আমরা তখন চলে যেতাম স্বপ্নের দেশে। রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে যেতে সময় লাগত না, উপেন্দ্রকিশোর আমাদের সঙ্গী হয়ে সেখানে নিয়ে যেতেন। আশ্চর্য সরল সেই বর্ণনা:

"এদিকে কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। যোদ্ধারা সিংহনাদ করিয়া আর চাদর উড়াইয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন।"

এইটি যতবার পড়েছি ততবারই মনশ্চক্ষুতে ছবিটি দেখেছি আর হেসেছি! যোদ্ধারা সিংহনাদ করে আর চাদর ওড়ায়, — এর চেয়ে মজার ব্যাপার আর কি হতে পারে! উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের তাচ্ছিল্য করতেন না, বন্ধু বলে ভাবতেন। ছোটদেরই তিনি

সমবয়সী ছিলেন। তাই একথা লিখতে পেরেছিলেন।

"এমন যুদ্ধ কি আর সচরাচর হয়! তাই আজ দেবতারা অবধি আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তামাশা দেখিতে আসিয়াছেন।

বাণ! বাণ! কেবলই বাণের পর বাণ! অর্জুন মারেন, কর্ণ কাটেন। কর্ণ মারেন, অর্জুন কাটেন। অর্জুনের এক বাণে পৃথিবী আকাশ সূর্য অবধি জ্বলিয়া উঠিল। যোদ্ধাদের কাপড়ে আগুন। বেচারার বুঝি পালাইবার পূর্বেই মারা যায়। উহার নাম আগ্নেয় অস্ত্র। উঃ কি ঘোরতর হড়্ হড়্ ধক্ ধক্ শব্দ! গেল বুঝি সব।

ঐ দেখ, কর্ণ বরুণাস্ত্র ছাড়িয়াছেনে। ঐ কালো কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল! কি ঘোরতর অন্ধকার! কি ভয়ানক বৃষ্টি! সৃষ্টি বুঝি লয় হয়!

অমনি দেখ, কি বিষম ঝড় বহিল! মেঘ বৃষ্টি উডাইয়া নিল। সৃষ্টি বাঁচিল। অর্জুন বায়ব্য অস্ত্র মারিয়াছেন, তাহাতেই এত ঝড়।"

এই সব বর্ণনা হৃদয়ের কোমল অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করে উপেন্দ্রকিশোর আমাদের জন্যে উপস্থিত করেছিলেন । উপেন্দ্রকিশোর বাল্মীকি মুনি সম্বন্ধে যেকথা বলেছেন, তাঁর সম্পর্কে সে-কথা মনে হয়:

রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া
সে বড় সুন্দর কথা শুন মন দিয়া।

মনে পড়ে, ছোটবেলায় ভাবতাম, উপেন্দ্রকিশোর নিশ্চয়ই সাধু পুরুষ। বড় বড় দাড়ি আছে, কণ্ঠে স্নেহভরা জাদু, হাতে ছবি আঁকার তুলি আর লেখনী, হৃদয়ে ছোটদের জন্য অগাধ ভালবাসা।

ছোটদের মনে চিরকালের মতো রং ধরিয়ে দিতে পারার ক্ষমতা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের। তাঁর চেহারা সম্পর্কে তাই ঐ ধারণা ছিল। বড়ো হয়ে দেখলাম, তাঁর সম্পর্কে ঐ ধারণা ভুল নয়। মনে হয়, উপেন্দ্রকিশোর তাঁর স্নেহক্ষরা লেখনী দিয়ে যে মধুকোষ রচনা করেছিলেন, তার আনন্দধারা আমাদের শৈশবকে ভরে রেখেছিল। তার থেকে বঞ্চিত হতে চাই না।

রংপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে অনেকদিন রংপুরের জন্যে মন কেমন করত। শুধু আমার নয়, বাড়ির সকলেরই। সেই সুনীল আকাশ, অবারিত মাঠ, সূর্যের অকৃপণ দাক্ষিণ্য, শীতের প্রচণ্ডতা— সবটা নিয়ে কী ভাল যে লাগত, তা কলকাতা এসে মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। ইটের 'পরে ইট, তাহার 'পরে ইট, মাঝে মানুষকীট— এই কলকাতা দেখে প্রথম প্রথম মোটেই ভাল লাগত না। তখনকার সেই শৈশব-স্বর্গ ছেড়ে আসার বেদনা এত স্পষ্ট ভাবে হয়ত বুঝি নি, কিন্তু অব্যক্ত রূপে তা আট বছরের কিশোর-চিত্তকে মথিত করেছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মন-কেমন-করা-বেদনা আর নিঃসঙ্গতা ঘুচে যেতে কিছুদিন সময় লেগেছিল। তারপর নির্লজ্জ কিশোরচিত্ত ধীরে ধীরে শৈশব-স্বর্গকে ভুলে যেতে লাগল, কলকাতা তার হৃদয় হরণ করে নিলো। সেই সময়ে, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, বাবার সঙ্গে বিকেলের পর সন্ধের মুখে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতাম। আমরা ছিলাম তারা রোডে, দক্ষিণ কলকাতার লেক বাজারের কাছে। সন্ধের মুখে ময়দানে বেড়িয়ে, ছুটে, হ্যাপিবয় আইসক্রীম খেয়ে বাড়ি ফিরতাম। ময়দান থেকে হেঁটে এসপ্লানেডে এসে ফেরার ট্রাম ধরতাম। আর সেখানেই হকারের কাছে কিনেছিলাম পুরনো 'সন্দেশ' পত্রিকা। আমাদের সময়টা 'মৌচাক-রংমশালে'র পর্ব। ঠিক তার আগেকার পর্ব 'সন্দেশের' পর্ব।

আশ্চর্য সৌভাগ্য, পুরনো 'সন্দেশ' শস্তা দামে কিনতে পেরেছিলাম। বাবা কিনেছিলেন, 'বই কিনে দাও' এই আবদারের তাগিদে। তারপর নিজেরই নেশা লেগে গেল। এর পর মাঝে মাঝেই পড়ন্ত বিকেলে ময়দানে এসপ্লানেডে বেড়াতে যেতে চাইতাম। তার মুখ্য আকর্ষণ 'সন্দেশ'। সেদিনকার 'হ্যাপি বয়' আইসক্রীম থেকে তা কম লোভনীয় ছিল না।

'সন্দেশ'র-এর আশ্চর্য মলাট, উজ্জ্বল পাইকা-অক্ষর, উজ্জ্বলতর বর্ণনা আর ছবি লুঠ করে নিল আমাদের ভাই-বোনদের চিত্ত। আমার মজে গেলাম 'সন্দেশে'রভোজে। কী না ছিল! কবিতা, গল্প, শিকার কাহিনী, পুরাণ, রূপকথা, ছবি, ধাঁধাঁ, বিজ্ঞান-কাহিনী— সবই ছিল।

আজ অনেক বছর পেরিয়ে এসে সেদিনের সেই মনোহরণ 'সন্দেশ' পত্রিকার কথা বেশ মনে করতে পারি। তার উপভোগ্যতা, স্বাদুতা, পুষ্টিকরতা, সুপাচ্যতা নিয়ে সেদিন চুল-চেরা বিশ্লেষণ করি নি। নতুন ভোজ্য পেয়ে চিত্তভরে তা গ্রহণ করেছিলাম। সেই পুরনো সংখ্যাগুলি 'পরে অনেক খুঁজেছি, আর তার সন্ধান মেলে নি। বাসা-বদল আর জীবনের পালা-বদল করতে গিয়ে কত জিনিস হারিয়েছি, তার সঙ্গে 'সন্দেশ'ও গিয়েছে। 'সন্দেশ' হারিয়েছি। সেই সুধাভরা কৈশোরের দিনগুলিও হারিয়েছি। রয়ে গেছে তার অম্লান স্মৃতি। আর রয়েছে 'সন্দেশে'র প্রধান শিল্পী সুকুমার রায়ের লেখা— যা কোনো দিনই হারিয়ে যাবে না।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা পড়ে শৈশবের স্বর্গলোকে খুশি হয়েছি। সেই স্বর্গ থেকে চলে এসেছি, রংপুর থেকে কলকাতায়। পরে জেনেছি, এই উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায় 'সন্দেশ'-এর প্রধান শিল্পী। কৈশোরের কলকাতা তাঁরই জাদুতে ভরে উঠেছে।

জীবনের অনেক কিছু হারিয়েছি, অনেক আনন্দ গিয়েছে, কিন্তু 'সন্দেশ'-এর লেখা যখন সুকুমার রায়ের নামাঙ্কিত হয়ে হাতে এলো, সেদিন সৌভাগ্যের অন্ত ছিল না। 'হ-য-ব-র-ল' আর 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই' আর 'চলচ্চিচসঞ্চরী' আমার কিশোর-চিত্তকে লুঠ করে নিল।

দুর্ভাগ্য সুকুমার রায়ের, দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের। এই সব ক্লাসিক বই নিয়ে কোনো উৎসব হ'ল না। কত অক্ষম গ্রন্থ আর তাদের লেখক মাল্যভূষিত হচ্ছেন, পুরস্কার পাচ্ছেন। 'হ-য-ব-র-ল' আমরা পড়েছি, আমাদের অগ্রজস্থানীয়েরা পড়েছেন। আমাদের পরে অন্তত দু ধাপের ছোটরা পড়েছে এবং যতদিন বাংলা ভাবার চর্চা থাকবে, ততদিন বাঙালি কিশোরকণ্ঠে উচ্চারিত হবে—

মিশি মাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে
শিশি বোতল ছিপিঢাকা সরু সরু গানে গানে
আলাভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদূরে
সরু মোটা শাদা কালো ছলছল ছায়াসুরে।

'আবোল-তাবোল' আর 'হ-য-ব-র-ল' লেখায় ও রেখায় আমাদের মনোহরণ করেছিল। কী সব জীবন্ত ছবি! লেখার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রেখা ছুটেছে, কিশোর-চিত্তের আশার হরিণকে দিগ-দিগন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে। ছবিগুলির নীচে ছোট্ট ইংরেজি অক্ষরে শিল্পীর নাম-সই ছিল, — এস্ রায়। এই শিল্পী আর সুকুমার রায় অভিন্ন হৃদয় ব্যক্তি। এই ব্যক্তি দ্বিতীয়রহিত।

'আবোল-তাবোল'-এর সব ক'টি ছড়া একদিন আমার মুখস্থ ছিল। আমার কেন, বাংলার বহু কিশোরের মুখস্থ ছিল। কৈশোরের জগৎ থেকে যতদূরে চলে যাচ্ছি, ততই ছড়াগুলি বিস্মৃতিলোকের ঝাপ্সা পটে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু যখনই চোখে সামনে সেই পুরনো 'আবোল-তাবোল'-কে দেখি, তখনি স্মৃতিপটে সান্ধ্য শারদাকাশে তারার মতো সেগুলি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে।

'আবোল তাবোল' কাদের জন্য লেখা? আমার ত মনে হয়, সকল বয়সের পাঠকের জন্য লেখা। মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে-রস যাহারা উপভোগ করিতে পারেন না এ-পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"

সুকুমার রায় তাঁর সাহিত্যভোজে যাদের আমন্ত্রণ করেন নি, সংসারে তাদের সাক্ষাৎ বিরল নয়। তাদের পরিচয় তিনি এই গ্রন্থেই দিয়েছেন : হুঁকোমুখো হ্যাংলা।

আশা করি একালের প্রৌঢ়-যুবক- কিশোরকে আর বিশদ করে বলতে হবে না লেখক

কাদের কথা বলেছেন :

হুঁকোমুখো হ্যাংলা বাড়ী তার বাংলা
মুখে তার কথা নাই দেখেছ?
নাই তার মানে কি? কেউ তাহা জানে কি?
কেউ কভু তার কাছে থেকেছ?
শ্যামদাস মামা তার আফিঙের থানাদার,
আর তার কেউ নাই এ-ছাড়া—
তাই বুঝি একা সে মুখখানা ফ্যাকাশে,
বসে আছে কাঁদ-কাঁদ বেচারা?

'আবোল-তাবোল'-এর পাতায় পাতায় ভোজের নিমন্ত্রণ। সাহিত্যসত্র এখানে অবারিতদ্বার। হুঁকোমুখো হ্যাংলার দল ছাড়া আর সকলেই এখানে বসে পাত পেড়ে খেয়ে যেতে পারে।

সেই-যে 'গোঁফ চুরি'র বৃত্তান্ত :

হেড অফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানত?
দিব্যি ছিলেন খোস মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা বসে ঝিমঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে!
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরাঘুরি,
বাবু হাঁকেন, 'ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি!'

সারা আপিসে হৈ-হৈ, বড় বাবুর গোঁফ চুরি! কী সর্বনাশ! যখন আয়না ধরে, দেখিয়ে দেওয়া হল তাঁর গোঁফ যথাস্থানেই আছে, তখন তাঁর সে কি লম্ফ ঝম্ফ!

'অফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় শুধু গোবর,
গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি।
মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধরে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
গোঁফকে বলে তোমার আমার— গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

এই অপূর্ব ব্যাখ্যা হেড আপিসের বড় বাবুরই উপযুক্ত।

'আবোল-তাবোল' এর প্রতি পাতায় রত্ন ছড়ানো। Here is God's plenty. এখানে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। সব ক'টি ছড়াই রত্ন।

'গানের গুঁতো' সকলেরই মনে আছে—

গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা
আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা!

গাইছে ছেড়ে প্রাণের মায়া, গাইছে তেড়ে প্রাণপণ,
ছুটছে লোকে চারদিকেতে ঘুরছে মাথা ভন্ ভন্।

সংসার একেবারে তোলপাড়। স্থাবর-জঙ্গম পশু-পক্ষী-মানব থরহরিকম্প।

গানের দাপে আকাশ কাঁপে দালান ফাটে বিলকুল,
ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ খোশমেজাজে দিল খুল্।

এমন সময়—

এক যে পাগলা ছাগল, এমনি সেটা ওস্তাদ,
গানের তালে শিং বাগিয়ে মারলো গুঁতো পশ্চাৎ।
আর কোথা যায় একটি কথায় গানের মাথায় ডাণ্ডা,
'বাপরে' বলে ভীষ্মলোচন এক্কেবারে ঠাণ্ডা।

এই সব ছড়া আমরা ভাইবোনেরা অসংখ্যবার উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করেছি, পরমুহূর্তেই হাসিতে ফেটে পড়েছি। সুকুমার রায় সেদিন অলক্ষে আমাদের খেলার সঙ্গী ছিলেন। তাঁকে আমাদের চিরচেনা বলে মনে হয়েছে।

'আবোল-তাবোল' পড়তে পড়তে আমরা স্বপ্নলোকে চলে যেতাম। 'ছায়াসঙ্গী' পড়ে মনে হ'ত স্বপ্নপ্রয়াণ করছি—

শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুরবেলায় আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।...
পাতলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।

সবচেয়ে ভালো লাগত কুমড়োপটাশের বিবরণ —

(যদি) কুমড়োপটাশ নাচে—
খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে,
চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে;
চার পা তুলে থাকবে ঝুলে হট্টমুলার গাছে।
(যদি) কুমড়োপটাশ কাঁদে—
খবরদার! খবরদার! বসবে না কেউ ছাদে,
উপুড় হয়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে;
বেহাগ সুরে গাইবে খালি 'রাধে কৃষ্ণ রাধে'!

এই সব ছড়া পাঠে আমাদের যে আনন্দ, তা কি লক্ষ মুদ্রা-বিনিময়ে পাওয়া যায়? বেহাগ সুরে 'রাধে কৃষ্ণ রাধে' গাইবার মতো নির্দেশ আর কোন্ কবি দিয়েছেন? 'শব্দ-কল্পদ্রুম', 'বাবুরাম সাপুড়ে', 'বোম্বাগড়ের রাজা', 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্', 'কি মুস্কিল!' 'ভয়

পেয়ো না.' 'আহ্লাদী'— কত আর নাম করব, সব কটিই ছড়া-রত্ন। আমাদের কিশোর চিত্তের আনন্দস্বর্গের রত্ন।

'রামগরুড়ের ছানা'র কথা ভোলা যায় না--

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
'হাসব না— না, না— না!'
সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে।'
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় পাশে পাশে।।

সুকুমার রায় হুঁকোমুখো হ্যাংলা আর রামগরুড়ের ছানাকে আনন্দজগতে প্রবেশাধিকার দেন নি। তাদের জীবনে হাসি নিষেধ। সুকুমার রায় যে-জগতে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সে-জগৎ 'আবোল-তাবোলে'র জগৎ—

মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে
সুরের নেশায় ঝরণা ছোটে,
আকাশকুসুম আপনি ফোটে
রাঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমকে জাগে ক্ষণে ক্ষণ।

এই রঙিন আকাশতলে শিশু আর কিশোরদের চিরআমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুকুমার রায়।

এখান থেকে আমার চলে যাই আর- এক স্বপ্নজগতে 'হ-য ব-র-ল'র দেশে। আবোল-তাবোল পদ্যের জগৎ, হ-য-ব-র-ল গদ্যের জগৎ। কিন্তু এই দুই জগতের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, একই স্বপ্নলোকের দুটি অঞ্চল।

'হ-য-ব-র-ল' দ্বিতীয়বার লেখা হবে না, সুকুমার রায়ও দ্বিতীয়বার আসবেন না। 'হ-য-ব-র-ল'র জগতে কতো অদ্ভুত চরিত্রের দেখা পাই। বস্তু-জগৎ থেকে এই জগতে লেখক কত অনায়াসে উত্তরণ করেছেন, আবার কত সহজেই না ফিরে এসেছেন বস্তু-জগতে। স্বপ্নলোক থেকে বস্তুলোকে যাওয়া-আসার দুর্লভ ক্ষমতা সুকুমার রায়ের আয়ত্তে ছিল। নিপুণ জাদুকরের মতো তিনি মুহূর্তমধ্যে স্বপ্নলোক নির্মাণ করেছেন, আবার

পরমুহূর্তেই আমাদের বাস্তব জগতে ফিরিয়ে এনেছেন।

হ-য-ব-র-ল'র সূচনাতেই এই কৌশলটি লক্ষণীয়। ছিল একটা রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল। কি মুশকিল! বস্তুজগতের এই বিস্ময়কে লেখক ধমকে দিয়েছেন। বেড়াল বলেছে, 'মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।' এর আর জবাব নেই।

তারপর যে অদ্ভুত লজিক বেড়াল ব্যবহার করেছে, তাতে বস্তু জগৎ থ'। 'চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা— হল চশমা।' এর মধ্যে কোনো ভুল আছে বলে বিড়াল স্বীকারই করে না। তারপরই সে তিব্বত যাবার পথ বাৎলে দিয়েছে : 'কলকেতা, ডায়মণ্ডহারবার, রানাঘাট, তিব্বত, ব্যাস্! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘন্টার পথ, গেলেই হল।' বস্তুজগতের সকল সেন্স এখানে নন্‌সেন্স বলে প্রমাণিত হয়েছে, হ-য-ব-র-ল'র যুক্তিটাই ঠিক যুক্তি বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

হ-য-ব-র-ল অদ্ভুতের মেলা। বেড়াল, গেছো-দাদা, কাক্কেশ্বর কুচকুচে, উধো আর বুধো, হিজ্ বিজ্ বিজ্ ওরফে তকাই, গাইয়ে নেড়া, কুমির, সজারু, প্যাঁচা, শেয়াল, — অদ্ভুত চরিত্রের মেলা।

হিজি বিজ্ বিজ্ হাসির চর্চা করে। মনে মনে সে যত অসম্ভব পরিস্থিতি কল্পনা করে আর পেট ফাটিয়ে হাসে। কল্পনা আর হাসির চর্চাকেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছে। এত গম্ভীর জগতে বিচরণ করে সেদিন হাসিকে আমরা পিষে মারি নি। হ-য-ব-র-ল'র হিজি বিজ্ বিজ্ ,কল্পনা করছে আর হেসে মরছে।

"মনে কর, একজন লোক আসছে, তার এক হাতে কুলপি বরফ আর হাতে সাজি মাটি, আর লোকটা কুলপি খেতে গিয়ে ভুলে সাজিমাটি খেয়ে ফেলেছে—

হোঃ হোঃ, হোঃ হোঃ,হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—"

"মনে কর, একজন লোক টিকটিকি পোষে, রোজ তাদের নাইয়ে খাইয়ে শুকোতে দেয়, একদিন একটা রামছাগল এসে সব টিকটিকি খেয়ে ফেলেছে— হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—"

হিজি বিজ্ বিজ্ ওরফে তকাই হেসেই অস্থির। হাসবার ক্ষমতা তার আছে, জীবনের আনন্দ থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

আর একটি চমৎকার চরিত্র গাইয়ে নেড়া। সে না বলতেই গান গায়, তার পকেটে মস্ত দুই তাড়া গানের কাগজ। কত রকম গান! 'লাল গানে নীল সুর, হাসি-হাসি গন্ধ', 'নাইনিতালের নতুন আলু', 'মিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে', 'বাদুড় বলে ওর ও ভাই সজারু'— হরেক-রকমের গান সরু-মোটা সুরে নেড়া গেয়ে থাকে, অনুরোধের অপেক্ষা রাখে না।

আর সেই অবিস্মরণীয় বিচারসভা। কুমির, শেয়াল, প্যাঁচা, কাক্কেশ্বর, হিজি বিজ্ বিজ্, উধো, বুধো, কোলাব্যাঙ আর চারআনা পয়সার লোভে আসামী হতে রাজি নেড়া—

সবাই মিলে হ-য-ব-র-ল'র সৃষ্টি করেছে।

এই গ্রন্থ চিরকালের। কোনোদিন পুরনো হবে না। গল্পশেষে কিশোর-পাঠককে সম্বোধন করে লেখক বলেছেন মূল্যবান কথাটি— "মানুষের বয়স হলে এমন হোঁতকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কিনা এখনও বেশি বয়স হয় নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এসব কথা বললাম।"

সুকুমার রায়ের সাহিত্যকর্মের রহস্যটি এখানে নিহিত। শৈশব আর কৈশোরের জগতে মানুষ সব কিছুই বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করতে ভালবাসে। অবাক হয়, অবাক হতে ভালবাসে। সুকুমার রায় এই অবাক-মানা স্বপ্নজগতের শিল্পী। তাঁর হাত ধরে আমরা স্বপ্নলোকে উপনীত হতে পারি। অসম্ভবের ছন্দে নিয়ম-হারা সৃষ্টি ছাড়া স্বপ্নলোকে তিনি আনন্দ রচনা করে আমাদের ডাক দিয়েছেন। আমার সৌভাগ্য, কৈশোরের মাহেন্দ্রক্ষণে সুকুমার রায়ের লেখা হাত পেয়েছিলাম। তাঁর স্বপ্নলোকের ইশারায় সাড়া দিতে পেরেছিলাম। আজ বহুদিন পরে সেই জগতের ছবিটি দূর থেকে দেখছি, আর সুকুমার রায়ের দূরাগত আমন্ত্রণ শুনতে পাচ্ছি—

আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়
আয় রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে-যায় কোন্ সুদূর।
আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাব হীন।

কুলদারঞ্জন

এই শতাব্দীর বাঙালী শিশুরা একটি পরিবারের কাছে সমবেতভাবে ঋণী। সে পরিবারের নাম কে না জানে? সেই রায়চৌধুরী পরিবার বাঙালী শিশুদের যা দিয়েছেন, তার জন্যে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। প্রাতঃস্মরণীয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাদ দিলে শিশুদের আনন্দযজ্ঞের আমন্ত্রক যাঁরা, তাঁরা সকলেই রায়চৌধুরী পরিবারভুক্ত। উনিশ শতকের শেষপাদে বাংলা শিশুসাহিত্যের সূচনা, বিশ শতকের সূচনায় বিজয়াভিযান। এই অভিযানের অন্যতম সেনাপতি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, তাঁর মুখেই বাঙালী শিশু রামায়ণ মহাভারতের গল্প প্রথম শুনেছে, আর শুনেছে 'টুনটুনির গল্প'। তাঁর পরই এলেন এই পরিবারের লেখকরা-- চিরনবীন সুকুমার রায় (আবোল-তাবোল, হ-য-ব-র-ল, অবাক্ জলপান, চলচ্চিত্তচঞ্চরী), সুখলতা রাও (গল্পের বই, আরো গল্প), কুলদারঞ্জন রায় (পুরাণের গল্প, কথাসরিৎসাগর, ছেলেদের বেতাল-পঞ্চবিংশতি, রবিনহুড)।

আজ অনেকদিন পরে আমার ছেলেবেলার বন্ধু কুলদারঞ্জনের কথা মনে পড়ে গেল। আমার ভাগিনেয় শ্রীমান বিলুর হাতে রঙীন মলাটের বই দেখে চমকে উঠলাম। সে কি?— এ যে কুলদারঞ্জন। সেই পুরাণের গল্প, কথাসরিৎসাগর, বেতাল-পঞ্চবিংশতি আর রবিনহুডের গল্প। মুহূর্তের মধ্যে যেন সময় থমকে দাঁড়াল। শতাব্দীর এক পাদ পেছিয়ে গেলুম। আমার ছেলেবেলার বন্ধু কুলদারঞ্জনকে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে পেয়ে আনন্দে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বিলু বলল— কি হল, বড়মামা? কথা বলছ না কেন?

কী বলব? আমার মন পেছিয়ে গেছে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী শান্ত সুন্দর কলকাতায়। মন চলে গেছে সেই সুখী দিনগুলিতে যখন 'হ্যাপি বয়' আইসক্রিম আর আলুকাবলি ছিল সুলভ, মার্বেল আর ঘুড়ি আজকের মতো দুর্মূল্য হয়নি। মিড-ডে শস্তা টিকিটে দু পয়সায় ট্রামে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে কালীঘাট যেতে পারতাম। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মাঠে ফুটবল খেলাশেষে গলা জড়াজড়ি করে গান গাইতে লজ্জা হতো না। সেদিনের সঙ্গী ছিলেন কুলদাররঞ্জন। তাঁর রবিন হুড সেদিন আমাদের হীরো। তাঁর উদয়ন-বাসবদত্তার সঙ্গীদের মধ্যে আমরাও ছিলাম। তাঁর বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তন্ময় হয়ে আমরাও বেতালের গল্প শুনেছি। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে আমরা ছিলাম দর্শক। সেদিন পুরাণের জগৎ আমাদের কাছে বস্তু থেকে সত্যতর ছিল। সারউড বনে ঝর্ণাতলায় আর নটিংহাম শহরের মেলায় আমরা ছিলাম রবিনহুডের সঙ্গী।

আজ নতুন করে সেদিনের বন্ধু শিশু-সাহিত্যিকদের কথা মনে পড়ছে। এঁদের হাত থেকে সেদিন আমরা যে অমৃতধারা পেয়েছি, তার তুলনা নেই। তাঁরা কিন্তু আক্ষরিক অর্থে মৌলিক লেখক ছিলেন না, প্রায় সকলেই মধুকরব্রতী। যোগীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন ছড়া, 'হাসি-খুশি'র দৃশ্যধর্মী বর্ণমালার ছড়া দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোর রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শোনালেন আর লৌকিক গল্প সংগ্রহ করে লিখলেন 'টুনটুনির গল্প'। দক্ষিণারঞ্জন বাংলা দেশের রূপকথা সংগ্রহ করলেন। সুখলতা রাও গ্রিম-ভ্রাতাদের অনুসরণে বিদেশী রূপকথার গল্প লিখলেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন শকুন্তলার গল্প আর রাজকাহিনী। আর কুলদারঞ্জন বিভিন্ন পুরাণ, কথাসরিৎসাগর ও বেতাল-পঞ্চবিংশতির গল্প আমাদের শোনালেন, সেই সঙ্গে সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন রবিন হুডের গল্প।

বস্তুতঃ মৌলিক গল্পসৃষ্টির কোনো তাগিদ এঁরা অনুভব করেন নি। দেশ-বিদেশের রূপকথা, লোককথা, পুরাণকথা আর রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারের মায়াময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, লাবণ্যময়ী ভাষায় সে জগতের বর্ণনা দিয়েছেন আর অপরিসীম সহানুভূতির সঙ্গে ছোটদের হাত ধরে ঐ জগতে নিয়ে গিয়েছেন। দেশে দেশে কালে কালে মনে মনে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়স্বজন, তাকেই এঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাই নিজেদের পরদেশী লেখক ও আপন লেখাকে অনুবাদকর্ম বলে মনে করেন নি, 'স্বাধীন' ও 'অনুবাদে'র কৃত্রিম ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিয়ে জগৎ-জোড়া আনন্দযজ্ঞে ছোটদের পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সেদিন এইভাবে বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখি নি, কিন্তু এত কথা না বুঝেও সেদিন আমার আনন্দে কমতি পড়েনি। পুরাণ আর বেতালের গল্পকে অপরিচিত মনে হয় নি, রবিন হুডের গল্পকে বিদেশী বলে মনেই হয় নি। আসল কথা, কুলদারঞ্জন আমাদের মনের কথা জানতেন। সে-কারণেই তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না, তিনি আমাদের হৃদয়ের মাঝে নির্ভয়ে অবতরণ করেছিলেন। আমরা তাঁকে দিয়েছিলাম স্নেহাসন, তাতে বসে তিনি গল্প শোনাতে শুরু করলেন আর আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে গভীর আনন্দে গল্প শুনেছি। সেদিনের আনন্দ ত এতটুকু মিথ্যে নয়। আজ প্রায় তিরিশ বছর পরে কুলদারঞ্জনের এই চারখানি বই পড়ে সেই পুরনো দিনের মুগ্ধতা, বিস্ময় ও আনন্দকে আবার ফিরে পেলাম। মনে হল, কৈশোরের প্রথম প্রেমের আনন্দের রেশ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। বহুদিনের সুখস্মৃতি ও সৌরভ যেমন মনে পড়ে, ধূপের গন্ধের মতো সেই কৈশোর-প্রেম তেমনি আবার ফিরে এলো।

কুলদারঞ্জনের যে বইটি প্রথম পড়েছিলাম, তার নাম, 'পুরাণের গল্প।' বাঙালী কিশোরকে রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। আর তাঁর পরিবারভুক্ত কুলদারঞ্জন পুরাণের গল্প শোনাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ দায়িত্ব কে তাঁকে দিয়েছিল? কেউ না, তিনি নিজেই এই কর্তব্যভার গ্রহণ করেছিলেন, শ্রমসাধ্য অন্বেষণের মধ্য দিয়ে পুরাণ থেকে শিশু-মনোরঞ্জক গল্প নির্বাচন ও সংকলন করে আপন ভাষায় পরিবেশন করেছিলেন! আজ অবাক হয়ে ভাবি, কি পরিশ্রমটাই না কুলদারঞ্জন করেছিলেন! ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শিবপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ ও রামায়ণ থেকে আঠারোটি গল্প তিনি

পরিবেশন করেছেন। কোনো লাভের আশায় নয়, কেবল সাহিত্যপ্রীতি ও ছোটদের জন্যে স্নেহবশে তিনি এই আয়াসসাধ্য কাজ করেছিলেন, তাঁর একমাত্র পুরস্কার ছোটদের মুখের হাসি। বস্তুতঃ সেদিন তিনিই পুরাণের জগতের সিংহদ্বার আমাদের জন্যে উন্মোচন করেছিলেন।

আশ্চর্য সব গল্প। অলৌকিক আর অসম্ভবে ভরা। দেব দানব গন্ধর্ব অপ্সরা রাক্ষস নর বানর পক্ষী নাগ— সবাই মিলে এক আশ্চর্য জগৎ গড়ে তুলেছে। গল্পগুলির নায়ক নায়িকা ও স্থানের নামগুলি আমাকে সেদিন মুগ্ধ করেছিল। অনন্তনাগ, মণিনাগ, বীরভদ্র, অবীক্ষিত, মরুত্ত, নরিষ্যন্ত, ক্ষুপ, দধীচ, বৎসশ্রী, উষা, অনিরুদ্ধ, চিত্রলেখা, পুষ্কল, অঙ্গদ, বীরমণি, রুক্মাঙ্গদ, শবলা, গৌতম, অহল্যা, দম, সুমনা, জয়ন্তী, ইন্দ্রসেনা, বৈশালিনী, পুরূরবা, ইল, ইলা, করন্ধম— এইসব শ্রুতিসুখকর নামের মোহে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কুলদারঞ্জন বেছে বেছে সেই গল্পগুলি সংকলন করেছিলেন যেখানে লড়াইয়ের বর্ণনা আছে। তিনি নিশ্চিত জানতেন, ছোটদের সন্তুষ্ট করতে হলে লড়াই চাই, সেইসঙ্গে দিয়ে ছিলেন দেব-মানব প্রেমের কাহিনী। পুরাণের গল্পে যুদ্ধ, প্রেম, মৃত্যু, অভিশাপ, তপস্যা, আত্মোৎসর্গের যে বাতাবরণটি রয়েছে সেটি কুলদারঞ্জন আমাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন।

স্পষ্ট মনে পড়ে 'পুরাণের গল্প' শেষ করেই ধরেছিলেম 'কথাসরিৎসাগর।' আজো সেদিনের মতো মনে হয় কথাসরিৎসাগরের তুলনা নেই। আমি তখন ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। সবে সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেছি। সংস্কৃত সন্ধি সমাস অধ্যায় শেষ করে শব্দরূপে এসে পৌঁচেছি। এমন সময় হাতে এলো 'কথাসরিৎসাগর'। কৌশাম্বীরাজ উদয়নের দুই নেশা— মৃগয়া আর বীণাবাদন। এই দুই নেশা তাঁকে যে অবস্থায় উপনীত করেছিল ও শেষ পর্যন্ত তিনি যে পরিস্থিতিতে বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, সে বর্ণনা বার বার পড়েছি।

উপন্যাসপাঠের পূর্বে প্রেম আর রোমান্সকাহিনীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সাধিত হয়েছিল কথাসরিৎসাগর মারফত। উদয়ন বাসবদত্তা পদ্মাবতী আর নরবাহনদত্ত-মদনমঞ্জুরী কর্পূরিকা-রত্নপ্রভা ভগীরথযশ-অজিনাবতীর কাহিনী পড়ে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই সেদিন উদয়ন আর নরবাহনদত্তের স্থানে নিজেকে কল্পনা করে শৌর্য-বীর্য-প্রেম তপঃসাধনের মধ্য দিয়ে রোমান্সের স্বর্গলোকে বিদ্যাধররাজ্যে উপনীত হয়েছি। উদয়নপুত্র নরবাহনদত্ত বিদ্যাধরসম্রাট হয়ে এক দেবকল্প কাল সুখে রাজত্ব করেছিলেন। কুলদারঞ্জন পাদটীকায় লিখেছেন— 'মানবকল্প বত্রিশ লক্ষ বৎসর। দেবকল্প ইহা অপেক্ষাও অনেক দীর্ঘকাল।' তাহলে? হিসেব করতে মাথা ঘুরে যায় বলে সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নরবাহনদত্তের সৌভাগ্যে ঈর্ষা করেছিলাম।

কথাসরিৎসগারের কাহিনী-সূচনায় বররুচি (অভিশপ্ত পুষ্পদন্ত) ও গুণাঢ্য (অভিশপ্ত মাল্যবান)— এই দুই বন্ধুর কাহিনী আমাকে বারবার আকর্ষণ করেছে। বিন্ধ্যবনে কাণভূতি

পিশাচের কাছে বররুচি সাতলক্ষ শ্লোকে মহাদেবকথিত গল্প বলেছেন। এরই নাম 'বৃহৎ কথা।'

কাণভূতি পিশাচ আবার সেই গল্প সাতবাহন-মন্ত্রী গুণাঢ্যকে বলেছে। গুণাঢ্য শুনে শুনে পিশাচ ভাষায় সাত বছরে সাত লক্ষ শ্লোকে 'বৃহৎকথা' নামে সম্পূর্ণ গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। রাজ সাতবাহন তা গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় গুণাঢ্য দুঃখে বিন্ধ্যবনে আগুনের কুণ্ড জ্বেলে গ্রন্থের এক একখানি পাতা ছিঁড়ে বনের পশু পাখিদের শোনান আর পাতাটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। এইভাবে ছয়লক্ষ শ্লোক ভস্মীভূত হবার পর রাজা বনে গিয়ে গুণাঢ্যর কাছে বাকি এক লক্ষ শ্লোক শুনতে চাইলেন। সেই এক লক্ষ শ্লোকের 'বৃহৎকথা'য় উদয়ন-নরবাহদত্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তারই সারাংশ সোমদেব ভট্ট 'কথাসরিৎসাগর' নামে সংকলন করেছেন।

কথাসরিৎসাগরের এই কাহিনীসূচনায় যে অভিনবতা ও চিত্তাকর্ষী উপস্থাপনা রয়েছে, তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেদিন কল্পনা করতাম, আজো করি, মনশ্চক্ষে ছবিটি দেখি— কথাসরিৎসাগরে দেওয়া ছবিটির সঙ্গে তা মিলিয়ে নিই— বিন্ধ্যবনে এক প্রাচীন বৃক্ষমূলে গুণাঢ্য অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে সাতলক্ষ শ্লোকের 'বৃহৎকথা' বলছেন। তাঁকে ঘিরে বনের পশু পাখিরা উন্মুখ হয়ে শুনছে। পুঁথির এক একটি পাতা পড়ে গুণাঢ্য আগুনে ফেলে দিচ্ছেন। এই দৃশ্যটি সেদিন আমার কিশোরচিত্তকে যে বিস্ময়-আনন্দ দিয়েছিল, তা আজো মনে পড়ে। গুণাঢ্যকে ঘিরে উৎসুক শ্রোতার দল—ময়ূর, খরগোশ, হাতি, বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, আরো কত পশুপাখি।

এই দুটি বই শেষ করে বাবার কাছে জানতে চাইলাম— কুলদারঞ্জনের আর কি বই আছে?

বাবা আমার হাতে দিলেন 'ছেলেদের বেতাল-পঞ্চবিংশতি'। বেতাল-পঞ্চবিংশতির গল্পগুলি ক্ষুদ্রকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প। প্রত্যেকটি গল্পের শেষে প্রশ্নোত্তর আছে। মনে আছে, এইখানে এসে গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটি হাত দিয়ে চাপা দিতাম। বেতালের প্রশ্নের উত্তরে বিক্রমাদিত্যের উত্তরটি কী হতে পারে, তা নিয়ে জল্পনা করতাম। শেষ পর্যন্ত কৌতূহল জয়লাভ করত। আঙুলের ফাঁক দিয়ে একবার চট করে দেখে নিতাম উত্তরটা, আর মনে মনে বলতাম— এতো জানাই ছিল। মনকে এই চোখ ঠারার বিদ্যেটা ধরা পড়ে যেতে বেশি সময় লাগত না। আমরা তিন ভাই-বোনে এই নিয়ে হৈ চৈ করতাম। কে উত্তরটা বলতে পারে? সকলেই চাইত, আগেভাগে উত্তরটা দেখে নিতে, শেষ পর্যন্ত কলহাস্যের মধ্যে এই প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ হত। আজো সেদিনের বেতাল-পঞ্চবিংশতি-পাঠের এই আনন্দ মনে পড়ে।

এই গ্রন্থের তৃতীয় গল্পটি পরে ইস্কুলের সংস্কৃত পাঠমালায় সংস্কৃত ভাষাতেই পড়েছি— 'বীরবরোপাখ্যানম্।' মনে আছে সেদিন দু-চার বছর আগে কুলদারঞ্জনের গ্রন্থে পড়া গল্পটিকে ফিরে পেয়ে কী খুশি হয়েছিলাম!

এই গল্পগুলির মধ্যে যে নবীনতা ও সজীবতা আছে তা এদের কখনো পুরনো বা মলিন হতে দেয় নি। সেদিন যেমন ভালো লাগত, আজ হয়ত তেমন লাগে না, কিন্তু স্বাদের ভিন্নতায় স্বাদুতা যে কমে নি, তা আজ অনুভব করি। তার জন্যে কুলদারঞ্জনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আশ্চর্য গল্প। আশ্চর্যতর প্রশ্ন ও উত্তর। দ্বিতীয় উপাখ্যানটি নতুন করে মনে পড়ছে। ব্রাহ্মণ কেশবের একমাত্র কন্যা মধুমালতী। পরমাসুন্দরী। তার জন্য তিন প্রার্থী উপস্থিত। ব্রাহ্মণ কার হাতে কন্যা সম্প্রদান করবে? এই সমস্যায় কেশব যখন চিন্তিত, তখনি সর্পাঘাতে মধুমালতী প্রাণত্যাগ করল। মধুমালতীর সৎকার শেষে তিন পাণিপ্রার্থী দেশেবিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেষে যে শ্মশানে মধুমালতীর সৎকার হয়, সেখানে তিন প্রার্থী আবার উপস্থিত — বামন, ত্রিবিক্রম ও মধুসূদন। তিন জনের বিদ্যা প্রয়োগে ভস্মাবশেষ অস্থি থেকে মধুমালতী পুনর্জীবিত হ'ল। এই ঘটনার পূর্ণবিবরণ দিয়ে 'বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল— 'মহারাজ! এই তিন জনের মধ্যে কে মধুমালতীকে বিবাহ করিতে পারে?'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন— 'শ্মশানে ঘর বাঁধিয়া যে বাস করিয়াছিল, আমার মতে সেই ব্যক্তি এই কন্যাকে বিবাহ করিবার অধিকারী। কারণ পুত্রই পিতামাতার অস্থি রক্ষা করে। সুতরাং ত্রিবিক্রম অস্থিসঞ্চয় করিয়া মধুমালতীর পুত্রের মত হইয়াছে। আর বমন জীবন দান করিয়া তাহার পিতার তুল্য হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন ভস্ম লইয়া শ্মশানে বাস করিয়া বিবাহের অধিকারী হইয়াছে। অতএব, সে-ই মধুমালতীকে বিবাহ করিতে পারে।'

এই উত্তর শুনে মনে মনে সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে সেদিন তারিফ করেছি, আজও করি।

কুলদারঞ্জনের আর কোন বই আছে কি না— এই প্রশ্নের উত্তরে, বাবা বলেছিলেন ইস্কুলের পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারলে 'রবিন হুড' কিনে দেবেন। আমি সে কথা রেখেছিলাম। সুতরাং এক জানুয়ারির সকালে আমার হাতে এলো 'রবিন হুড'। মনে আছে সেদিন মার্বেলখেলা ছেড়ে সারাটা দিন রবিন হুড, উইল স্টাটলি, লিটল জন, মাচ্চ, উইল স্কারলেট, ফ্রায়ার টাক্, এলান-আডেল, মিডল, আর্থার-এ-ব্লান্ড প্রভৃতির সঙ্গে সারউড অরণ্যে, নটিংহাম শহরে মেলায় টুর্নামেন্টে ঘুরে বেড়িয়েছি। দ্বিতীয় হেনরি ও রিচার্ডের সময়কার ইংল্যান্ডের মধ্যযুগীয় রোমান্সের রঙীন আলোকে 'রবিন হুড' আলোকিত হয়ে আছে। স্পষ্ট মনে আছে, এই বই সেদিন আমাদের কী রকম উত্তেজিত ও উল্লসিত করেছিল। ইস্কুলে টিফিনের সময় ও বিকেলে লেক ময়দানে আমরা রবিন হুড আর তার সঙ্গীদের ভূমিকায় অভিনয় করতাম। আমাদের দলে কেবল ম্যারিয়ান ছিল না, রবিন হুডের জীবনের ঐ অধ্যায়টি বাদ দিয়ে বাকি সবটাই আমরা বার বার অভিনয় করতাম। নটিংহামের পাজি শেরিফ, হারফোর্ডের দুষ্টু বিশপ— এইসব ভূমিকায় ছেলের অভাব হ'ত না। কিন্তু সবাই চাইত রবিন হুডের ভূমিকা; অন্যথায় উইল স্টাটলি, বা উইল স্কারলেট, বা ফ্রায়ার টাক্, বা লিটল জন, বা মাচ্চ। ভূমিকা বণ্টন নিয়ে এক একদিন মারপিট লেগে

যেত। তখন চীৎকার করে ডাণ্ডা হাতে লাফিয়ে পড়তাম, বলতাম— আমি রবিনহুড. আমি যা বলব, তা'ই হবে। তখনি দাঙ্গা থেমে যেত, সবাই সমস্বরে বলত— থ্রী চীয়ার্স ফর আওয়ার রবিন হুড— হিপ্ হিপ্ হুররে। হিপ্ হিপ্ হুররে। হিপ্ হিপ্ হুররে। সেদিন আমাদের জীবন রবিন হুডের দলবল ছিল জীবন্ত, তাদের অ্যাডভেঞ্চার ছিল বস্তু অপেক্ষা সত্যতর।

আজ আর তার কিছুই নেই। নেই সে সঙ্গীর দল, নেই সে পরিবেশে, নেই সে উত্তেজনা। তবু আজো 'রবিন হুড' পড়লে সেই ফেলে আসা দিনগুলি মনে ভিড় করে আসে।

কুলদারঞ্জনের বর্ণনা এত গতিশীল, প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত যে সেদিনের কল্পনাপ্রবণ কিশোর মনশ্চক্ষুতে বর্ণিত দৃশ্যগুলির অভিনয় দেখেছিল। মধ্যযুগীয় ইংলন্ডের সেই রোমান্স-পরিবেশ— সারউড অরণ্য, হরিণ শিকার, নটিংহামের মেলা, টুর্ণামেন্ট. প্লিম্পটন গির্জায় এলান-আ- ডেলের বিবাহ উৎসব, বার্নসডেলে স্যার সাইঅব্-জিস-বোর্ণের ছদ্মবেশধারী রবিন হুডের লিটল জনকে ফাঁসীমঞ্চ থেকে উদ্ধার, নটিংহামের পাজি শেরিফকে শিক্ষাদান, হারফোর্ডের দুষ্টু বিশপকে জব্দ করার রোমাঞ্চকর কাহিনী সেদিন আমরা কল্পনায় অভিনীত হতে দেখেছি।

'রবিন হুড' সেদিন কেন আমাকে মুগ্ধ করেছিল? এ প্রশ্নের উত্তরদান কঠিন। কৈশোরের অ্যাডভেঞ্চার-স্পৃহার পরিতৃপ্তি ঘটেছিল, রোমান্সের সুদূরাভিযান মনকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছিল, সারউড অরণ্যের মুক্ত জীবনের আনন্দ শহুরে বালক-মনকে অভিভূত করেছিল। এ সবই ঠিক। কিন্তু সঠিক উত্তরটা দেওয়া কঠিন। বোধ করি সেদিনের কিশোরচিত্ত যে-সব স্বপ্ন ও কামনাকে মনে মনে লালন করত, 'রবিন হুডে' তার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিল। কুলদারঞ্জনের ভাষার লাবণ্য ও ধাবৎশক্তি এই স্বপ্নমায়া রচনায় সাহায্য করেছিল। রবিন হুড চির-অশান্ত, অ্যাডভেঞ্চার-সন্ধানী, রোমাঞ্চ-প্রিয় মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। বোধ করি এ কারণেই রবিন হুডকে ভালো লাগে।

সারউড অরণ্যে রবিন হুডকে দেখে এ-কথাই মনে হয়। কুলদারঞ্জন আজন্ম অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়-রোমান্সলোকের নায়ককে এইভাবে এঁকেছেন— দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায়—

"দেখিতে দেখিতে রবিন হুডের দল প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। শেরিফ শত চেষ্টা করিয়াও দস্যুদলের কাহাকেও ধরিতে পারিলেন না।

.... এই দলের প্রতি ক্রমেই লোকের শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল।...

এইরূপে কিছুদিন গেল, বনের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকাটা রবের ভাল লাগিল না। একদিন তীর ধনু লইয়া তিনি প্রস্তুত হইলেন এবং দলের লোকদের বলিলেন— আমি চললাম একবার শহরের খবরটা নিয়ে আসি। তোমরা বনের পাশেই থেক। এবং আমার শিঙ্গা শুনলে হাজির হয়ো।"

রবিন হুডের সঙ্গে কিশোর পাঠকও বেরিয়ে পড়ে রোমাঞ্চের সন্ধানে। এই সন্ধানে আমাদের সেদিন পথ দেখিয়েছিলেন কুলদাররঞ্জন।

রাজকাহিনী

রংপুর থেকে আমরা যখন কলকাতায় চলে আসি তখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়নি। প্রথমটা কষ্ট হয়েছিল। রংপুরের সেই উদার প্রান্তর, সেই সুনীল আকাশ, সেই শীত-বর্ষামুখর দিনগুলি রাতগুলি, বাল্যসঙ্গী আর সঙ্গিনীর দল, সেই দেহাতি জীবন— মনকে আকুল করে তুলত। এখানে কঠিনকায়া কলকাতা, হায় রে রাজধানী নিষ্ঠুর মায়া, নেই ক' কোনো প্রাণের সাড়া— এটাই গোড়ায় মনে হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে কলকাতা আমার মনোহরণ করল। নির্লজ্জের মতো তার প্রেমে পড়ে গেলাম। রংপুর তার সহস্র স্মৃতির গভীরে চলে গেল। বাল্যসঙ্গী আর সঙ্গিনীদের কথাও ধীরে ধীরে ভুলে গেলাম। রংপুর ক্রমশই দূরে চলে গেল, স্বপ্নে মতো অপসৃত হ'ল।

আমরা যখন কলকাতায় এলাম তখন বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎকাল দেখা দিয়েছে। ছ'মাস হেলাফেলা করে কাটিয়ে শীতের মুখে ইস্কুলে ভর্তি হলাম। আর ভর্তি হয়েই পেয়ে গেলাম সাত রাজার ধন 'রাজকাহিনী', লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজো স্পষ্ট মনে পড়ে দক্ষিণ কলকাতার সেই স্কুলবাড়ির এক তলায় আঙ্গিনার পশ্চিমপ্রান্তে ছিল আমাদের ক্লাসরুম। টিফিনের আগের পিরিয়ডে বস্‌ত বাংলা র‍্যাপিড রীডারের ক্লাস। পড়াতেন সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই। অর্থাৎ আমাদের গড়গড় করে রীডিং পড়ে যেতে বলতেন, আর তিনি শুনতেন। মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করতেন, এইভাবেই গড়িয়ে যেত সময়। পণ্ডিত মশায়ের ঝিমুনি আসত, ক্লাস ঝিমিয়ে পড়ত, তারপর হঠাৎ সারা স্কুলবাড়ি কাঁপিয়ে টিফিনের ঘণ্টা বেজে উঠত— ঢং ঢং ঢং।

সেদিন রোমান্সলোকে প্রবেশ করেছিলাম অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে। 'রাজকাহিনী'র পাতায় পাতায় যে নিমন্ত্রণ ছিল, তাতে সাড়া দিয়ে উঠেছিল আমার কিশোর মন। পরীক্ষার ব্যাপারে ঐ বইটার কোনো গুরুত্ব ছিল না, কারণ ওটা থেকে প্রশ্ন করা হবে না, একথা আগেই জেনেছিলাম। বাধ্যতামূলক পাঠের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম বলেই 'রাজকাহিনী' আমার ভাল লাগত। পাইকা অক্ষরে ছাপা সেই বইটি পড়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, তা বিরল আনন্দ। একথা কবুল করতে আজো লজ্জা পাই না।

মনে আছে শীতের আর গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটির দিনগুলির কথা। লেকমার্কেট মোড় থেকে

রাসবিহারী অ্যাভিনুর ডান ফুটপাথ ধরে পূর্ব দিকে হেঁটে যেতাম ত্রিকোণ পার্ক পর্যন্ত। সেই শান্ত দুপুরগুলি আর কোনো দিন কলকাতা ফিরে পাবে না। তখনো যুদ্ধ লাগে নি। ট্রামে মিড-ডে কনশেসন, দু-পয়সার টিকিটে বালিগঞ্জ-কালিঘাটে বেড়ানো যায়। 'হ্যাপিবয়' আইসক্রীম দু পয়সা, এক আনা, দু আনা দামে পাওয়া যেত। কী সুন্দর সেই ডাক! 'হ্যা-পি ব-য়।' সেই ডাক আজ আর শুনি না। কোনো কোনো দিন রৌদ্রজ্বলা দুপুরে চলে যেতাম লেকের মাঠে। তখন লেকের চারদিকে না ছিল এত বাড়ি, গাড়ি, রাহী বা স্টেডিয়াম। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলতাম! বেপাড়ার ছেলেদের হারিয়ে দিয়ে বা হেরে গিয়ে মারপিট করে আসতাম। গুলি, জলছবি আর ঘুড়ি ছিল শস্তা। সেই যুদ্ধপূর্ব দিনগুলিতে কলকাতা ছিল কৈশোরের স্বর্গ। সেই-সব দিনগুলিতে 'রাজকাহিনী' আমার নিত্যসঙ্গী ছিল।

স্পষ্ট মনে পড়ে, লেকের মাঠে , ত্রিকোণ পার্কে বা দেশপ্রিয় পার্কে ছায়াভরা বেঞ্চিতে, বা বাড়ির ছাদে বসে 'রাজকাহিনী' পড়েছি। বারবার পড়েছি। আর সেই স্বপ্নভরা রোমান্সলোকে চলে গিয়েছি।

আশ্চর্য সেই সব গল্প। ইতিহাসের কাহিনীকে অবনীন্দ্রনাথ কত চিত্তহারী রূপে উপস্থিত করেছিলেন। মনেই হয় নি যে এর কতটা ইতিহাস, আর কতটা বাস্তব, কেবল ভেবেছি, এ সত্য, চিরকালের সত্য।

প্রথম গল্প 'শিলাদিত্য'। প্রথম অনুচ্ছেদেই অবনঠাকুর আমার মনকে লুঠ করে নিয়েছিলেন। সেদিন 'বুড়ো আংলা' বা 'নালক' পড়ি নি। কিন্তু তার জন্য কোনো খেদ নেই। এক 'রাজকাহিনী' আমার সমস্ত মনকে ভরে রেখেছিল।

'শিলাদিত্য'র প্রথম অনুচ্ছেদটি বারবার পড়েছি, আরো বহুবার পড়তে রাজি আছি। এটা পড়তে আমার মন কখনো ক্লান্ত হয়নি।

" শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি, যে সময়ে বল্লভীপুরে রাজা কনক সেনের বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় বল্লভীপুরে সূর্যকুণ্ড নামে একটি অতি পবিত্র কুণ্ড ছিল। সেই কুণ্ডের একধারে প্রকাণ্ড সূর্যমন্দিরে এক অতি বৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর একটিও পুত্রকন্যা কিংবা বন্ধুবান্ধব ছিল না। অনন্ত আকাশে সূর্যদেব যেমন একা, তেমনি আকাশের মতো নীল প্রকাণ্ড সূর্যকুণ্ডের তীরে আদিত্যমন্দিরে সূর্য-পুরোহিত তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই একাকী, বড়ই সঙ্গীহীন ছিলেন। মন্দিরে দীপ-দান, ঘণ্টাধ্বনি, উদয়-অস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি, সকল ভারই তাঁর উপর— ভৃত্য নেই, অনুচর নেই, একটি শিষ্যও নেই। বৃদ্ধব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশসের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই সন্ধ্যা সূর্যদেবের আরতি করতেন; প্রতিদিনই সেই শীর্ণ হাতে রাক্ষস-রাজার রাজমুকুটের মতো মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাতেন, আর মনে-মনে ভাবতেন, যদি একটি সঙ্গী পাই তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তার হাতে সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।"

এই অনুচ্ছেদে যে শিল্পনৈপুণ্য, নিঃসঙ্গ জীবনের যে বেদনা, যে ঈশ্বরনির্ভরতা, তা

সম্পূর্ণ অনুভাবের বয়স তখন নয়। তবু কিশোর পাঠককে অভিভূত করেছে, আবছা অনুভূতি, সৌন্দর্যব্যাকুলতা মনকে বেদনার্ত করে তুলেছে। সমগ্র 'রাজকাহিনী'তে এই বেদনা বিকীর্ণ হয়ে আছে।

গ্রন্থের প্রথম অনুচ্ছেদে যার সূচনা, শেষ গল্পে শেষ অনুচ্ছেদে তার পূর্ণ পরিণতি। সমগ্র 'রাজকাহিনী' নিপুণ মালাকারের গাঁথা মুক্তোর মালা। শেষ গল্প 'সংগ্রামসিংহ'-এর শেষ বর্ণনা শিরোহীর রাজা কর্তৃক বিষপ্রয়োগে শ্যালক পৃথ্বীরাজ-হত্যা।

আশ্চর্য নিপুণ সেই বর্ণনা। সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল, আজো করে। "রাণার জামাই খুব খাতির করে পৃথ্বীরাজকে বাইরে নিয়ে বসিয়ে সোনার রেকাবিতে শিরোহীর খাসা-নাড়ু গুটিকতক জল খেতে দিলেন। শিরোহীর খাসা-নাড়ু— অমন নাড়ু কোথাও হয় না, পৃথ্বীরাজ তাই গোটা চার-পাঁচ মুখে ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কমলমীরে আপন দলবলের সঙ্গে মিলতে চললেন। কমলমীরে আর তাঁর পৌঁছতে হল না, সিরোহীর মতিচুর সেঁকোবিষ আর হীরেচুরে মেখে তাঁর ভগিনীপতি খেতে দিয়েছিল — জুতো-তোলার শোধ নিতে।

তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন— রাস্তার ধুলোয়। কমলমীরে— সেখানে তাঁর তাররাণী একা রয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল—দূরে—দূরে—কত দূরে সকালের আগুনবরণ আলোর মাঝে নীল আকাশের শুকতারার অস্তপথ ধরে! আর ঠিক সেই সময় সঙ্গের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবৎখানায় বসে আশা-রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে — 'ভোর ভয়ি, ভোর ভঁয়ি'।"

গ্রন্থ-সূচনায় যে বর্ণনা তাতে সন্ধ্যাসূর্যের ছবি। গ্রন্থশেষে যে বর্ণনা, সেখানে প্রভাতসূর্যের ছবি। সন্ধ্যা আর সকালের দুই ছবি দিয়ে রাজকাহিনী মোড়া। মনে আছে তখন বাড়িতে বাবার কাছে শুনেছিলাম লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছবি আঁকেন। আমার সারা মন বলে উঠেছিল, 'ওঃ তাই! তাই অমন কলমের মুখে ছবি।' বড় হয়ে পড়েছি অবনীন্দ্রনাথের নিজের কথা— 'ওবিন ঠাকুর। কোন্ ওবিন ঠাকুর? যে ছবি লেখে।'

ছবি লিখেই তিনি 'রাজকাহিনী' গড়ে তুলেছেন। আর সেই সঙ্গে আছে অপরিসীম দরদ আর গভীর শিল্পদৃষ্টি।

'শিলাদিত্য' গল্পের সূচনায় পূজারী বৃদ্ধ সুভাগাকে আশ্রয় দিচ্ছেন। সেই বর্ণনা পড়লে সমস্ত মন কারুণ্যে বিগলিত হয়।

"সেই ব্রাহ্মণ-বালিকা কমলকলির মতো ছোট দুইখানি হাত জোড় করে বললে— প্রভু, আমি আশ্রয় চাই।

ব্রাহ্মণ ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে একবিন্দু সূর্যের আলো সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল।"

এই বর্ণনার পাশে রাখি 'সংগ্রামসিংহ' গল্পের শেষ বর্ণনা— 'কতদূরে সকালের আগুনবরণ আলোর মাঝে নীল আকাশের শুকতারার অস্তপথ ধরে।'' এইসব নিখুঁত ছবি শিল্পসুষমায় ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে আমার মনোহরণ করেছিল। এবং আজও করে।

'রাজকাহিনী' চিত্রশালা। ছবির পর ছবি, কী তার রং, কী তার বৈভব, কী তার সুষমা!

সেই ভয়ঙ্কর-সুন্দর জহর ব্রতের বর্ণনা :

''কালরাত্রি, তিথি অমাবস্যা যখন জগৎ-সংসার গ্রাস করেছিল, মাথার উপর থেকে চন্দ্রসূর্য লুপ্ত হয়েছিল, সেই সময় চিতোরের মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারো-হাজার রাজপুত সুন্দরীর জহরব্রত আরম্ভ হল।

মন্দিরের ঠিক সম্মুখে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে রাজস্থানের প্রথম সুন্দরী রানী পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ করলেন, 'হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, এস। পৃথিবীর অন্ধকার তোমার আলোয় দূরে যাক। হে অগ্নি, হে মহাতেজ, এস। তুমি দুর্বলের বল, সবলের সহায়। হে দেবতা, হে ভয়ঙ্কর, আমাদের ভয় দূর কর। সন্তাপ নাশ কর, আশ্রয় দাও। লজ্জানিবারণ, দুঃখবিনাশন, বহ্নিশিখা, তুমি জীবনের শেষ গতি, বন্ধনের মহামুক্তি।' পদ্মিনী নীরব হলেন। বারো হাজার রাজপুতের মেয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের চারি দিকে ঘুরে-ঘুরে গাইতে লাগল— 'লাজহরণ! তাপহারণ।' হঠাৎ একসময় মহাকল্লোলে চারিদিক পরিপূর্ণ করে হাজার-হাজার আগুনের শিখা মহা আনন্দে সেই সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এল। প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টলমল করে উঠল। বারোহাজার রাজপুতনীর সঙ্গে রানী পদ্মিনী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন— চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনামুখ, মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে, এক-নিমিষে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেল। সমস্ত রাজপুতের বুকের ভিতর হতে চীৎকার উঠল— 'জয় মহাসতীর জয়'!''

এই বর্ণনা প্রথম পড়ে আমার হৃদয়কন্দরে এই চীৎকারের গম্ভীর প্রতিধ্বনি বেজে উঠছিল, তা আজো অনুভব করতে পারি।

শুধু কি তাই? মন-কেমন করা বাদল দিনের প্রথম কদমফুলের গন্ধ আর গানের কলি আমি 'রাজকাহিনী'র 'বাপ্পাদিত্য' গল্পে পরাশর-অরণ্যে পেয়েছি।

সেদিনের কিশোরচিত্তে যৌবনের রোমান্টিক বেদনার অশ্রু-সজল মেঘের প্রথম ছায়া পড়েছিল।

ত্রিকূট পাহাড়ের নীচে পরাশর-অরণ্যের ধারে এক গ্রামে রাজার ছেলে বাপ্পা রাখাল-ছেলেদের সাহচর্যে আর ভীলনী-দিদি ভীল-ভাইয়ের স্নেহে মানুষ হচ্ছিলেন।

''সেই সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন-নতুন ঘাসের উপর গরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন-পর্ব, রাজপুতদের বড় আনন্দের দিন।...বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন, তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই— ভীল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকলে— 'ভাই,

তুই কি রাজবাড়ি যাবি?' বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন— 'না, যাব না।' হয়তো তাঁর মনে হয়ছিল— আমার ভাই নেই। বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দের মেলা দেখতে যাব?... সেই সময়ে বাপ্পার বড়ই একা একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনীদিদির মুখে-শোনা ভীল-রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান, ছোট একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না। কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হাওয়ায় মিশে স্বপনের মতো বাপ্পার চারি দিকে বেসে বেড়াতে লাগল!... বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে-চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন— বাঁশির করুণ সুর কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।"

রোমান্টিক বেদনা এই বর্ণনায় সুন্দর বাণীরূপ লাভ করেছে। মনে পড়ে সেদিন বাপ্পার দুঃখে মন বিগলিত হয়েছিল।

সেদিন ঝুলন-পূর্ণিমা। বনের একাধারে শোলাঙ্কি-রাজকন্যা ঝুল্‌না-খেলা খেল্‌তে চেয়েছিলেন। দোলনা খাটাবার দড়ির অভাবে রাজকন্যা ও তার সখীরা ম্রিয়মান। এমন সময় তাঁরা বাপ্পার বাঁশি শুনলেন। রাজকন্যা সখী মারফৎ বাপ্পার কাছে দড়ি চাইলেন। বাপ্পা বললেন, 'দিতে পারি, যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করেন।' "সেইদিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুল্‌না বেঁধে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বর-কনেকে ঘিরে-ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল — " আজ কি আনন্দ। আজ কি আনন্দ!" খেলা শেষ হল, সন্ধ্যা হল, রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন, আর বাপ্পা ফুলে ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন-পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন— আজ কি আনন্দ! আজ কি আনন্দ!"

এই গানের রেশ সেদিনের পাঠকচিত্তকে ভরে রেখেছিল। আজ তা অনুমান করতে পারি। সেদিনে আনন্দ আর অনুভূতি আজ আর পাব না। কিন্তু সেই রোমান্সের স্বপ্নলোক আজো ছাপার হরফে বন্দী হয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' এই স্বপ্নলোক। এই লোকের ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই, তা সেদিন আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। আজ প্রায় তিরিশ বছর বাদে একটি কিশোরীর হাতে 'রাজকাহিনী' দেখলাম। সে-ও স্কুলে এই বই পড়েছে। মসীচিহ্নিত বইখানি দেখে সেদিনের আনন্দ নতুন করে ফিরে এল বলে মনে হল। কিন্তু হায়! যে যায়, সে আর আসে না। সেই বই পেয়েছি, কিন্তু সেই মন তো আর ফিরে আসবে না। "ফাগুন বহুরা ফিরি আয়ী, জোবন ফিরি আওত নহী।" তবু সেদিনের সুখস্মৃতি-স্মরণে 'রাজকাহিনী' চিরনূতন হয়ে আছে।

যখের ধন

তখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় নি। শহর কলকাতায় জীবনযাত্রা চলে ধীরে মন্থরগতিতে। তার জীবনে তখনো গানের অভাব হয়নি, অভাব ঘটে নি আলস্য আর মন্থরতার। কলকাতার এক বাড়ির দোতলার ঘরে বসে দুটি যুবক প্রভাতী চা'য়ের অপেক্ষায় সংবাদপত্রের পাতা উল্টাচ্ছে। একজনের নাম বিমল, অপরজনের নাম কুমার। পায়ের তলায় শুয়ে আছে তাদের প্রিয় কুকুর, বাঘা। এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোকের প্রবেশ।

'মৌচাক' মাসিকপত্রে এই বর্ণনা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকে বাঙালি কিশোরমাত্রেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। সেদিন 'মৌচাক' এলে বাড়িতে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। বাঙালি কিশোরকে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ জুগিয়েছিল বিমল-কুমার-রামহরি, জয়ন্ত মানিক সুন্দরবাবু আর বাঘা-কুকুর। 'যখের ধন', ' আবার যখের ধন', 'মেঘদূতের মর্তে আগমন,' 'মায়াকানন,' 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর,' 'জয়ন্তের কীর্তি', 'সাজাহানের ময়ূর' এই-সব কিশোরপাঠ্য উপন্যাস পড়ে আমরা সেদিন অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পেয়েছি।

'যখের ধন' আর ' আবার যখের ধন' পড়ে সেদিন আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম, একথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করি না। এই সব বইয়ের সাহিত্যমূল্য কম না বেশি, সে-কথা সেদিন আমরা ভাবি নি। বিমল আর কুমার, জয়ন্ত আর মানিকের সঙ্গে আমরা দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। আর এদের স্রষ্টা হেমেন্দ্রকুমার রায় সেদিন আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুরূপে দেখা দিয়েছিলেন।

হেমেন্দ্রকুমার— এইটি আমাদের কাছে প্রিয় নামে পরিণত হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয় নি। কিন্তু তিনি যে মহা গল্পবাজ আড্ডাখোর সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নেই। বড় হয়ে জেনেছি, হেমেন্দ্রকুমার বহুমুখী গুণী লোক। তিনি কবি, গীতিকার, চিত্রশিল্পী, গল্প-লেখক, উপন্যাস-লেখক, নৃত্যবিদ, মঞ্চাধ্যক্ষ, ছোটদের প্রিয় লেখক, এবং আরো অনেক কিছু। আজ আর তিনি নেই, কিন্তু তাঁর লেখা বড়োদের ও ছোটোদের বইগুলি রয়েছে। বয়স্ক-সাহিত্য তাঁকে মনে রাখে নি, কিন্তু ছোটরা তাঁকে মনে রেখেছে। সেদিন যাঁরা ছোট ছিলেন, এখন তাঁরা পিতা হয়েছেন। তাঁরা এবং এখনকার ছোটরা সকলেই হেমেন্দ্রকুমারকে মনে রেখেছেন।

হেমেন্দ্রকুমার যা লিখেছেন, তা খাঁটি কিশোর-সাহিত্য। অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ তিনি আমাদের দিয়েছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রকিশোর কুলদারঞ্জন সুকুমার-অবনীন্দ্রনাথের পর 'মৌচাক'-কে কেন্দ্র করে শিশুসাহিত্যের যে মধুচক্র গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়।

হেমেন্দ্রকুমার তাঁর কিশোর-উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"ছেলেরা ভালবাসে অ্যাডভেঞ্চার। এবং সে অ্যাডভেঞ্চার যত ধারণাতীত, বিপদবহুল ও বিচিত্র হয়ে ওঠে ততই বেড়ে ওঠে তাদের আগ্রহ। আমি তাদের সেই আগ্রহেরই খোরাক

জোগাবার চেষ্টা করেছি। বাঙালীর ছেলেদের দেহের সঙ্গে মনও যাতে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, স্বদেশকে ভালবেসেও তাদের চিত্ত যাতে বিপুল বিশ্বের জলেস্থলে-শূন্যে বেপরোয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, মৃত্যু-বঙ্কুর বিপদের পন্থায় তাদের আনন্দের উৎস যাতে অসঙ্কোচে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, নানা বিরোধী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেও সমান অটল থেকে তারা যাতে নিজেদের জীবন গঠন করতে শেখে, আমার এ-শ্রেণীর উপন্যাস রচনার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। ইস্কুলের মরা পুঁথির কালির আঁচড়ে ছেলেরা মানুষ হয় না, তারা মানুষ হয় পাঠশালার বাইরে। বিপুল বিশ্বের ভিতর ছুটে বেরিয়ে গিয়ে বিচিত্র Living book পাঠ করে। বিজ্ঞ প্রাচীনরা যা চান না, বাঙালী ছেলেদের আমি তাই হতে বলি। তারা ডান্‌পিটে হোক্। তারা আপদ-বিপদের কোলে মানুষ হোক্। তারা বীরত্বে মহান্ হোক্।"

বাঙালী ছেলেকে ডান্‌পিটে হবার ডাক দিয়েছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। সেদিন— আমার স্পষ্ট মনে আছে— আমাদের কিশোরচিত্তে বীরের আসনে বসেছিলেন বিমল, কুমার, জয়ন্ত, মানিক। অধুনা বাঙালী ছেলেদের কাছে 'হীরো' হলেন সিনেমার নায়ক। আমাদের জীবনে সেদিন সিনেমার কোনো স্থান ছিল না। স্পষ্ট মনে পড়ে একটি মাত্র ইংরেজি সিনেমা আমরা দেখেছিলাম— ' কিং কং।' সেই ছবির গল্প বাংলাভাষায় আমাদের উপহার দিয়েছিলেন হেমেন্দ্রকুমার — সে বইটিরও নাম ' কিং কং।' এই গোরিলাকে হেমেন্দ্রকুমার কলকাতায় হাজির করেছিলেন। কলকাতার ময়দানে মনুমেন্টের চূড়ায় আসীন কিং কঙের কথা পড়ে অনেকদিন ভেবেছি, যদি সত্যিই কিং কংকে আমাদের চেনা মনুমেন্টের চূড়ায় দেখতে পাই!

বাড়িতে আসত 'মৌচাক।' এই ঘটনাকে জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য বলে মনে করি। 'মৌচাকে'র প্রসাদে টাটকা পড়েছিলেম 'যখের ধনে'র গল্প। 'যখের ধন' বা 'আবার যখের ধন' প্রতিটি অ্যাডভেঞ্চার-গল্পের বর্ণনাভঙ্গীটি এত হৃদয়গ্রাহী ছিল যে তা আমাদের মনোহরণ করত।

"এই তো টাঙ্গানিকা হ্রদ। কিন্তু এ কি হ্রদ, না, সমুদ্র?

চোখের সামনে আকাশের কোল্ জুড়ে থৈ-থৈ করছে শুধু জল আর জল— কোথায় তার ওপার, আর কোথায় তার তল।

এপারে তীরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর শ্যাম বনানী এবং আকাশের নীলমাখানো জল-আয়নায় নিজেদের ছায়া দেখে বনের গাছপালা যেন মনের আনন্দে মর্মরগান গেয়ে-গেয়ে উঠছে।" ('আবার যখের ধন')

"রাত-আঁধারে চুপি চুপি কালো জলে ভাসল আমাদের দুই নৌকো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনাই ঘটে নি— এমন কি আমরা যে কোনো অপ্রীতিকর ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করি নি, এ-বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাস্তি।

জনতার সাড়া নেই, তীরতরুর মর্মর ছন্দে তাল রেখে বনবাসী বাতাস শোনায় স্নিগ্ধ মাটির আর ঘন সবুজের গন্ধ-মাখানো নতুন নতুন গান এবং নদীর জল্‌সায় জলে জলে দুলে দুলে ওঠে কূল হারানো গতি-বীণার তান। কান পেতে শুনলে মনে হয়, অনন্ত নীলাকাশও তার

লুকিয়ে রাখা নীরব বীণার রন্ধ্রে জাগিয়ে তুলছে কল্পলোকের কোন্ মৌল রাগিণীর আলাপ। পৃথিবীর ধূলোর ঠুলিতে যার কান কালা, এ অপূর্ব আলাপ সে শুনতে পায় না— তাই এর মর্ম বোঝে শুধু কবি আর শিশু, ফুলপরী আর পাপিয়া!

এই শীতের ঠাণ্ডা রাতের সঙ্গে আজ পাপিয়ারা ভাব করতে আসে নি। ফুলপরীরাও কোন তীরে কোন্ বনে কোন্ শিশির ভিজানো বিছানায় ঘুমিয়ে আছে তার ঠিকানা জানি না, কিন্তু আমার মনের ভিতরে জাগল চিরন্তন শিশুর উল্লাস-কলরোল।

নৌকা চলেছে অন্ধকারের কালো-চাদরে গা মুড়ে,— চলেছে নৌকা। দাঁড়ে দাঁড়ে তালে-তালে বাজিয়ে চলেছে নৌকো জলতরঙ্গ বাজনা। দুকূলের কাহিনী ভুলিয়ে, সামনের অকূলের ইঙ্গিত জাগিয়ে চলেছে নৌকা, ঘুমের দেশে ঘুম-ভাঙানো সঙ্গীতের সুর বুন্‌তে বুন্‌তে।

তারপর চাঁদ উঠল দূর-বনের ফাঁকে। মনে হল, পূর্ণ প্রকাশের আগে যেন গাছের ঝিলিমিলির আড়াল থেকে চাঁদ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে নিতে চায়, পৃথিবীর উৎসব-আসরে আজ কত দর্শকের সমাগম হয়েছে!

ছড়িয়ে দিলে কে জলে-স্থলে মুঠো-মুঠো হীরের কণা! ওপারে নজর চলে না, এপারে দেখা যায় নীল স্বপ্নমাখানো বন আর বন। কত— কত দূর থেকে কোন্ একলা-পথিকের বাঁশের বাঁশীর মৃদু মেঠো-সুর ভেসে আসে যেন আমাদের সঙ্গে কথা কইতে। চাঁদ উঠছে উপরে— আরো উপরে। তার মুখে— শীতের মেয়ে কুহেলিকার আদর মাখা চুমোর ছোঁয়া। যত রাত হয়— নদীর আমোদ বাড়ে তত-- তার জলের নূপুর বাজে তত জোরে।

দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে অবশেষে জড়িয়ে এল আমার চোখের পাতা।" ('মুখ আর মুখোস')

এ কি অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী আর ডিটেকটিভ-উপন্যাসের বর্ণনা? এ'তো গদ্যে লেখা কবিতা। তখন তো জানতেম না, হেমেন্দ্রকুমার সত্যি কবি আর গীতিকার। কিশোরপাঠ্য উপন্যাসে এইসব কাব্যসুরভিময় বর্ণনা দিতে হেমেন্দ্রকুমার দ্বিধা করেন নি। এটাই তাঁর মহত্ত্ব। তিনি ছোটদের ছোট বলে অবজ্ঞা করেন নি। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি আর অনুভূতির 'পরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তাই এই-সব বর্ণনা পড়ে সেদিন আমাদের মন কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। হেমেন্দ্রকুমার বাঙালি কিশোরকে ডানপিটে করতে চেয়েছিলেন, তার সামনে জীবনের বিচিত্র গ্রন্থের পাতা মেলে ধরেছিলেন।

হেমেন্দ্রকুমারকে আমি দেখি নি। কিন্তু তাঁকে দেখেছে এমন একটি ছেলে আমার ইস্কুলের বন্ধু ছিল। মনে পড়ে, লাস্ট বেঞ্চিতে বসে 'যখের ধন' পড়ছি। পাশে বসে আছে গুপী। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কি রকম বই?

উত্তর দিলাম, খুব ভাল বই।

গুপী অবজ্ঞাভরে বলল, এ বই আমি আগেই পড়েছি, লেখককেও চিনি।

সিধে হয়ে বসি। বললাম, বাজে কথা বলিস না।

গুপীর উত্তর— বাজে কথা নয়, খাঁটি কথা।

টিফিনের ঘন্টা বাজতেই গুপীকে নিয়ে বেরোলাম। ইস্কুলের মাঠের এক কোণে গিয়ে তাকে দুপয়সার ঝাল-মুড়ি ঘুষ দিয়ে অনেক কথা জানলাম। চিৎপুর রোডের ওপর তাঁর বাড়ি। তিন-তলার বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় তিনি থাকেন। বাড়ির যে কোনো তলায় বারান্দা বা জানালায় দাঁড়ালে গঙ্গাকে দেখা যায়। কাছেই খোড়ো বা বিচালি ঘাট। চিৎপুর রোড দিয়ে ট্রাম চলে যায় শব্দ করে। উপরে শিল্পী হেমেন্দ্রকুমার গান বা গল্প রচনায় নিরত। বন্ধুবৎসল উদারহৃদয় আড্ডাবাজ হেমেন্দ্রকুমার দর্শনাথী গেলে খুশী হয়ে ওঠেন। হেমেন্দ্রকুমারের তিন তলার জানালা থেকে গঙ্গার বহু বিচিত্র রূপ দেখা যায়। শান্ত সকাল, নির্জন দ্বিপ্রহর আর মায়াভরা সন্ধ্যায় গঙ্গা অপরূপা হয়ে ওঠে। হেমেন্দ্রকুমারের হাসি আর গল্পে সব ভুলে যেতে হয়। তাঁর কাছে বয়স বা পদমর্যাদার বিচার নেই। ছোট-বড়ো সবাই তাঁর বন্ধু।

হেমেন্দ্রকুমার সম্পর্কে সেদিন গুপী অনেক কথা বলেছিল। গুপীর মামাবাড়ি চিৎপুর রোডে, হেমেন্দ্রকুমারের বাড়ির কাছেই। 'যখের ধন' পড়ে গুপীর বাসনা ছিল, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবে। একদিন নির্জন দুপুরে সাহস করে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেদিন থেকে হেমেন্দ্রকুমার তার বন্ধু। হেমেন্দ্রকুমার সম্পর্কে উপরের সব-কথাই এলোমেলো ভাবে গুপী বলেছিল। আর বহু অনুনয়ের পর আশ্বাস দিয়েছিল, এবার ইস্কুলের ছুটিতে সে যখন মামাবাড়ি যাবে, আমাকে তখম একদিন হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক গুপী, প্রতারক গুপী সে প্রতিশ্রুতি রাখে নি। কতদিন টিফিনের ছুটিতে তাকে ঝাল-মুড়ি খাইয়েছি, মার্বেলের গুলি কিনে দিয়েছি, জলছবি উপহার দিয়েছি। অম্লানবদনে গুপী তা নিয়েছে। আর ভরসা দিয়েছে, সে নিশ্চয়ই আমাকে হেমেন্দ্রকুমারের কাছে নিয়ে যাবে। তারপর বার্ষিক পরীক্ষান্তে নতুন ক্লাসে এসে দেখি গুপী নেই, ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে অন্য ইস্কুলে।

গুপী আমাকে ঠকালো বটে। কিন্তু একাধিক দিয়ে সে আমার উপকার করল। হেমেন্দ্রকুমার সম্পর্কে আমার কিশোর মনে তীব্র ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিয়ে গেল। তারপর নানা কাজে সুখে দুঃখে অনেকগুলি দিন স্রোতের মতো ভেসে গেল। কৈশোরের রঙীন দিনগুলি হারিয়ে গেল। ইস্কুল বদলে বদলে চলে গেলাম অন্যত্র। এলো যুদ্ধ, এলো দুর্ভিক্ষ, এলো স্বাধীনতা, এলো দাঙ্গা, এলো দেশভাগ, এলো উদ্বাস্তু। হেমেন্দ্রকুমারের কাছে আর যাওয়া হল না। চিৎপুর রোডে গঙ্গার ধারে সেই তিন-তলা বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় বসে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লেখনী চালনা করে শেষ বিদায় নিয়েছেন।

হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের একটি বর্ণনা এই সেদিন পড়লাম।

" যে ক'দিন সেখানে গিয়েছি একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। একটা নতুন অনুভূতি। গঙ্গার তীরে বাড়ি। হেমেন্দ্রদার কাছে গিয়ে বসলে মনে হয় জাহাজে ভেসে চলেছি। কতকাল যেন চলেছি জানা এক তীর থেকে অজানা আর এক তীরে। সন্ধ্যার আধা-অলো আধা অন্ধকারে মৃদু কুয়াসার আবরণে যখন নদীর এপারে ওপারে আলো জ্বলে উঠতে থাকে তখন সব মিলিয়ে বেশ একটা অবাস্তব উদাসকরা ভাব।" ('দ্বিতীয় স্মৃতি', শ্রীপরিমল

গোস্বামী, পৃ ১৮৬)

হেমেন্দ্রকুমারের কিশোর উপন্যাস আর গল্প স্কুল-জীবনে পড়েছি এক নিঃশ্বাসে! বহির্জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী, অজানা রহস্যভরা দেশের আকর্ষণ, জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা— সবটা মিলিয়ে একটা নতুন স্বাদ এনে দিয়েছিলেন হেমেন্দ্রকুমার।

মনে পড়ছে, কী কারণে বাড়িতে কিছুদিন পরে মৌচাকের বদলে 'রংমশাল' আসতে শুরু হল। এটিও চিত্তহারী কিশোরপত্রিকা। 'রংমশালে' ধারবাহিকভাবে বেরুত হেমেন্দ্রকুমারের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস— 'ভগবানের চাবুক।' তৈমুরলঙ্গ-এর ভয়ঙ্কর অভিযান কাহিনীকে তিনি রম্যভঙ্গীতে কিশোরদের কাছে উপস্থিত করলেন। আজো মনে পড়ে 'ভগবানের চাবুক' পড়ে কী ভাল লেগেছিল। ক্রমশঃ- প্রকাশ্য লেখার শিরোদেশে একটি ব্লক ছাপা হতো— একটি দীর্ঘ চাবুক পড়ে আছে, তারই পিছনে উদ্যতলম্ফ এক নিষ্ঠুর অশ্বারোহী। ইতিহাসরসের স্বাদ পেয়েছিলাম হেমেন্দ্রকুমারের কাছে।

কিন্তু, সবচেয়ে ভাল লাগত যখের ধন উদ্ধারের রোমঞ্চকর কাহিনী। আফ্রিকার অরণ্যে অজানা রহস্যভরা পরিবেশে বিমল কুমারের কীর্তি-কাহিনী সেদিন আমাদের কিশোরচিত্তকে অধিকার করেছিল।

আশ্চর্য সেই বর্ণনা! হেমেন্দ্রকুমার অনায়াসে সেই রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতেন। রত্নগুহার সন্ধানে বেরিয়েছে বিমল ও কুমার, সঙ্গে আছে মানিকবাবু, রামহরি আর বাঘাকুকুর, আর আছে সিংহদমন গাটুলা সর্দার।

কাবাগো-পাহাড়ের পাদদেশে বিমল-কুমার সদলবলে হাজির। এই পাহাড়ের চূড়ায় আছে রত্নগুহা। তা পাহারা দিচ্ছে কাফ্রি রক্ষীদল আর যক্ষের দল। পরদিন সকালে তারা কাবাগো-পাহাড়ে উঠবে। রাত্রে হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। না, বাজের শব্দ নয়, অসংখ্য ঢাক-ঢোলের আওয়াজ। কাবাগো পাহাড়ের রক্ষীরা যুদ্ধের বাজনা বাজাচ্ছে।

" দূরের ঢাকের আওয়াজ ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠতে লাগল, — ক্রমে আরো, আরো স্পষ্ট!

দুম্-দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ দুম্! যেন চার-পাঁচ শো ঢাক ঢোল বাজাতে-বাজাতে তালে তালে পা ফেলে কারা এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে!..

দুম্-দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ দুম্। ঢাক-ঢোলের শব্দে আর একতান সঙ্গীতে ক্রমে সারা বনভূমি গম্ গম্ করতে লাগল। তারপর আবার এক শব্দ। ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুক যেন কাঁপতে লাগল— টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্। মাটির উপরে তালে তালে পড়ছে হাজার সৈনিকের পা!...

ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ পা পড়ে মাটির উপরে তালে তালে,— আর — টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ কাঁপতে থাকে পৃথিবীর বুক! আর সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে শত শত ঢাকের বাদ্য!" (আবার যখের ধন)

কাবাগো পাহাড়ের রক্ষীদলের নিশীথ রাতে এই ভয়ঙ্কর আবির্ভাবের বর্ণনা হেমেন্দ্রকুমার

কত অনায়াসে অথচ কত নিপুণভাবে দিয়েছেন। এই বর্ণনা বঙ্গদেশের কত কিশোরচিত্তপটে উজ্জ্বল রঙে অঙ্কিত আছে।

আজ সে অপাপবিদ্ধ কৈশোর বহু পিছনে ফেলে এসেছি। ভেবে দেখতে ইচ্ছে করে, হেমেন্দ্রকুমার আমাদের সেদিন কী দিয়েছিলেন? তিনি আমাদের দিয়েছিলেন, অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ, অজানা দেশের রহস্যভরা কাহিনী আর বাঙালি যুবকের মৃত্যুস্পর্ধী অভিযান। তিনি আমাদের সামনে জীবনের রঙীন নিমন্ত্রণপত্রখানি খুলে ধরেছিলেন।

আরব্য উপন্যাস

'সন্ধ্যাকালে উজীর শাহরজাদীকে সুলতানের প্রাসাদে লইয়া চলিলেন, সুলতানের প্রাসাদ কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া কন্যাকে সুলতানের হস্তে সমর্পণপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। সুলতান শাহরিয়ার শাহরজাদীকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে বলিলেন। তাঁহার অতুল্য সুন্দর মুখ, কমনীয় কান্তি, বিকাশোন্মুখ যৌবনের লাবণ্যদীপ্তি দেখিয়া সুলতান বিমুগ্ধ হইলেন। কিন্তু শাহরজাদীর ইন্দীবরতুল্য নয়নে অশ্রু দর্শন করিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, উজীরকন্যা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার দুঃখে কি বল, সাধ্য হইলে আমি তাহা দূর করিব।'

শাহরজাদী বীণানিন্দিত স্বরে বলিলেন, 'জাঁহাপনা, আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে, তাহাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, সেও আমাকে প্রাণতুল্য ভালবাসে। আমার বড় ইচ্ছা, আপনি তাহাকে আজিকার রাত্রিটা আমার সহিত এক কক্ষে বাস করিবার অনুমতি দান করেন।' "

এই বর্ণনা ছোটবেলায় পড়েছি। মনশ্চক্ষুতে দেখেছি পারস্যাধিপতি সুলতান শাহরিয়ারের অন্দরমহল। এ সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি। রাত্রিশেষে প্রভাতেই নবপরিণীতার শিরচ্ছেদন হবে। প্রতি রাত্রে এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন সুলতান। নারীবিদ্বেষী সুলতানের নির্দেশে রাত্রিশেষে সেই সুন্দরীর জীবন সমাপ্ত হয়। উজীর-কন্যা শাহরজাদী স্বেচ্ছায় এই সুলতানকে বিবাহ করেছেন। তাঁর আশা তিনি এই নিষ্ঠুর নির্দেশ রদ করাবেন। তারপর যে অপূর্ব কৌশলে গল্পের মালা গেঁথে সুলতানের কৌতূহল এক সহস্র রজনী টেনে নিয়ে গেলেন, তারই অতুলনীয় বিবরণ 'আরব্য উপন্যাস' বা ' আরব্য রজনী' বা 'এক সহস্র এক রজনীর উপাখ্যান।'

মধ্যযুগীয় রোমান্সের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট নিদর্শন আমার জানা নেই। সমস্ত দুনিয়া মুগ্ধ হয়ে আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনেছে। অতৃপ্ত কৌতূহল ও অশান্ত জিজ্ঞাসায় শ্রোতার চিত্ত ব্যাকুল

হয়, দূর সিন্ধুপারে নতুন নতুন দেশে পাঠকমন ঘুরে বেড়ায়, বিজন বিপিনে ঘুরে ঘুরে উদ্‌ভ্রান্ত হয়।

আমি যখন 'আরব্য উপন্যাস' পড়ি তখন আমি কিশোর। কলকাতার স্কুলে সবে অবনীন্দ্রনাথ 'রাজকাহিনী' পড়েছি। তারপরই 'আরব্য উপন্যাস।' কলকাতায় এসেছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। তখনো কলকাতা কলকাতাই ছিল, অর্থাৎ শান্ত দুপুরে 'হ্যাপিবয় আইসক্রীম' হেঁকে যেত, ট্রামে মিড-ডে-কনশেসন পাওয়া যেত, বাজার ছিল সস্তা, বাসস্থান হয়নি দুর্লভ, বস্ত্র-ইন্ধন-তৈল-তণ্ডুল-চিন্তায় লোকে পাগল হয় নি। মনে আছে ছুটির দিনগুলোতে কখনো লেক ময়দানে কখনো বা গড়ের মাঠে আমরা অমৃত আস্বাদন করতাম।

রংপুর থেকে চলে এসে আমরা তখন দক্ষিণ কলকাতায় ট্রাম লাইনের কাছে একটি ছোট রাস্তায় তারা রোডে ভাড়াবাড়িতে উঠেছি। সেই রাস্তায় প্রায় সব বাড়ির সঙ্গেই আমাদের চেনাশুনো ছিল। প্রায় সব বাড়িতেই আমার অবাধ গতি ছিল। আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে থাকতেন বাণীদিরা। বাণীদির বাড়ি,— এটাই আমার কাছে সে বাড়ির সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল। আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, বাণীদি এক লাজুক কিশোরকে কী ভালবাসতেন! চকোলেট, টফি, আইসক্রীম, পাঁঠার ঘুঘনি, আলুর দম, ফুচকা, আলু কাবলি,— কত লোভনীয় খাবার না বাণীদি আমায় খাইয়েছেন। মা বলতেন, 'বেশি চকোলেট টফি খাসনি, দাঁত খারাপ হয়ে যাবে।'

বাবা বলতেন, ' রাস্তার জিনিস খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী।' এই সব অনুশাসন নত মস্তকে মেনে নিতাম। প্রমাণ দিতাম, টিফিনের পয়সা দিয়ে জলছবি আর মার্বেলগুলি কিনেছি। প্রমাণ পেয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতেন। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তাম বাণীদির কাছে। তাঁর কাছে সস্নেহ প্রশ্রয় আর অপরিমিত আদর পেয়েছি। এখন ভাবি, তার ফল ভাল হয়েছে, না, মন্দ হয়েছে। মন্দ হয়েছে — একথা স্বীকার করতে আমি রাজি নই।

কারণ বাণীদি কেবল আদর আর প্রশ্রয় দেননি, তিনি আমার গল্পের ক্ষুধাকে তীব্রতর করে তুলেছিলেন। বাবার কাছে আমরা অনেক জিনিস চেয়ে পাই নি, কিন্তু বই চেয়ে পাই নি, একথা বলতে পারি না। সেই পড়ার নেশাটা বাণীদির সাহায্যে আরো পুষ্ট হয়ে ছিল। মনে হয়, বাবা সেকথা জানতেন। তাই বাণীদির কাছে আমার যাওয়া কখনো বারণ করেন নি!

বাবার কাছে পেয়েছিলাম, হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'আরব্য উপন্যাস'। আর বাণীদি আমার উপহার দিয়েছিলে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'আরব্য রজনী।' এদুটি বই আমার সেই অপাপবিদ্ধ কৈশোরে রোমান্সের মেঘদূত। বইদুটি যত্ন করে রেখেছিলাম। কতদিন কতভাবে আরব্য উপন্যাসের গল্প পড়েছি, কখনো তা পুরনো হয়নি। যে-বই বারবার পড়া যায়, প্রতিবারই নতুন বলে মনে হয়, সে-বই আমার মতে সাহিত্যিকের অমরাবতীর অধিবাসী। 'আরব্য উপন্যাস' আর 'আরব্য রজনী'— দুয়ে মিলে আমার কাছে একটি নামে পরিচিত 'আরব্য উপন্যাস।'

বঙ্গদেশের দুই প্রবীণ প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান থেকে বই দুখানি বেরিয়েছিল। দীনেন্দ্রকুমারের

'আরব্য রজনী' প্রকাশ করেন বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আর হেমেন্দ্রলালের 'আরব্য উপন্যাস' প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স-এর সুধাংশু শেখর চট্টোপাধ্যায়। সেদিনের মুগ্ধ কিশোরের পক্ষ থেকে এঁদের ধন্যবাদ দিই। রঙে রেখায় ছবিতে অঙ্গসজ্জায় বইদুটি সেদিনের কিশোরচিত্ত লুঠ করে নিয়েছিল। অথচ দাম মাত্র দশ টাকা। পাতায় পাতায় রেখাচিত্র, মাঝে মাঝে বহুবর্ণ চিত্র, আরবী ঢঙের শিরোলিপি,— আমার মন কেড়ে নিয়েছিল।

বস্তুত এই সব ছবি রঙ রেখা মারফত আমি আরব্য উপন্যাসের রোমান্সজগতে প্রবেশ করেছিলেম।

আশ্চর্য পরিবেশ, আশ্চর্যতর কাহিনী, রুদ্ধশ্বাসগতি ঘটনাপ্রবাহ, রোমাঞ্চকর পরিণতি,— সবটা মিলিয়ে আরব্য উপন্যাস। কত যে বিচিত্র গল্প! সদাগর ও দৈত্যের গল্প, জেলে ও দৈত্যের গল্প, গ্রীকরাজ ও ডুবাল হাকিম, কৃষ্ণদ্বীপে রাজপুত্র, তিন রাজপুত্র ও পঞ্চ রমণী, সিন্ধবাদ নাবিক, তিনটি আপেল, নৌরেদ্দীন ও বদরেদ্দী, কুব্জ ও দর্জী, আবুল হাসেম সামসেল নীহার, বেদৌরা, নৌরেদ্দীন ও পারস্যরূপসী, রাজকুমার বাদের ও রাজকন্যা, প্রণয়ের দাস গানেম, জীন আলাসনাম ও দৈত্যরাজ, খোদাদাদ ও দয়িয়াবাদের রাজকন্যা, আবুহোসেন, আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ, খালিফের নৈশ ভ্রমণ, আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু, বোগদাদের সদাগর, মায়াঅশ্বের কাহিনী, রাজপুত্র আমেদ ও পরীবানু, ঈর্যান্বিত ভগিনীযুগল, উড়ো ঘোড়ার গল্প, — গল্পের পর গল্প, তার আর শেষ নেই।

আমার ত' প্রায় সব গল্পই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। বাণীদি বলতেন,— 'আজ জীন আলাসনাম ও দৈত্যরাজের গল্পটা আমায় মুখে মুখে বল।' মহোৎসাহে হাত নেড়ে বাণীদিকে গল্প শোনাতাম। একটি সহৃদয়া রমণীচিত্ত, আর-একটি প্রকাশব্যাকুল কিশোরচিত্ত,— দুয়ের আদানপ্রদানে আরব্য উপন্যাসের রোমান্স কলকাতার বুকে নবজন্ম লাভ করত। এখন বুঝতে পারি, বাণীদি আমার কী উপকার করেছেন! তিনি আমাকে কেবল আরব্য রজনীর গল্পের জগতে ছেড়ে দেন নি, রোমান্স আহরণ করে পুনঃসৃষ্টি করতে শিখিয়ে ছিলেন।

সেদিন থেকে আজ অনেকদূরে চলে এসেছি। কোথায় বাণীদি, কোথায় আমি! জানি না, আজ তিনি কোথায়! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার কলকাতাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম হুগলী জেলার ভাগীরথী তীরে। যখন স্বাধীনতার প্রাক্কালে কলকাতায় ফিরে এলাম, তখন সেই কলকাতাকে আর ফিরে পেলাম না। ফিরে এসে মনে মনে বলেছি, কোথাও প্রবাসী নই, এই কলকাতার থেকে আমার যে বিচ্ছেদ তা ক্ষণকালের। কিন্তু ফিরে এসে, তাকে আর পেলাম না। আমার কৈশোরের রোমান্স অন্তর্হিত, জানি না বাণীদি কোথায়!

তবু মন মানে না। ফিরে ফিরে সেই ফেলে-আসা সুখলোকের কথা মনে পড়ে। 'ফিরায়ে দিনু ঘরের চাবি, রাখিনা আর কোনো দাবী'— একথা বলতে মন চায় না। সেই পুরনো রাস্তায় আবার গিয়েছিলাম, কিন্তু সে পরিবেশ আর নেই। অনেক নতুন বাড়ি হয়েছে, পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে, বাঙালি-পাড়া হয়ে গেছে মাদ্রাজী-পাড়া। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে

পথ পিছনে ফেলে এলাম! কিন্তু রয়ে গেল আরবা উপন্যাসের সুখস্মৃতি।

আজ দু'যুগ পরে সে-দিনের সেই সুখস্মৃতি স্মরণ করি। ভেবেছিলাম, হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলে সেই মুগ্ধ কিশোর পাঠককে আর ফিরে পাব না। কিন্তু না, তাকে তো পেয়েছি। কালের শাসনকে অগ্রাহ্য করে ভালবাসার পতাকা তেমনি উড়ছে।

আরব্য উপন্যাসে যে রোমান্সের দীক্ষা নিয়েছিলাম, তাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। প্রাচ্য দেশীয় মধ্যযুগীয় রোমান্স, অলৌকিক বিবরণীতে পূর্ণ। জীন পরী হুরী দৈত্য যাদুগর আর সুলতান-উজীর-নাজির-শাহজাদা-শাহজাদী-দর্জি-জেলে-ফকির-দস্যু-দাস-তস্কর-নাবিক-সৈন্য-গৃহস্থ-ব্যবসায়ীর ভিড়ে সে জগৎ মুখরিত; আধুনিক জগৎ ও যুগ থেকে তা পশ্চাদ্বর্তী। মানি, সব সত্যি। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো সত্যি, এই অলৌকিক অসম্ভবের জগৎ থেকে একদিন আনন্দ পেয়েছিলাম। সে আনন্দ আজো রয়েছে হৃদয়ের গভীরে! আজ সাহিত্যপাঠ ও সম্ভোগের চরিত্র অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক জীবন জটিল , যন্ত্রণাক্ষুব্ধ, রক্তাক্ত। সাহিত্যসম্ভোগের সরল যুগ আজ আর নেই, লেখকের অন্তহীন আত্মজিজ্ঞাসা ও সংশয়ে পাঠকও আজ সংশয়ী ও উদ্বাস্ত। এদিনে আরব্য উপন্যাসের রোমান্সের কথা বললে আধুনিক সাহিত্যরুচির কাছে উপহসিত হতে হবে, একথা জেনেও বলি আরব্য উপন্যাস আমার ভালো লেগেছে। আজ সেই ভালোবাসার দানকে নতুন করে স্মরণ করি।

যেমন দৈত্য ও সওদাগরের গল্পটি— গল্পের মধ্যে গল্প— কাশীর কৌটার মতো— কৌটার মধ্যে কৌটা— অফুরন্ত জীবনবৈচিত্র্য নিয়ে সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। মনে আছে, বাণীদি বলতেন, 'প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণীর কাহিনীটা মনে আছে?'

সোৎসাহে ঘাড় নেড়ে বলতাম, হ্যাঁ।

— আচ্ছা বলো তো!

অমনি শুরু করে দিতাম গল্প।

আজ নতুন করে সে-সব সুখস্মৃতি মনে পড়ছে।

উজীরকন্যা শাহরজাদী তার বোন দিনারজাদীকে গল্প শোনাচ্ছেন। লক্ষ্য সুলতান শাহরিয়ার। রাতের পর রাত তন্ময় হয়ে গল্প শুনছেন শাহরিয়ার, আর দিনের পর দিন শাহরজাদীর প্রাণদণ্ড পেছিয়ে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত সুলতান প্রাণদণ্ড মকুব করে দিলেন। মনে পড়ে সহস্রাধিক রজনীর কাহিনীশেষে এই সংবাদ জেনে কী গভীর তৃপ্তি ও আনন্দে আমার মন ভরে গিয়েছিল।

দৈত্যের কাছে প্রথম বৃদ্ধ গল্প বলছে। গল্পের মধ্যে গল্প।

নিভৃতে বাগানে বসেছিল প্রথম বৃদ্ধ, রাখাল এসে সেলাম করে বলল, — খোদাবন্দ, আমি আপনাকে একটা জবর খোশ্‌খবর দিতে পারি— পছন্দ হলে বখশিশ চাই।

বৃদ্ধ বলছেন :

"আমি বললুম—মঞ্জুর। এইবার বল শুনি, কি তোর খোশ্ খবর।

রাখাল বললে— আমার একটি মেয়ে আছে। ছেলেবেলায় আমাদেরই পরিবারের এক

বৃদ্ধার নিকট থেকে সে ভালোরকম যাদুবিদ্যা শিখেছিল। কাল যখন মেষশাবকটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছিলুম তখনই তার উপরে মেয়েটার চোখ পড়ে। সে আমাকে ডেকে বললে— বাপজান, এই ভেড়ার বাচ্চাটিকে তোমার মনিব হত্যা করেন নি, সে খুব ভালই করেছেন। কারণ ওটা তো সত্যিকারের মেষ নয়, ও মানুষ, তোমার মনিবের স্ত্রী— মা ও ছেলে দুজনাকেই মেষে পরিণত করেছিল। তাই তার দেহ হতে হাড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি! এই অদ্ভুত কথা শুনে সমস্ত রাত আমার ঘুম হয়নি, ভোর হতে না হতেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

সংবাদটা পেয়ে গভীর একটা ব্যাকুলতায় আমার বুক দুলে উঠল। আমি এক রকম ছুটতে ছুটতেই রাখালের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম, তারপর তার মেয়েকে ডেকে বললুম— তোমার কথা যদি ঠিক হয় তবে আমার ছেলেকে ফিরে পাবার কি উপায় তাও আমাকে বলে দাও। যদি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারো তবে তোমাকে অদেয় কোনো জিনিসই আমার রইবে না।

মেয়েটি হেসে বললে— মেষশাবকটি যে আপনার ছেলে তাতে কিছুমাত্র ভুল নেই এবং তাকে আবার মানুষ করেও দিতে পারি। কিন্তু আমার দুটি শর্ত আছে— প্রথম শর্ত অনুসারে আপনি আমাকে আপনার পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করবেন। দ্বিতীয় শর্ত— আপনার বর্তমান স্ত্রী, যিনি এই ছেলে ও তাঁর মাকে মেষে পরিণত করেছিলেন— তাঁকে আমি যে দণ্ড দেবো তাতে আপনি বাধা দিতে পারবেন না।

আমি বললুম— তোমার এই দু শর্তের একটাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আর দেরী না করে আমার ছেলেকে আমায় ফিরিয়ে দাও।

মেয়েটি একটা পাত্রের ভিতরে খানিকটা জল নিয়ে নিজের মনে মনে কি একটা মন্ত্র পড়লে, তারপর তারই খানিকটা জল মেষশিশুর গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে বললে— খোদা যদি তোমাকে ভেড়া করেই থাকেন, আমার আর কিছু বলবার নেই। কিন্তু কোনো মানুষের কারসাজিতে যদি এই দেহ পেয়ে থাকো, তবে তুমি পূর্বে যেমন ছিলে আবার সেই আকার ধারণ করো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম— মেষশাবকটি আমার পুত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আনন্দের আবেগে আমার চোখে জলের ঝরণা জেগে উঠল। আমি তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলুম। তারপর ধীরে ধীরে হৃদয় যখন শান্ত হল, বললুম, বৎস, এই মেয়েটি তোমার জীবন দিয়েছে— এর হাতেই আমি তোমাকে সঁপে দিচ্ছি। তুমি একে বিবাহ করে সুখী হও।

মেয়েটি হাসতে হাসতে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর একটু বাদেই যখন ফিরে এলো দেখি, দড়িতে বেঁধে এই হরিণীটিকে নিয়ে এসেছে।

বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে বললে— খোদাবন্দ, এই আপনার পত্নী। পৃথিবীর আর কারো অপকার যাতে করতে না পারে তাই একে আমি হরিণে পরিণত করেছি। যদি অপরাধ করে থাকি মার্জনা করুন।

আমি বললুম— তুমি কোনোই অপরাধ করো নি বাছা—পাপীর উপযুক্ত দণ্ড হয়েছে।

তারপর ছেলে-বৌকে ঘর সংসার বুঝিয়ে দিয়ে মুসাফির হয়ে আমি পথে বেরিয়েছি। কিন্তু পথে বেরিয়েও নিস্তার পাইনি। আমার স্ত্রীর অপরাধ যে অত্যন্ত গুরুতর তাতে সন্দেহ নেই। তবু তার প্রতি আমার যে কর্তব্য আছে, তার এই চরম দুর্দশার দিনে সে কথাটাকেও তো আমি ভুলতে পারছি নে। তাই সংসার ছেড়ে আসবার সময়েও তাকে ছেড়ে আসা সম্ভবপর হয় নি আমার পক্ষে। তাই আজো এই হরিণীটি চলেছে আমার সঙ্গে সঙ্গে পথচলা জীবন-সঙ্গিনীরূপে।''

এই গল্পের নির্মম কারুণ্য আমাকে সেদিন অভিভূত করেছিল। বলতে লজ্জা নেই, আজো করে। স্পষ্ট মনে পড়ে, তারপর থেকে মেষশাবক দেখলে চমকে উঠতাম। আজো চমকে উঠি। মনে হয়, এই ভেড়াটি বোধ হয় দৈত্য ও সওদাগরের গল্পের প্রথম বৃদ্ধের পুত্র। এর পর কলকাতা ফিরে এসে পশুশালায় মেষ, হরিণী দেখে ঐ গল্পের কথাই মনে হয়েছে। ভেবেছি আমার হাতে যদি রাখাল-কন্যার মতো যাদুক্ষমতা থাকত, তাহলে এদের আমি মানুষ করে দিতাম।

আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল সিন্দবাদ নাবিকের কাহিনী! অনেক ভেবে দেখেছি, তার কারণ, সিন্দবাদের সাতবার সমুদ্রযাত্রা। এই যাত্রায় রোমাঞ্চ আর অ্যাডভেঞ্চার কিশোরচিত্তে দোলা দিয়ে ছিল। সেদিন মনে মনে কূলহীন সীমাহীন সুনীল সমুদ্রের কথা ভেবেছি। আর সমুদ্র দেখব বলেই পুরী যেতে চেয়েছি। কিন্তু ইশকুল-জীবনে আমার সে সৌভাগ্য হয় নি। বড়ো হয়ে পুরীতে গিয়ে সমুদ্রকে দেখেছি, কিন্তু সিন্দবাদ নাবিকের সেই রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারি নি। বারবার মনে হয়েছে, আরব্য উপন্যাস-পড়া মুগ্ধ মন নিয়ে যদি সমুদ্রকে দেখতে পারতাম!

সিন্দবাদ নাবিকের সাতবার সমুদ্র অভিযানের মতো রোমাঞ্চকর কাহিনী দুনিয়ায় সাহিত্যে বিরলদর্শন। বারবার পড়েছি, তবু কখনো পুরনো হয় নি। বাগদাদ-অধিপতি হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে বাগদাদ নগরের এক সুরম্য অঞ্চলে সুরম্য প্রাসাদের সুরম্য ঘরে বসে নাবিক সিন্দবাদ যখন বন্ধুদের ও দরিদ্র শ্রমজীবী সিন্দবাদকে তার আশ্চর্য অভিযানের গল্প বলছিল, তখন যদি সেখানে উপস্থিত থাকতে পারতাম! যদি বিপদের মাঝে অকূল সমুদ্রে নাবিক সিন্দবাদের সঙ্গে পালতোলা জাহাজে করে যেতে পারতাম! যদি তার সঙ্গে অথৈ জলে সাঁতার দিতে পারতাম! আমার কিশোরচিত্তে কল্পনার রঙীন ফানুস ওড়াতে মানা ছিল না।

সিন্দবাদ নাবিকের গল্প আমার কাছে চিরনূতন গল্প! তখন মনে হত বাগদাদ নগরে তার ঘরে বসে তার মুখে গল্প শুনছি!

''প্রথমবার আমরা পারস্য উপসাগরপথে পূর্বভারতের অভিমুখে যাত্রা করলাম। এই উপসাগরের পর ভারত মহাসাগর। প্রথমে কয়েকদিন আমি সমুদ্রপীড়ায় কাতর ছিলাম, কিন্তু শীঘ্রই আমার সে পীড়ায় উপশম হল, তারপর আমি আর কখনো সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হই নি। চারদিকে জল। সেই সুনীল চঞ্চল জলদেশের রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমরা

সেই সংক্ষুব্ধ জলরাশি ঠেলে এগিয়ে চললাম। কয়েকটি দ্বীপে উপস্থিত হয়ে বন্দরে জাহাজ নোঙর করলাম, কিছু পণ্যদ্রব্যও বিক্রয় করলাম। তারপর আবার যাত্রা। সুনীল জলরাশি, সুনীল আকাশ, শ্বেত সামুদ্রিক পাখি আর রঙীন উড়ুক্কু মাছ, — এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম। একদিন আমাদের জাহাজে পাল তুলে অনুকূল বাতাসে জলরাশি ঠেলে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় অদূরে একটি ছোট দ্বীপ দেখতে পেলাম। এই দ্বীপ দেখে জাহাজের কাপ্তেন পাল নামাবার আদেশ দিলেন, তারপর এই দ্বীপে যারা নামতে চায় তাদের তৈরী হতে বললেন। কয়েকজন আরোহীর সঙ্গে আমিও জাহাজ থেকে এই দ্বীপে অবতরণ করলাম এবং দ্বীপের মাঝখানে পৌঁছে আহারাদির আয়োজন করলাম। আমরা পান ভোজনে রত, এমন সময় দ্বীপটি হঠাৎ প্রবলবেগে নড়ে উঠল, বোধ হল যেন মহা ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে! জাহাজের আরোহীরা চীৎকার করে আমাদের জাহাজে ফিরে যেতে বললেন, কারণ দ্বীপ ভেবে যার উপর নেমেছিলাম তা দ্বীপ নয়, একটি যোজনব্যাপী তিমি। তারই পিঠের উপর আমরা পান ভোজন করছিলাম।

জীবন রক্ষার জন্য কেউ নিকটবর্তী নৌকায় লাফ দিয়ে পড়ল, কেউ বা তিমির পিঠ থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল ও সাঁতার কেটে জাহাজে পৌঁছতে চেষ্টা করল। কিন্তু আমি হতভম্ব হয়ে কিছুই করতে পারিনি। আমি তিমির পিঠেই রয়ে গেলাম। সেই বিশাল তিমি সমুদ্রগর্ভে ডুব দেওয়ামাত্র আমি অগাধ জলে পড়লাম। সামনেই একটি তক্তা দেখে তার উপর উপর ভর দিয়ে ভাসতে লাগলাম। জ্বালানীর জন্য জাহাজ থেকেই তক্তা আনা হয়েছিল। ইতিমধ্যে যারা জাহাজে উঠতে পেরেছিল, সুবাতাস পেয়ে কাপ্তেন তাদের নিয়েই ভয়ে ব্যস্ততায় তখনই জাহাজ ছেড়ে দিলেন। আমি কত চীৎকার করলাম, কেউ শুনতে পেলে না। দেখতে দেখতে জাহাজ দূরে চলে গেল। আমি ক্ষুদ্র তক্তাটির উপর ভর দিয়ে সমুদ্র তরঙ্গে ভাসতে লাগলাম। এক দিন এক রাত সেভাবেই সমুদ্রবক্ষে কাটল, পরদিন সকালে দেহে বল নেই। হৃদয়ে আশাও নেই। কিন্তু আল্লার দোয়া, আমি প্রায় অচেতনভাবে ভাসতে ভাসতে তরঙ্গবেগে একটি দ্বীপের প্রান্তে এসে পড়লাম। অনেক কষ্টে তটভূমিতে এসে জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে পড়ে রইলাম। অনেকক্ষণ বাদে চেতনা ফিরে এলো, উঠে বসে দিখে সূর্যোদয় হচ্ছে, পাখিরা গান গাইছে, সুন্দর দ্বীপটি ছবির মতো শোভা পাচ্ছে। মনে মনে আল্লা স্মরণ করে উঠে দাঁড়ালাম দেখি একটি ঘোড়া চরছে। কাছে যেতেই হঠাৎ একটি লোক আবির্ভূত হল, আমার অবস্থা দেখে তার দয়া হল, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খেতে দিল, দুদিন বাদে খেতে পেয়ে মনে হল প্রাণ ফিরে পেলাম। তখন সে আমাকে সেই দ্বীপের রাজা মিরেজীর কাছে নিয়ে গেল।"

শুরু হল সিন্দবাদ নাবিকের জীবনে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

এইসব গল্প যতবার পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই। সেদিন তা আমাকে মুগ্ধ, ভীত, দুঃখিত, ক্রুদ্ধ ও আনন্দিত করেছে। আরব্য উপন্যাসের গল্পের নানা চরিত্রের সঙ্গে আমি কল্পনারথে চড়ে কত দেশবিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। বড়ো হয়ে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ রিচার্ড এফ বার্টনের

অসাধারণ অনুবাদের কিছু কিছু পড়েছি। কিন্তু ছোট বেলায় 'আরব্য উপন্যাস' ও 'আরব্য রজনী' পড়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, তা আর কোনোদিন পেলাম না। বস্তুত, সেই কিশোরকালটাই ছিল রোমান্সের জগৎ। অসম্ভবের দেশে, জীনপরীদের সাহচর্যে, জাদুগর দৈত্য সুলতান ধনীদের সংসর্গে, রাজপুত্র রাজকন্যা উজীরকন্যার সান্নিধ্যে কত যে সুখ পেয়েছি, তা আজ আর সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত ক রতে পারি না। তবু ফিরে ফিরে সেদিনের সেই রোমান্স-সম্ভোগের কথা মনে পড়ে। বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক সুনীল অকূল সমুদ্র, তারই মাঝে পালতোলা জাহাজ, তার মাস্তুলে বসে এক সুদেহী তরুণ দূর নীল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে গান গাইছে :

ম্যঁায় বনুঙ্গা মাল্লা।
জাউঙ্গা উস্‌পার আল্লা।।

দেখতে দেখতে রক্তমেঘে সূর্য পশ্চিমসমুদ্রে অস্ত গেলেন, নেমে এলো শর্বরী, আর জাহাজকে দেখা যায় না, কেবল তরঙ্গের কল্লোল, চল্লিশ দাঁড়ের শব্দ আর দূর থেকে গুঞ্জনের মতো ভেসে আসে গান, বেহিসেবী যৌবনের গান, অ্যাডভেঞ্চারের গান।

ম্যায় বনুঙ্গা মাল্লা।
জাউঙ্গা উস্‌পার আল্লা।

ঐ গান সেদিন আমার কিশোরচিত্ত থেকে উৎসারিত হয়েছিল, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

প্রভাতকুমার

রবীন্দ্রনাথের গল্প ছাড়া আর কার গল্প কৈশোরে আমার মনোহরণ করেছিল,— এই প্রশ্নের উত্তরে বিন্দুমাত্র না ভেবেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি, — প্রভাতকুমারের গল্প। বাংলা কথাসাহিত্যক্ষেত্রে তিরিশের দশকে যে-সব গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে এবং প্রতিনিয়তই যা ঘটে চলেছে, সে ক্ষেত্রে প্রভাতকুমারের বিরতিহীন জনপ্রিয়তা আমাদের চমকিত করে। পরিচিত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখভরা আলেখ্য হল প্রভাতকুমারের নিটোল গল্প। এই গল্পের রসের আকর্ষণে আজো আমরা মুগ্ধ হই। যুগরুচি ও পাঠকরুচির বহুতর পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রভাতকুমারের গল্প বেঁচে আছে, অর্ধ-শতাব্দী পরিবর্তন-স্রোতের আঘাত সয়ে নিয়েও পাঠকের মনোহরণ করছে। তাই মনে হয়, আমি যে একদিন প্রভাত-গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তার জন্যে কোন লজ্জা নেই, এবং আজো মুগ্ধ হই, তার জন্যেও কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই।

'প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্পে'র নতুন সংস্করণটি যেদিন হাতে এলো সেদিন বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ে গেল বসুমতী সংস্করণ প্রভাত-গ্রন্থাবলীর এক খণ্ড বহুদিন পূর্বে কার হাত থেকে উপহার পেয়েছিলাম। সে কি আজকের কথা! আমার সেই স্বপ্নভরা দ্বিতীয় যুদ্ধ-পূর্ববর্তী কলকাতার কথা, আমার অপাপবিদ্ধ কৈশোরের কথা, আমরা প্রথম সাহিত্যপ্রেমের কথা। আমি যে খণ্ডটি উপহার পেয়েছিলাম, তাতে ছিল প্রভাতকুমারের দুটি উপন্যাস— 'সিন্দুর কৌটা', 'রমাসুন্দরী', একটি ভ্রমণকথা— 'বিলাত ভ্রমণ' ও একটি গল্প সংকলন 'নব-কথা'। এই খণ্ড পড়েই আমি প্রভাতকুমারের মহাভক্ত হয়ে উঠেছিলাম এবং দেশ-বিদেশের হরেক-রকম চতুর বিশ্লেষণধর্মী গল্প পড়া সত্ত্বেও এই ভক্তিটা রয়ে গেছে।

কিন্তু আগের কথা আগে বলি।

আমরা তখন থাকি লেক রোডে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বেকার কলকাতা। এখনকার তুলনায় শতাব্দী-পাদপূর্বের সেই কলকাতার জীবনকে রীতিমত সুখের জীবন বলা যায়। মিড-ডে কনসেশন ট্রাম-ভাড়া দু পয়সা, কোয়ার্টার পাউন্ড পাউরুটি দু পয়সা। এক টাকায় ভালভাবে বাজার হয়ে যেত। সাড়ে ছ' আনায় আরাম করে ছারপোকা-বিহীন সিটে বসে সিনেমা দেখা যেত, দৈনিক পত্রিকা এক আনায় ষোল পৃষ্ঠা পাওয়া যেত। গয়লা দুধ নিয়ে সাধাসাধি করত, মুদি খাতির করে সরু চালের বস্তা খুলে দেখাত, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় 'টু-লেট' নোটিশ ঝুলত, পছন্দ মত বাড়ি ভাড়া করা যেত চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায়। মার্বেল গুলি ছিল এক পয়সার চারটে, ছোট ঘুড়ি এক পয়সা, বড় ঘুড়ি দু পয়সা, ঝাল-মুড়ি এক পয়সা, হ্যাপি-বয় আইসক্রীম দু পয়সা। সেই স্বর্গলোক থেকে কলকাতার পতন ঘটেছে বহু দিন।

সে দুঃখের কথা থাক, সুখের কথা বলি। লেক রোডে আমরা যে বাড়িতে থাকতাম তার এক তলায় দু-তলায় ছ'খানি ঘর, একটি মস্ত ছাদ। ঐ ছাদে উঠে ঘুড়ি উড়াতাম আর-'পারে না— হেরে গেলো— দু ও-ও-ও' বলে হেরো ছেলেকে ধিক্কার দিতাম, তার কাটা ঘুড়ি হেলে-দুলে নীলাকাশে ভেসে যেত। আমাদের বাড়ির বিপরীত দিকে ছিল আমার সহপাঠী রণেনদের বাড়ি। লেক রোডে আরো দু-তিনটি ছেলে ছিল: জগা, বেঁটে, ঘোঁতনা, ভানু। আমরা সবাই কালীধন ইনসটিটিউশনে পড়তাম। স্কুল বসত তখন লেকে রোডে। এখন যেখানে চারুচন্দ্র কলেজ।

আমাদের প্রাত্যহিক রুটিন ছিল এই রকম— সকালে উঠে যা-হোক করে স্কুলের টাস্ক সেরে বাজার করে দিয়ে এক রাউন্ড মার্বেল গুলি খেলা। তারপর ভাত খেয়ে স্কুল। টিফিনে আবার গুলি খেলা। বিকেলে জলখাবার খেয়ে লেক ময়দানে গিয়ে ফুটবল খেলা ও বেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারপিট। মারপিট হত জমি দখল নিয়ে। কে কোন জায়গায় খেলবে, তা নিয়েই মারপিট হত। তারপর সন্ধে। ফিরে এসে রণেনদের বাড়িতে আর এক চোট আড্ডা, যতক্ষণ না বাবা বাড়ি ফিরছেন।

সেদিনও যথানিয়মে সন্ধের মুখে রণেনদের বাড়িতে আড্ডা হচ্ছে। তর্ক হচ্ছিল কুস্তিতে কার বেশি নৈপুণ্য, তা নিয়ে। শীঘ্রই আমরা কথা থেকে কাজে নেমে পড়লাম। আমি জগা ও

ভানুকে চিৎ করে দিলাম! তারপর লাগলাম বেঁটের সঙ্গে। বেঁটের সহ্যশক্তি ছিল অসাধারণ। তার ছিল দু'হাতের দুটো করে আঙ্গুল জোড়া। বেঁটেকে চেপে ধরলাম, কিছুতেই সে হার স্বীকার করে না। বাকি তিনজনে হাততালি দিয়ে ও মন্তব্য করে দুজনকে সমান উৎসাহ ও প্ররোচনা দিতে লাগল। শেষ কালে রণেন বললে— এবার ছেড়ে দে। আমি ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বেঁটে উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে শুয়ে শুয়েই আমরা ডান পা ধরে টান মারল। এই আকস্মিক টানে আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম ঘরের এক কোণে, সেখানে ছিল ভারি ভারি তিনটে ট্রাঙ্ক। ঐ ট্রাঙ্কের কোণে গিয়ে আমার মাথাটা লাগল। মুহূর্তের মধ্যে আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল। দু-তিন মুহূর্ত পরে আবার দৃষ্টি ফিরে পেলাম। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারি না। ঘরের কোণে স্থাণুর মতো বসে রইলাম। তখন বেঁটে এসে হাত ধরে টানল— 'কিরে ওঠ।' তবু উঠি না। তখন রণেন এগিয়ে এসে চীৎকার করে বলল— 'অরুণের মাথা ফেটে গেছে'। তখন ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে দেখি, ভিজে ভিজে লাগল। মাথার ডান দিক থেকে ধীর গতিতে রক্ত বেরুচ্ছে। ওরা সবাই মিলে চীৎকার শুরু করল। রণেনের মা চীৎকার শুনে এলেন, সবাইকে বকুনি দিলেন, আমার বাড়িতে খবর দিলেন। সবাই ধরাধরি করে আমাকে রাস্তার ওপারে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। মা বকাবকি করতে লাগলেন, ক্ষতস্থানে তুলো চেপে ধরলেন। কিন্তু সমানে রক্ত পড়তে লাগল। ভাইবোনেরা ঐ দৃশ্য দেখে কাঁদতে লাগল।

আমি তখন আর কিছুই ভাবছি না, কেবল মনে হচ্ছে, বাবা বাড়ি ফিরলে কী হবে। অবশেষে বাবা এলেন, ডাক্তার এলেন, ট্যাক্সি এলো, বাবা আমাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। আউটডোরে যখন গেছি তখন শার্ট গেঞ্জি রক্তে ভিজে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইমার্জেন্সি টেবিলে তখনই কাটা ছেঁড়া সেলাই হ'ল, ওয়ার্ডে ভর্তি হয়ে গেলাম, বাবা চলে গেলেন।

মাত্র দু ঘন্টার মধ্যে অন্য জগতে চলে এলাম। বাবা চলে যাবার পর মন কেমন করতে লাগল। এতক্ষণে বাড়ির কথা, স্কুলের কথা, খেলার কথা— সব মনে পড়তে লাগল আর কান্না পেতে লাগল। ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছি, তবু কি রকম মানসিক ক্লেশ বোধ হতে লাগল। খানিক পরে একটি নার্স এলেন, ভারি মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি হাসি। হাতে মেজার গ্লাসে ওষুধ। বললেন — 'এটা খেয়ে নাও।' খেয়ে নিলাম। বিছানার চাদর ঠিক করে বললেন— ' কি বাড়ির জন্যে খোকার মন কেমন করছে?' গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলাম — 'খোকা নই, আমার নাম অরুণ।' উনি হেসে দিয়ে বললেন— 'আচ্ছা, এবার থেকে তাই বলব!' সেদিন রাতে তাঁর ডিউটি ছিল।

এঁর নামটা আজ পর্যন্ত আমার স্পষ্ট মনে আছে— অপর্ণা লাহিড়ী। জানি না, আজ তিনি কোথায়। সেদিন তিনি ছিলেন হাস্যময়ী তরুণী নার্স, জানি না আজ কোথায় আছেন, কী করছেন। জানি না, কোনোদিন তাঁর চোখে এ' লেখা পড়বে কি না। যদি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয় খুব খুশী হবো।

অপর্ণাদি যদি না থাকতেন তবে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পক্ষকাল বাস আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠত। স্নেহ দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে তিনি আমাকে সান্ত্বনা ও ভরসা দিয়েছিলেন। সেই প্রথম মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করলাম। আমার সামনের বেডে একটি রোগী এক দুপুরে তিন ঘণ্টা প্রলাপ বকে শেষ হয়ে গেল। সমস্ত ওয়ার্ড স্তব্ধ হয়ে সেই দৃশ্যকে দেখল। আমরা দেখলাম, মানুষের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যুর জয় ঘটল। আবার বিপরীতটাও দেখেছি— মৃত্যু পরাস্ত হয়ে চলে গেছে।

আমি দিন-তিনেকের মধ্যে বিছানায় উঠে বসলাম। সময় আর কাটে না। বাবা এলে বলতাম— গল্পের বই নিয়ে আসতে।

হেমেন্দ্রকুমার, শিবরাম, কুলদারঞ্জন, সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ — যত বই বাড়িতে ছিল, সব শেষ। আরো বই চাই। বাবা তখন পাঠ্যবই এনে দিলেন। মনে আছে, আমাদের ইতিহাস বই শেষ করে ফেলেছিলাম একদিনে। অপর্ণাদির সঙ্গে এর মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, কাগজে মুড়ে টফি-চকোলেট তিনি আমার জন্য নিয়ে আসতেন। তাঁর ডিউটি বদল হলে আমার খুব খারাপ লাগত। মনে হয়, তাঁরও খারাপ লাগত। আমার কাতর অনুনয়ে, তিনি আমার ওয়ার্ডেই ডিউটি নিতেন। মনে আছে, অন্য দু-একজন নার্স ঠাট্টা করেছিল। সেদিন রাতে অপর্ণাদিকে বললাম— 'তুমি চলে যাও, ওরা ঠাট্টা করে।' উনি হেসে পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন--- 'বোকা ছেলে! তাতে কি হয়েছে। জানো, তোমার মত আমার একটি ভাই আছে।' এর উত্তরে সেদিন কিছু বলি নি, কেবল অপর্ণাদির হাতটা চেপে ধরেছিলাম। উনি হেসে বললেন,— 'ছাড়ো এখন, পরে আসব।'

শেষ পর্যন্ত অপর্ণাদিকেই বললাম— 'বই দিন, পড়ব।'

— 'কী যে তোমায় দিই। তোমার ত' সবই পড়া। আচ্ছা দেখি।'

তারপরদিন তিনি আমায় এনে দিলেন প্রভাত-গ্রন্থাবলীর একটি খণ্ড। সেটির কথাই আগে উল্লেখ করেছি। মনে আছে, দিন তিন-চার এটি নিয়ে মত্ত ছিলাম। অপর্ণাদি খুশী হয়ে বলেছিলেন, 'ওটা তুমি নাও। আমি তোমাকে দিলাম।'

যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাই সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার হঠাৎ আমায় ছেড়ে দিলেন। তখন অপর্ণাদি ডিউটিতে ছিলেন না। বাবাকে বললাম— 'অপর্ণাদির সঙ্গে দেখা হলো না।' ডিউটিতে যে নার্স ছিলেন, তিনি বললেন— 'আজ আর দেখা হবে না, আগামী কাল।' সেই প্রত্যাশিত আগামী কাল আর এলো না। ডাক্তার ডিসচার্জ-সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে বাবাকে বললেন, 'ঠিক আছে, এখুনি নিয়ে যান।'

সেই সন্ধ্যায় চলে এলাম, অপর্ণাদির সঙ্গে আর দেখা হলো না। জানি না আর কোনদিন জীবনের কোনো পথের মোড়ে তাঁর দেখা পাবো কি না। সেদিন হাসপাতাল থেকে চলে আসার সময় অপর্ণাদির উপহার প্রভাত-গ্রন্থাবলীর ঐ খণ্ডটি নিয়ে আসতে ভুলিনি।

অপর্ণাদির দৌলতে প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। গত

ষাট বছরে সে পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়েছে। আমি আজো প্রভাতকুমারের গল্পের মুগ্ধ পাঠক।

'নব-কথা'র সংকলিত যে গল্পগুলি এই খণ্ডে পড়েছিলাম, সেগুলি এই — অঙ্গহীনা, হিমানী, ভূত না চোর?, বেনামী চিঠি, কুড়ানো মেয়ে, কাজিরবিচার, একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত, কাটা-মুণ্ড, পত্নীহারা, ভুল-ভাঙ্গা, দেবী, শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি, ভিখারী সাহেব, বিষবৃক্ষের ফল, শাহজাদা ও ফকীর কন্যার প্রণয় কাহিনী, বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার, দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর, বউ-চুরি, প্রিয়তম, ছদ্মনাম, কুলির মেয়ে, সচ্চরিত্র, বলবান্ জামাতা, গহনার বাক্স।

এইসব গল্পের সঙ্গে যোগ করতে পারি 'শ্রেষ্ঠ গল্পের' অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গল্প— যেমন— মাস্টার মহাশয়, পূজার চিঠি, কাশীবাসিনী, প্রণয়-পরিণাম, বিবাহের বিজ্ঞাপন, ফুলের মূল্য, রসময়ীর রসিকতা, মাতৃহীন, আদরিণী, খোকার কাণ্ড, নিষিদ্ধ ফল, হীরালাল, পোষ্টমাস্টার, বি-এ পাস কয়েদী।

প্রভাতকুমারের গল্প ষাট বছর আগে আমাকে মুগ্ধ করেছে, আজো করে। প্রভাত-গল্পের চিরনবীনতা এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। প্রভাতকুমারের কথনভঙ্গিটি এত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত যে শৈল্পিক কৃত্রিমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। মনে হয় আমাদের পরিচিত জীবনের একটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে প্রভাতকুমার তাঁর গ্রন্থে যুক্ত করে দিয়েছেন।

সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গল্পের পরিমিতিবোধ ও গ্রন্থনৈপুণ্য। এই বিদ্যায় প্রভাতকুমার 'উস্তাদোঁকী উস্তাদ।' যে কোনো গল্পকার প্রভাতকুমারের কাছে এই বিদ্যার পাঠ নিতে পারেন। জীবনের যে খণ্ডাংশকে তিনি বেছে নেন তা মুহূর্তের মধ্যে পাঠককে সমগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করে। পরিবেশনের মুন্সিয়ানায় তিনি গল্পকে রসোত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। আবার ঘটনাবিন্যাসচাতুর্যে তিনি গল্পরস জমিয়ে তুলেছেন। প্রসাদগুণে তাঁর গল্প চিত্তহারী হয়েছে!

কৌতুকরস, বিশুদ্ধ কৌতুকরস প্রভাতকুমারের প্রধান অবলম্বন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাৎসল্যরস ও মানবপ্রীতি। জীবনকে তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন, উদার মানবতাবোধের প্রশস্ত ক্ষেত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

প্রভাতকুমারের গল্পের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য তার বাস্তবসত্যে নিষ্ঠা। তিনি কোথাও রোমান্টিক কল্পনার রঙীন কল্পলোকে বিহার করেন নি, ভাববাদের প্রেরণায় বাস্তবকে লঙ্ঘন করেন নি। বিংশ শতকের প্রথম পাদে বাংলা দেশ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের ধনী-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের সামাজিক জীবনের বাস্তব-চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। প্রভাতকুমার তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে পদার্পণ করেন নি। তাঁর সকল চরিত্রই তাঁর চোখেদেখা। তাঁর চোখে দেখার শিল্পরূপায়ণ তাঁর গল্প। বিলাতী জীবনের কিছু গল্পও তিনি লিখেছেন কিন্তু তাঁর অনুরাগ বাঙালি জীবনের হাসিকান্নার ভাগীরথী অনুসরণে।

প্রভাতকুমার তাঁর গল্পজগতের নর নারীকে যে স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয় দিয়েছেন তাতে তাঁর

পিতৃহৃদয়ের পরিচয় পাই। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রচুর পরিমাণে কৌতুকরস, যার উৎস বস্তুনিষ্ঠা।

যেমন দেখি 'পূজার চিঠিতে'। এই গল্পে প্রোতিষভর্তৃকা পূজার ছুটিতে স্বামীর আগমন প্রত্যাশায় চিঠি লিখছে। এই চিঠিই গল্প। দাম্পত্যপ্রেমের মধ্যে যে কৌতুক সৃজনের অবকাশ আছে, তার পূর্ণ সুযোগ এখানে প্রভাতকুমার নিয়েছেন।

বিরহব্যাকুলা পত্নী সুরবালা তাঁর হৃদয়নিধি, কলাকাতায় পাঠরত স্বামী শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাগলপুর থেকে চিঠিতে ব্যাকুলতা জানিয়েছে। স্বামীর চিঠি পেয়ে তার আনন্দ জানিয়ে সুরবালা লিখেছে :

"জিজ্ঞাসা করিয়াছ আমার জন্য কি আনিতে হইবে? আমার জন্য আর কি আনিবে ভাই? আমাদের কি আর এখন সখ করিবার বয়স আছে? খোকাবাবুর জন্য ভাল করিয়া পোষাক লইয়া আসিও আর যাহা যাহা ভাল দেখ তাহাই আনিও। আর অধিনীর জন্য যদি নিতান্তই কিছু আনিতে হয়, তবে একখানি টিয়ে রঙের কাপড়, তাহার জমিটা হইবে টিয়া পাখীর মত সবুজ, পাড় হইবে ঠোঁটের মত লাল। এক বোতল কুন্তলীন আনিও— এবার পদ্ম গন্ধ আনিও, গোলাপ গন্ধ-সুবাসিত অনেক মাখা হইয়াছে! খান দুই লেবুর সাবান, এক বাক্স ভাল সোপ, দুই জোড়া জুবিলী চুড়ি— সরুগুলি আনিবে, মোটাগুলি দেখিতে ভাল নয়, এক শিশি কুন্তলীনওয়ালাদের এসেন্স দেলখোস, সাদা কালো ছাই রঙের তিন বাণ্ডিল পশম, আর পার ত কোন ভাল দোকান হইতে একটি মাথায় পরিবার রূপার প্রজাপতি— এইগুলি আনিবে। অধিক আর কি লিখিব, আমাদের আর কি মানায়? মার জন্য একগাছি আসল রুদ্রাক্ষের মালা, বাবার জন্য একখানি মহানির্বাণ তন্ত্র পুস্তক আনিবে। আর আনিবে শ্রীযুক্ত বাবু অমলেন্দুকে; অধিক টাকা না থাকে বরং আর কিছু আনিবার প্রয়োজন নাই, শেষের লিখিত এই ফরমাসটা আনিলে চলিবে। কারণ ইহার দাম এক আনা মাত্র। ইতি—

তোমার

সুরো, সুরু বা সুরি

"পোষ্টমাষ্টার" গল্পটি প্রভাতকুমারের অনবদ্য সৃষ্টি। এই গল্প যতবারই পড়া যায় ততবারই নতুন লাগে। রবীন্দ্রনাথেব ঐ নামের গল্পের সঙ্গে আমরা পরিচিত। প্রভাতকুমার তাঁর "পোষ্ট মাস্টার" লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরে। আয়রনি-কৌতুক এই গল্পের প্রাণ। সমাজজীবনে পাপ-পুণ্য-শাস্তি-পুরস্কার-প্রাপ্তির বিচারের মধ্যে যে ভ্রান্তি থাকে, তার থেকেই কৌতুকরস এখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। শিল্পীর সংযম ও রসিকতার শিল্পসুষমার এক ওস্তাদী নিদর্শন এই 'পোস্টামাস্টার।' গল্পের নায়ক বিশুদ্ধ 'ভিলেন', দুষ্টবুদ্ধির মহিমায় পোস্টমাস্টার তার লাম্পট্যের উপযুক্ত পুরস্কার শারীরিক লাঞ্ছনাকে সুযোগরূপে ব্যবহার করল, গ্রাম্য পোষ্টাপিসের ডাক-বাবু স্বদেশী ডাকাতের হাত থেকে সরকারী অর্থ বাঁচাবার চেষ্টায় 'হীরো' বলে নিজেকে দেখাল এবং তার পুরস্কার স্বরূপ পোস্টাল ইনস্পেক্টারের পদে উন্নীত হল।

প্রভাতকুমার গ্রন্থনৈপুণ্য ও শিল্পসংযম এই গল্পে পদে পদে আমাদের চমকিত করে। সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ কৌতুকরস। যশোর-সন্তান বিমলচন্দ্র গাঙ্গুলি কোনোরকমে প্রবেশিকার দেউড়ি পেরিয়ে সুপারিশের জোরে গ্রাম্য পোষ্টাপিসের ডাকবাবুতে উপনীত হয়েছে। বিলেতী বোতলে ও ফাউল-কারীতে বিমলচন্দ্র সিদ্ধিলাভ করেছে। এই পোস্টমাস্টার-রত্নটির মহৎ ব্যসন হলো ডাক-ব্যাগ থেকে রোজ মেয়েদের উদ্দেশে লিখিত খামেভরা প্রেমপত্র অপহরণ ও পাঠ। এতেই তার আনন্দ। পোষ্টমাস্টার জেনেছে অবৈধ প্রেমপত্রেই 'মজা' বেশি। এইরকম একটি প্রেমপত্র পড়ে তার প্রেমনাট্যের নায়ক সাজার অভিলাষ ঘটে এবং নির্দেশিত স্থানে নায়িকা-সাক্ষাৎকারের জন্যে নিশীথ অভিযানে বেরিয়ে প্রহার লাভ করে। এই লাঞ্ছনাকেই সে আপন পদোন্নতির সোপানরূপে ব্যবহার করে। এখানেই লেখকের ওস্তাদী মার, তিনি গল্পে 'মরাল' খোঁজেন নি, কৌতুক চেয়েছেন এবং তা পেয়েছেন।

আপন গৃহে মত্তাবস্থায় পোষ্টমাস্টার অপহৃত প্রেমপত্র পড়ে পত্রোদ্দিষ্টার প্রতি যে স্বগতোক্তি করেছে, তা প্রভাতকুমারের শিল্প-সংযম ও রসপরিবেশন নৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয়স্থল।

" চিঠি খুলিয়া পড়িল— ' আমার হৃদয়েশ্বরী!' চিঠি রাখিয়া নিজ বক্ষে হাত দিয়া, চক্ষু মুদিয়া অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল—'হৃদয়েশ্বরী— হৃদয় জ্বলে গেল, —পুড়ে গেল, —খাক হয়ে গেল! আর একটু খাই'—বলিয়া চক্ষু খুলিয়া গেলাসের বাকীটুকু পান করিয়া, পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জিহ্বা তখন তাহার জড়াইয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, নেশা হইলে, সে আর 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না— 'স' স্থানে ছ বলিত। একটি একটি কথায় জোর দিয়া পড়িতে লাগিল—

" কিন্তু ছনিবারে, যাওয়ার ছুবিধা করিতে পারিলাম না। পরদিন অর্থাৎ রবিবারে— আমি নিশ্চয় যাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তুমি— পূর্ব পরামর্ষমত— রাত্রি ঠিক ১২ টার ছময়— তোমাদের বাড়ির পশ্চিমে ছেই ছিবমন্দিরের ছম্মুখে আছিয়া দাঁড়াইবে।'

চিঠি রাখিয়া, আর কিঞ্চিৎ পান করিয়া, গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল, অর্ধমুদ্রিত মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল— 'এ চিঠি ত তুমি পাবে না মণি!' খামখানাই যে ছিঁড়ে ফেলেছি। আগেকার চিঠি মত— তুমি আছাপথ চেয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবছেছে ক্লান্ত হয়ে বছে পড়বে— বছে বছে ক্রমে ছুয়ে পড়বে। কিন্তু ছে ত হায় আছবে না। অলরাইট— আমি যাব, — আমি গিয়ে তোমায় বলবো—

উঠ উঠ হে ছুন্দরী,
তব পদছ্পচ্ছ যোগ্য নহে এ ধরণী!
তুমি কেন ধূলায় পতিত?

তুমি চল— আমার ছঙ্গে চল। ছল ছখি, তুমি আমার হৃদয়েচ্ছরী হবে। হৃদয়েচ্ছরী —না ছুরি? হৃদয়ের ছুরি হয়ো না দোহাই বাবা, ছাত দোহাই তোমার!— বলিয়া চক্ষু খুলিয়া আপন রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া একটু হাসিল। গ্লাসের বাকীটুকু পান করিয়া ফেলিয়া আবার চিঠিখানা

লইয়া পড়িতে বসিল।"

অসাধারণ নৈপুণ্য ও সংযমের সঙ্গে প্রভাতকুমার এই ভিলেনের চরিত্রটি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'পোষ্টমাস্টার' গল্পের বেদনা আমার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে জমা হয়ে আছে, কিন্তু প্রভাতকুমারের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের কৌতুক ও আয়রনিকে ভুলে যাই নি।

প্রভাতকুমার গল্পে কেবল হাসি নয়, কান্নাও আছে। 'আদরিণী', 'দেবী, 'ফুলের মূল্য, 'মাতৃহীন', 'কাশীবাসিনী' গল্পের বেদনায় কৈশোরে অভিভূত হয়েছিলাম, আজো হই। তবে সে দিনের চেয়ে আজ এইসব গল্পের হৃদয়ের আরো গভীরে পৌছয়।

প্রভাত-গল্পগুলি নতুন করে ফিরে পাচ্ছি। মনে আছে 'নব কথা'র 'বলবান জামাতা'পড়ে অপর্ণাদির কথা বারবার মনে পড়ছে আর ভাবছি— যদি আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়!

একই নামে একই বৃত্তিসম্পন্ন দুই ব্যক্তি থাকার ফলে যে ভ্রান্তিবিলাস ঘটে, তা এই গল্পের কাঠামো। বাসরঘরে বিদূষী শ্যালিকার রসনাবাণে জর্জরিত নলিনীকান্তের কঠোর প্রতিজ্ঞা পালনের অভাবিত ফল 'বলবান জামাতা' গল্পের মূল বিষয়। লেখক ঘটনা সন্নিবেশ-নৈপুণ্যে গল্পটিতে কেবল কৌতুকহাস্য নয়, অট্টহাস্য সৃষ্টি করেছেন। আমার বিশ্বাস পাঠকেরা এই গল্প পড়েছেন এবং বারবার মুগ্ধ হতে রাজি আছেন। এই গল্পের ঘটনার এক একটি মোড় ফিরেছে আর পাঠকের হাসি উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উপনীত হয়েছে, শেষে আসল শ্বশুর যেখানে আসল জামাতাকে জোচ্চোর বলে দারোয়ান দিয়ে প্রহারদানে উদ্যত, সেখানে পাঠকের হাসি অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে।

"ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, 'খবরদার! হাম্ চলা যাতা হ্যায়। লেকেন যো হাম্‌কো ছুয়েগা, উস্‌কা হাড্ডি হাম্ চুর্ চুর্ কর ডালেঙ্গে।'

নলিনীর মূর্তি ও লাঠি দেখিয়া ভৃত্যগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নলিনী মহেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ' আপনি ভুল করেছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী।'

একথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, 'বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই চিনিনে?"

আর নয়, এখানেই প্রভাতকুমারের কাছ থেকে বিদায় নিই।

যত সাধ আছে, তত সাধ্য নেই। ভারত-ভুবনে যতটা পারি ঘুরেছি, দেখেছি স্তব্ধ গম্ভীর শৈলশ্রেণী, সদা চঞ্চল নীলাম্বুরাশি, মন-কেমন করা পাহাড়ী গাঁ-ক্ষেত-নদী, ভূতলের নানা স্বর্গখণ্ড। তবু কলকাতা আমার মনোহরণ করেছে। কেন জানি না, এই কলকাতা শহরকে ভাল না বেসে পারি না। কিপলিং কলকাতাকে বলেছেন—chance-erected, chance-directed, সৌন্দর্যের প্রশংসা করেননি। তা না করুন, আমি কলকাতার হাতে আমার হৃদয় সমর্পণ করেছি। এই কলকাতায় ছবি নানা লেখায় দেখেছি, তবু মনের মধ্যে যে ছবিটি আছে তার সমতুল কোথাও পাইনি। তার কারণ ভালবাসা অন্ধ, তা যুক্তি মানে না, বিচার জানে না, হিসাব মানে না। যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ' হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া', তিনিই লিখেছেন, 'বর্ষা-যাপন' কবিতায়—

রাজধানী কলিকাতা, তেতলার ছাতে
কাঠের কুঠরি এক ধারে,
আলো আসে পূর্বদিকে প্রথম প্রভাতে,
বায়ু আসে দক্ষিণের দ্বারে।
মেঝেতে বিছানা পাতা, দুয়ারে রাখিয়া মাথা
বাহিরে আঁখিরে দিই ছুটি,
সৌধ-ছাদ শত শত তাকিয়া রহস্য কত
আকাশেরে করিছে ভ্রূকুটি
নিকটে জানালা-গায় এক কোণে আলিসায়
একটুকু সবুজের খেলা,
শিশু অশথের গাছ আপন ছায়ার নাচ
সারাদিন দেখিছে একেলা।

কলকাতার এই রূপ বহুবার দেখেছি। হয়ত তা মনোহর নয়, কিন্তু তা-ই আমার মনোহরণ করেছে। এই কলকাতায় আমার জন্ম, শৈশবে চলে গিয়েছিলাম উত্তরবঙ্গে, কৈশোরে ফিরে এসেছি কলকাতায়। তারপর চলে এসেছি ভাগীরথী-তীরবর্তী হুগলীর জনপদে। আবার যৌবনসূচনায় ফিরে এসেছি কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঈষৎ পরিবর্তিত করে বলতে পারি—

হে কলকাতা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।

এই কলকাতার পটে লেখা জীবনের নানা ব্যঙ্গচিত্র পাই কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোমের 'হুতোমপ্যাঁচার নক্শা'য়। এই নক্শাগুলি সুন্দর। সুসংলগ্ন, সুরুচিসম্মত— এমন কথা বলা যায় না। তবু কলকাতার পটে স্থাপিত নকশাগুলি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেম।

বস্তুত প্রথম যেদিন 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' পড়ি, সেদিন কলকাতাকে নতুন করে ফিরে পেয়েছিলাম। তখন দ্বিতীয় বিশ্বসমরের আসন্ন করাল ছায়া কলকাতাকে রাহুগ্রস্ত করেছে, ইভাকুয়েশনের ধাক্কায় চলে গেলাম আধা-শহর আধা-মফঃস্বল হুগলী জেলার ভাগীরথী-তীরবর্তী জনপদে। ব্ল্যাকআউট, ফেমিন, রেশনিং, ট্রেঞ্চ, ব্যাফল-ওয়াল, সাইরেন, এয়ার-রেড, মর্টার গান, মেশিনগান প্রভৃতি ইংরেজি শব্দগুলির সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে পরিচয় ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। সন্ধের আগেই সেই মফঃস্বল শহর ব্ল্যাকআউটের চাদরে নিজেকে আবৃত করত। হারিকেনের আলোয় চলত লেখাপড়া। বাইরে অন্ধকারে শিবারব আর ঝিল্লিধ্বনির ঐকতান বেজে উঠত। তখন ফেলে আসা কলকাতার জন্য মন কেমন করত। তখন একদিন পাবলিক লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এলেম বসুমতী সংস্করণের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।'

যথারীতি ভূগোল বইয়ের তলায় ' হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'কে, 'নক্‌শা'র তলায় ভূগোল বইকে ক্রমান্বয়ে চালান করে দিয়ে অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে 'নক্‌শা' পড়েছি। পড়ে চমকে উঠেছি। এ যে কলকাতার শতাব্দী-প্রাচীন চলচ্ছবি। হোক সে পুরানো কলকাতা, তবু তো সে কলকাতা— অনন্য, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়।

'নকশা' দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, হুতোমী ভাষায় মজা পেয়েছিলাম। আজ সেদিনের কৈশোর-মুগ্ধতাকে বিশ্লেষণ করে দেখি, দ্রুতধাবমান কথ্যভাষাই আমার মনোহরণ করেছিল। হুতোমী ভাষার ধাবৎশক্তি আমার কিশোরমনকে জয় করে নিয়েছিল। ব্যঙ্গচিত্রের প্রত্যক্ষতা ও সরলতা আমাকে অধিকার করেছিল। আজ বুঝি, এ ভাষা সাহিত্যের দরবারে অশালীন, অনভিজাত বলে নিন্দিত। বঙ্কিমচন্দ্র একে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন নি। কিন্তু এই ভাষার যে প্রাণশক্তি তাকে অস্বীকার করি কি করে! খাঁটি কল্‌কাত্তাই ভাষা এই নক্‌শায় পাই। এই ভাষার জোরকে অস্বীকার করলে মূঢ়তার পরিচয় দিতে হয়, নিন্দা করলে অরসজ্ঞতার।

সেদিন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' যিনি এঁকেছিলেন, তাঁকে হুতোম ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহ বলে জেনেছিলাম। তার বেশি কিছু নয়। কেবল বাড়িতে পুরনো তোরঙ্গে উইয়ে-কাটা পৃথুলকায় মহাভারত গদ্যানুবাদের খণ্ডগুলি দেখে বিস্মিত হয়েছি। এই দুই কীর্তির অধিকারী একই ব্যক্তি, একথা বাবার কাছে জেনে অবাক মেনেছি। সেদিন কালীপ্রসন্নর মহাভারত-কীর্তির প্রতি আমার কিশোর-চিত্ত আকৃষ্ট হয় নি, সমগ্র হৃদয় দিয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'কে গ্রহণ করেছি। এর ফল ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, তার বিচারে আমার আগ্রহ নেই, আজ কেবল সেদিনের নক্‌শা পাঠের সুখস্মৃতি স্মরণ করি।

স্পষ্ট মনে পড়ে, হুতোমী বর্ণনা পড়ে সেদিন হাসি চেপে রাখা দুঃসাধ্য হয়েছিল। পড়ছি আর হাসছি। বোন রেণু বল্‌লে, 'কী রে অত হাসছিস কেন?' হাসির ভাগ পাবার জন্য সে-ও উৎসুক হয়ে উঠেছিল।

'বল্ না, দাদা, বল না, কী পড়ছিস্?'

'আচ্ছা শোন।'

এইকথা বলে তাকে পড়ে শোনাই—

" আর একবার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদরবন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিল। তাঁর গায়ে বড় বড় অশোদগাছের শেকড় জন্মে গিয়েছিল। আর শরীর শুকিয়ে চেলাকাঠের মত হয়েছিল। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে একদিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না! — শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।"

আর এই পাঠ শুনে আমার বোনের সে কী হাসি! কিছুদিন আগে গঙ্গার ঘাটে এক ধুনিবাবাকে দেখেছিলাম। বোন বললে, 'দাদা, ঐ সাধুটাই বোধ হয় ঝিলিপুরের মহাপুরুষ!'

দুজনের সম্মিলিত হাসিতে সেই সান্ধ্য আকাশ চমকে উঠেছিল। দূরে রান্নাঘর থেকে মা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'এই বুঝি তোদের লেখাপড়া হচ্ছে!' অমনি হাসি বন্ধ! আমি প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা-পরিমাপে ও আমার বোন আকবরের রাজ্যবিস্তার অন্বেষণে তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

কলকাতার চলচ্ছবি 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।' হুতোমী ভাষা বিদ্রূপের ফুলকি ঠিকরে বেরোয়। এই ঔজ্জ্বল্য সেদিন আমার মনকে আলোকিত করেছিল।

বোন বলে, 'দাদা, আরেকটু পড় না শুনি।'

'তবে শোন্। এবার কলকাতার হুজুগের বর্ণনা।'— এই বলে তাকে পড়ে শোনাই।—

"সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দু পয়সা রেট হলো; গরু রাখবার জন্য অনেক গরু একত্রে হলো। বাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগল, কিছুদিনের মধ্যে সাত পেয়ে গরু বিলক্ষণ দশটাকা রোজগার করে দেশে গেলেন।"

তারপর পড়ি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের বর্ণনা। বোন বললে, 'দাদা, সেইটা পড়।'

ব্যস্ আর বলতে হয় না, বুঝে ফেলেছি কোন্‌টা পড়তে হবে।

"বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন। কেও খোসগল্প ও অন্য বড় মানুষের নিন্দাবাদ করে বাবুর মনোরঞ্জনের উপক্রমণিকা কচ্চেন— আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে রয়েছে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ হবে।"

— এইখানে এসে আর হাসি শাসন মানে না, আমরা দুজনেই হেসে উঠি, তারপর আবার পড়ি।—

"আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা, দানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারান্দায় ঘুচ্ছে, পূজো যায় তথাচ তাদের হিসেব নিকেশ হচ্ছে না। সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষ পক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন, অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ি চেনেন না, বিধবা বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বাণের মুখে ভেলেডিঙ্গীর মত তাদের কথা তল্ হয়ে যাচ্ছে। নামকাটাদের পরিবর্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই ভাগ্নে, নাতজামাই, দৌত্তুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাঁসিল কচ্চেন, এদিকে

নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে সাঁপ দিয়ে উঠে যাচ্ছেন।"

এই বর্ণনার মধ্যে গত শতকের যে-সব সামাজিক ঘোঁটের উল্লেখ রয়েছে, তা সেদিন বুঝি নি, কিন্তু মজা পেতে বাধা হয় নি। নামকাটা পণ্ডিতের দল হতমান হয়ে মহাক্রোধে সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন,— এই ছবিটি দেখে উৎফুল্ল হয়েছিলেম।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় সবচেয়ে উজ্জ্বল বর্ণনা, বোধ করি, কলকাতার বারোইয়ারি পূজার বর্ণনা। সেই পূজা উপলকে বীরকৃষ্ণ দাঁর উদ্যোগে বারোয়ারিতলার প্রথম রাতে হাফ আখড়াই গানের আসর বসে। হুতোম রসিয়ে রসিয়ে সেই গানের আসরের উদ্যোগপর্বের বর্ণনা দিয়েছেন।

হাফ-আখড়াই গানের আসরের রাতের বর্ণনা। আমরা সেদিন কলকাতা ছেড়ে মফঃস্বলে ছিলেম বলেই দুর্যোগময় আঁধার রাতের বর্ণনা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছিলেম। বস্তুত এই প্রত্যক্ষতাই হুতোমী বর্ণনার প্রধান গুণ।

"অমাবস্যার রাত্তির— অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি— গুড় গুড় করে মেঘ ডাকচে— থেকে থেকে বিদ্যুৎ নল্‌পাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়চে না— মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্ছে— পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্ছেন আর হন্ হন্ করে চলেছেন। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ কচ্চে— দোকানীর ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে,— গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গেলো।"

এই বর্ণনা এত প্রত্যক্ষ ও চলচ্ছবির মত দ্রুতধাবমান যে তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনকে অধিকার করে নেয়। বর্ণনার শেষাংশটি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভুক্ত। রংপুরের স্মৃতি তখনো মন থেকে মুছে যায় নি (বস্তুত কোনোদিনই মুছে যাবার নয়)। রংপুরে রোজ রাত নটায় তাজহাটের জমিদার বাড়িতে তোপ পড়ত। কয়েক মাইল দূরবর্তী আলমনগরে আমরা রাতের ঘড়ি ও চলাফেরা ঐ তোপধ্বনির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতাম। আমরা রংপুর থেকে যখন কলকাতায় এসেছি, তখন হুতোমীযুগের কলকাতা অন্তর্হিত। কিন্তু 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় যে তোপ পড়েছে, তা চিরকাল ধরে পাঠকহৃদয়ে গুড়ুম করে পড়বে।

এই দ্রুতধাবমান ভাষা সম্পর্কে বহুকাল পরে এই সেদিন বাংলা ভাষার ইতিহাস-ব্যাখ্যাতার মন্তব্য পড়ে আমার ফেলে-আসা শৈশব ও কৈশোরের সুখস্মৃতি ও ধারণার সমর্থন খুঁজে পেয়েছি।

'এ হচ্ছে— 'A young man in a hurry'-র ভাষা। প্রত্যেক পদের শেষে ড্যাশ্ চিহ্নগুলো যেন তার দ্রুত গতির তালে উড়ন্ত উড়ুনীর প্রান্ত। লেখক ছুটছেন, ভাষা ছুটছে, বর্ণনীয় বিষয় একটা আর একটার ঘড়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, ঘনায়মান আকাশের নীচে ভাষার সঙ্গে পাঠক ছুটছে— হঠাৎ সম্বিৎ হলো যখন 'গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।" ('বাংলা গদ্যের পদাংক,' শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর ভূমিকা)

এ বর্ণনা এখানেই শেষ হয়নি। আরো আছে। প্রত্যক্ষ চলচ্ছবির মতো তা ছুটে চলেছে।—

"সময় কারুরই হাত ধরা নয়— নদীর স্রোতের মত— বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কারুরই অপেক্ষা করে না। গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠলো— রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে— মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে— মুষলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।"

এই পটে হুতোম হাফ-আখড়াই আসরের ছবিটি এঁকেছেন। "চকবাজারের প্যালানাথ বাবুর—"

পড়তে না পড়তেই আমার বোন হাসতে শুরু করে, কিছুতেই আর থামে না, — 'ও দাদা, কি বল্লি, প্যালানাথ বাবু'— বলে আর হাসে, হাসে আর বলে। তার সঙ্গে আমিও হাসি। হাসি থামলে পর আবার পড়ি।

"চকবাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্ধ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু এক জন ধর্‌তা দোয়ার প্যালানাথ বাবুর আস্‌বার অপেক্ষায় থাকতে বেজার হচ্ছেন— দু এক জন 'তাই ত' বলে দেদার দাদার বোলে বোল দিচ্ছেন, কিন্তু প্যালানাথ বাবু বারোইয়ারির এক জন প্রধান ম্যানেজার, সৌখীন ও খোসপোশাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ! সুতরাং কিছুক্ষণ তাঁর অপেক্ষা না কল্লে তাঁরে অপমান করা হয়— ঝড়ই হোক, বজ্রাঘাতই হোক, আর পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁর এসব বিষয়ে এমনি সখ যে, তিনি অবশ্যই আসবেন!

"ধর্‌তা দোয়ার গোবিন্দবাবু বিরক্ত হয়ে নাকী সুরে 'মনালে বঁদিয়া' জিক্কুর টপ্পা ধরেছেন— গাঁজার হুঁকো একবার এ থাকের পাশ মেরে ও থাকে গ্যালো। ঘরের এক কোণে হুঁকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায় সেদিকের থাকেরা রল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়চেন ও কেমন করে পড়লো প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্ছেন— এমন সময় একখান গাড়ি গড় গড় করে এসে দরজায় লাগলো। মুখুয্যেদের ছোটবাবু মজলিশ থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বারাণ্ডায় গিয়ে 'প্যালানাথবাবু! প্যালানাথ বাবু এলেন!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন— দোয়ারদলে হুর্‌রে ও রৈ রৈ পড়ে গ্যালো— ঢোলে রং বেজে উঠলো। প্যালানাথবাবু উপরে এলেন— শেকহ্যান্ড, গুড ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুক্‌তে আধ ঘণ্টা লাগ্‌লো।"

মনে পড়ে, সেদিন প্যালানাথবাবুর নাম ও হাফ-আখড়াই আসরের বর্ণনা পড়ে খুব হেসেছিলেম। কৈশোরের সে আনন্দ আজ নতুন করে ফিরে পাই যখন 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌ পড়ি। এ বই চিরনবীন। ছেলেবুড়ো সবাইকে সমান আনন্দ দিতে পারে। একে অশালীন, অনভিজাত বলে ধিক্কার দিতে আমার মন চায় না। 'নক্‌শা'য় আমি পুরনো কলকাতার ছবি দেখেছি এ কালের কলকাতার প্রেমিক হয়ে।

হুতোম সেকালের কলাকাতার দুর্গাপূজার বর্ণনা দিয়েছেন। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমি আর রেণু সে-বর্ণনা পড়তাম ও প্রাণ খুলে হাসতাম। এ'কালের— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী

কলকাতার দুর্গাপূজা আমাদের দেখা ছিল। কিন্তু হুতোমের নক্‌শায় যে দুর্গোৎসবের বর্ণনা তার অপসৃত ঐশ্বর্য ও চমৎকারিত্ব সেদিন আমাদের মনোহরণ করেছিল। রেণু অনুরোধ করত, — 'দাদা দুর্গাপূজার বর্ণনাটা পড়্।'

আমি পড়তে শুরু করে দিতেম।—

"ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সহরে প্রিতিমার অধিবাস হয়ে গ্যালো, কিছুক্ষণ ঢোল ঢাকের শব্দ থাম্‌লো, পূজো বাড়িতে ক্রমে 'আন্ রে' 'কর রে' 'এটা কি হলো' কত্তে কত্তে ষষ্ঠীর শর্ব্বরী অবসন্না হলো, সুখতারা মৃদু পবন আশ্রয় করে উদয় হলেন. পাখিরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ কত্তে আরম্ভ কল্লে; সেই সঙ্গে শহরের চারিদিকে বাজানা বাদ্দি বেজে উঠলো, নব পত্রিকার স্নানের জন্য কর্মকর্ত্তারা শশব্যস্ত হলেন— ভাবুকের ভাবনায় বোধ হাত লাগলো যেন সপ্তমী কোরমাখান নতুন কাপড় পরিধান করে হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন।"...

তারপর কলাবউয়ের স্নানশেষে সন্ধেয় বাবুর বাড়ি নাচের আসর।

"নেমন্তন্নের নাচ দেখতে থাকুন, বাবু ফর্‌রা দিন ও লাল চোখে রাজা উজীর মারুন— পাঠকবর্গ একবার শহরটার শোভা দেখুন— প্রায় সকল বাড়িতেই নানা প্রকার রং তামাশা আরম্ভ হয়েছে। মাড়ওয়ারী খোট্টার পাল, মাগীর খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গ্যাচে। নেমন্তন্নের হাত-লণ্ঠনওয়ালা বড় বড় গাড়ির সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস্ পইস্ কচ্চে, অথচ গাড়ি চালাবার বড় বেগতিক। কোথায় সখের কবি হচ্চে, ঢোলের চাঁটি ও গাওনার চীৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েচেন, গানের তালে ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে উঠ্‌চে। কোথাও পাঁচালি আরম্ভ হয়েছে, বওয়াটে পিল্ ইয়ার ছোকরারা ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাটছেন ও আপনা আপনি বাহবা দিচ্চেন, রাত্তির শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিসে দক্ষিণা দেবে।"....

আমরা দুজনে এই ছবি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়তাম। দুর্গোৎসবের ফুর্তির ভরা জোয়ারের ছবি এঁকেছেন হুতোম। সে ছবি একালের কলকাতায় আর দেখা যাবে না বলেই হুতোমের নক্‌শা এমন করে আমাদের মনকে টানে।

বর্ণনার শেষাংশ হুতোম নবমীপূজার বিবরণ দিয়েছেন।—

"আজ নবমী; আজ পূজোর শেষ দিন; এত দিন লোকের মনে যে আহ্লাদটি জোয়ারের জলের মত বাড়তেছিল, আজ সেইটির একেবারে সারভাটা।

"আজ কোথাও জোড়া মোষ, নব্বুইটা পাঁঠা, সুপারি, আক্ কুমড়ো, মাগুরমাছ ও মরীচ বলিদান হয়েছে; কর্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচো ইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটি কচ্চেন; ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠানে লোকারণ্য; উপর থেকে বাড়ির মেয়েরা উঁকিমেরে নবমী দেখছেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যাচে, কার সাধ্য প্রবেশ করে— কাঙ্গালী, রেওভাট ও ভিক্ষুকে পূজোবাড়ি ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মশাগুলো পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্ছে। ক্রমে দেখতে দেখতে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, পুজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো! ভোরাও ওক্তে ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়িতে বিজয়া গাওনা হলো। ভক্তের

চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পরদিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগ্‌লো, শেষে বিসর্জ্জনের সমারোহ শুরু হলো, — আজ নিরঞ্জন।''

নবমীপূজার এই বর্ণনা কেবল সেকালের নয়, একালেরও। দেবরায়দের গড়বাড়িতে জোড়া মোষ ও বহু পাঁঠা বলিদান দেখেছি, পূজা আঙ্গিনা লোকারণ্য, হোমের ধূমে সারা মণ্ডপ অন্ধকার, ঢাকের শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। স্পষ্ট মনে আছে, আমরা পাঁচ ভাই-বোনে নতুন জামা-জুতো পরে গড়বাড়িতে নবমী পূজো দেখতে যেতাম। হুতোমের এই বর্ণনা তাই আমার কৈশোর-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে আছে, একে কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না। নবমী নিশিশেষে দশমী-প্রভাতে পূজা-মণ্ডপ কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগত, উজ্জ্বল প্রতিমা যেন মলিন, ঢাকের বাজনায় কেমন বিদায়ের সুর। এ সবই আমার চৈতন্যে লগ্ন হয়ে আছে। দুর্গোৎসবের মধুর স্মৃতি হুতোমের পুরনো কলকাতার বর্ণনার সঙ্গে আমার মনে মিশে আছে। তাই একে ভুলতে পারি না।

সুনির্মল বসু

আগের স্মৃতিচারণে বলেছি, বোমার ভয়ে পলাতক হয়ে হুগলী জেলায় গঙ্গাতীরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। দক্ষিণ কলকাতার খ্যাতনামা প্রকাণ্ড স্কুল ছেড়ে মফঃস্বলের অখ্যাত ছোট স্কুলে ভর্তি হলাম। কলকাতার নামে অথবা স্বভাব-লাজুকতার দোষে প্রথমটা ছেলেদের সঙ্গে ঠিক মিশতে পারি নি। আপন মনে স্কুলে আসতাম, টিফিনে স্কুলের মাঠে একাই পায়চারি করতাম, দিনের শেষে বই বগলে সোজা বাড়ি। তারপর জলখাবার খেয়ে গল্পের বই নিয়ে বাড়ির ছাদে বা গঙ্গার ঘাটে যতক্ষণ না সন্ধ্যা নেমে আসে।

এই নিঃসঙ্গতার দুর্গ থেকে আমাকে জনতার মাঝে টেনে নামাল যে ছেলেটি , সে আমারই ক্লাসের ছেলে। গোড়ায় খুব লক্ষ্য করি নি, পরে কৌতূহলভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। ছেলেটি স্কুলে আসত ঝকঝকে সাইকেলে চড়ে, থাকত গঙ্গার ধারে গ্যাঞ্জেস জুট মিলের কোয়ার্টারে। তার বাবা ছিলেন জুটমিলের অফিসার।

ছেলেটির নাম নরেন। ডাক নাম জগা। আমরা তাকে জগা নামেই জেনেছি, ভালবেসেছি। এমন ফূর্তিবান হৃদয়বান প্রাণোচ্ছল ছেলে আমি খুব কম দেখেছি।

মনে পড়ে এক শীতের দুপুরে টিফিনে স্কুলের মাঠে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছি; এমন সময় পেছন শব্দ শুনি— ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। তখন তাকিয়ে দেখি সাইকেলের সওয়ার আর কেউ নয়, হাস্যমুখ জগা। অপ্রস্তুত হয়ে সরে যাই, তবু দেখি আমারই ঘড়ে পড়ে। দূর থেকে ছেলেরা

ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে, হাসছে। আমি ক্রমশঃ সরে যাচ্ছি— আর জগা ঘণ্টি বাজিয়ে চলেছে— ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। মহা মুশকিল। এক লাফে ডানদিকে সরে গেলাম। ঘণ্টি আবার বাজল— ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। দূর থেকে ছেলেরা হো-হো করে উঠল।

জগা তখন আমাকে কেন্দ্র করে সাইকেলে ঘুরছে আর হাসি হাসি মুখে আমার উদ্দেশে বলছে—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং! সবে সরে যাও না,
চড়িতেছি সাইকেল, দেখিতে কি পাও না?
ঘাড়ে যদি পড়ি বাপু, প্রাণ হবে অন্ত;
পথ-মাঝে রবে পড়ে ছিরকুটে দন্ত।
বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি মাইকেল—
'যেয়ো না যেয়ো না সেথা, যেথা চলে সাইকেল।'
তাই আমি বলিতেছি তোমাদের পষ্ট
মিছে কেন চাপা পড়ে পাবে খালি কষ্ট?'

রাগ করব কি! কবিতা শুনে ও জগার হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেল চেপে ধরলাম। জগা হাসিমুখে সাইকেল থেকে নামল। দূর থেকে ছেলেরা লক্ষ্য করছে, খুব আশা এবার একটা মারপিট হবে।

হাসিমুখে জগা বলল— বল সাইকেল থামালে কেন?

আমি হাসিমুখেই জবাব দিলাম—ওটা কার কবিতা?

— কেন তুমি পড়ো নি। এ ত' সুনির্মল বসুর কবিতা 'সাইকেলে বিপদ'।

— এখানে শেষ; না আরো আছে?

— শোনো

"ভালো যদি চাও বাপু ধীরে যাও সরিয়া,—
কি ভাল হইবে বলো অকালেতে মরিয়া?
সকলেই দিবে দোষ প্রতিদিন আমারে—
গালি দিবে চাষা, ডোম, মুচী, তেলী, কামারে।
এত আমি বলিতেছি— ওরে পাজী রাস্‌কেল—
ঘাড়ে যদি পড়ি তবে হবে বুঝি আক্কেল?
রঘুনাথ একদিন না সরার ফলেতে—
পড়েছিল একেবারে সাইকেল-তলেতে।
সতেরই বৈশাখ— রবিবার দিন সে—
চাপা পড়ে মরেছিল বুড়ো এক মিন্‌সে।
তাই আমি বলিতেছি— পালা না রে এখনি।
বাঙালী হয়েছ বাপু পলায়ন শেখ নি?"

আবৃত্তি শেষ করেই জগা ঘন্টি বাজাল— ক্রিং ক্রিং ক্রিং। ছেলেরা আর অপেক্ষা করতে পারছিল না, হুড়মুড় করে সবাই এসে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে আমি সকলের বন্ধু হয়েগেলাম। এবার ঘণ্টা পড়ল— না, সাইকেলের নয়, স্কুলের — ঢং ঢং ঢং ঢং টিফিন শেষ। যে-যার ক্লাসে চলে গেল। জগার হাত ধরে আমিও ক্লাসে গেলাম।

সেদিন বিকেলেই জগার সঙ্গে সাইকেলে চড়ে অনেকদূর বেড়িয়ে এলাম। জগার কাছেই সাইকেল চড়া শিখলাম। জগার প্রিয় কবি সুনির্মল বসু। জগা আমাকে সুনির্মল বসুর একটি কবিতার বই উপহার দিয়েছিল। আজ আর সেটা নেই, হারিয়ে ফেলেছি। জগাও আর নেই। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে সে চিরকালের মত আমাদের কাঁদিয়ে চলে গেছে।

জগা আমাকে সুনির্মল বসুর কবিতার প্রথম পাঠ দিয়েছিল। তাই সুনির্মল বসুর কবিতা— যা সেদিন আমার দিনরাতের সঙ্গী ছিল— তা নতুন করে পড়তে গিয়ে স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে জগার হাসি-হাসি মুখটা দেখতে পাচ্ছি। মনে মনে বলি, — আঃ কেন যে এরা দু'দিনের জন্যে আসে? মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে কেনই বা তা অনায়াসে ছিন্ন করে চলে যায়? আজ আর ইচ্ছে করলেও জগাকে ফিরে পাব না, যেমন পাব না সেই মুগ্ধ প্রহরগুলিকে।

সুনির্মল বসুর কবিতা পড়ার বয়স আজ আর নেই, এ কথা বলতে আমার মন সায় দেয় না। প্রত্যেক বয়স্ক মানুষের মনের মধ্যেই একটা ছায়াবৃত অংশ থাকে যেখানে সে ছেলেমানুষ। সেই কল্পলোকের রঙীন আনন্দ একদিন তাকে মুগ্ধ করেছিল। আজ তাকে কোনো আনন্দই দেবে না, তা কি হয়? অন্তত আমি তা মনে করি না। সেই যে ' আলোর দেশে'র বর্ণনা—

জল-ছল্‌ছল্‌ ঝাপ্‌সা ভুবন
উজল হল রে,
আলোর দেশে চলতে হবে,
তল্পি তোলো রে!
রূপের বাহার দেখ্‌বি যদি
আয় রে ছুটিয়া—
সবুজ- সোনার আঁচলখানি
পড়ছে লুটিয়া।
ওই যে মায়ের নীল আঁখি দ্যাখ্‌
মেদুর আকাশে,
স্নেহের উছাস জানতে কি পাস্‌
মৃদুল বাতাসে?
উজল সোনার রথ দেখা যায়
উদয়-গগনে

পাখীর গলায় শঙ্খ বাজে
মধুর লগনে।

এই স্বপ্নময় ছন্দময় বর্ণময় বর্ণনা ত' ভুলতে পারি না। ভুলতে চাইও না।

সুনির্মল বসু আমার কৈশোরকালের প্রিয় কবি। এখানেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় নি। পরে যখন স্কুলের কলেজের পাট চুকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এসেছি, তখন সুনির্মল বসুর সঙ্গে ব্যাক্তিগতভাবে পরিচিত হলাম। উপলক্ষ, সেই স্কুলজীবনের আনন্দক্ষেত্রে স্থানীয় সাধারণ পাঠাগাবের কৈশোরক বিভাগের সভায় কবিকে নিমন্ত্রণ। কবি তখন থাকেন ঢাকুরিয়ায়। ১৯৫২-৫৩ সালের কথা। কবি বিশেষ কোনো ওজর আপত্তি না করেই সভায় যেতে রাজি হলেন। সাহিত্যিকের অভিমান বা গর্ব তাঁর ছিল না। নিতান্তই সহজ সরল আমুদে লোক। খুব কথা বলতে পারেন, হাসাতে পারেন, মুখে মুখে ছড়া বলতে পারেন। বেশ লাগল। কবিকে সভায় নিয়ে গেলাম। পাঠাগারের কিশোররা খুশী, বড়রাও খুশী। সুযোগ পেয়ে তাঁকে একান্তে জানালাম, ছোটবেলা থেকে তিনি আমার কত প্রিয়। আবৃত্তি করে শোনালাম সেই অবিস্মরণীয় শ্লোক দুটি—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং! সবে সরে যাও না,
চড়িতেছি সাইকেল দেখিতে কি পাও না?
ঘাড়ে যদি পড়ি বাপু, প্রাণ হবে অস্ত,
পথ মাঝে রবে পড়ে ছিরকুটে দন্ত।

শুনে কবি কোনো ছদ্ম বিনয় প্রকাশ করলেন না। দৃশ্যতঃ খুশী হলেন এবং মুখে তা প্রকাশ করলেন। বস্তুতঃ সুনির্মল মনের অধিকারী ছিলেন সুনির্মল বসু।

মনে আছে, আমাদের পাঠাগার-হলে কিশোর-সভায় তাঁর ভাষণ। প্রথম কথাতেই তিনি ছেলে বুড়ো সকলের হৃদয় জয় করে নিলেন। উঠেই বললেন— 'এটা অমায়িক ব্যক্তিদের সভা, আমিও অমায়িকভাবেই বল্‌ব'— এক মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য, তারপরই সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো। সভায় মাইক ছিল না। কবি তখন শ্রোতাদের আপন-জন হয়ে গেছেন। তাঁর ভাষণের শেষ দিকটা ছিল কবিতায় ভরা। কী অপূর্ব দরদভরা কণ্ঠে তিনি সেইসব স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন!

অজস্র কৌতুক, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, অপরিমেয় কৌতূহল নিয়ে সুনির্মল বসু শতাব্দীর এক পাদ (১৯৩০-৫৫) ধরে বঙ্গদেশের কিশোরদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। আমার মনে হয়, এর চেয়ে বড় দেশসেবা আর নেই। কবির ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ বেদনা কম ছিল না, কিন্তু কোনদিন কবিতায় তার ছায়া পড়ে নি।

"সর্বনাশ" " সরে পড়ো" হিতোপদেশ" " দুলাল পালের ছেলে" " কিপ্‌টে ঠাকুরদা" "শহুরে মামা" " আচ্ছা ফ্যাসাদ" " তেপান্তরের মাঠে" "ইষ্টি বিষ্টির আসর" " অল্প কথার গল্প" " মুড়ি জংশনে সূর্যোদয়" " ভালই আছেন তালই মশাই" "সাইকেলে বিপদ" "বাবর শা ও মাকড় শা"— কত চমৎকার কবিতা সুনির্মল বসু আমাদের দিয়ে গেছেন।

একবার পুজোর ছুটিতে চাইবাসা রাঁচি জামশেদপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম। চাইবাসা থেকে রাঁচি যাবার পথটি ভারি সুন্দর। সেই পথে গাড়িতে যেতে যেতে মাঝপথে থেমেছিলাম হির্‌ণি প্রপাত দেখতে। সেই প্রপাত, পাহাড়ের বন ঝিল দেখে হঠাৎ মনের মধ্যে অনেকদিনের পুরনো কবিতাটি জেগে উঠল—

বিহারের এক নিভৃত প্রদেশে
নির্জন বন প্রান্তে
আমরা ক্ষুদ্র কিশোরের দল
কতদিন দিবসান্তে
পার হয়ে নদী পাহাড়ী উশ্রী
মাঠ হয়ে অতিক্রান্ত—
উঁচু-নীচু কত উপল-বহুল
পথ চলে অবিশ্রান্ত
হাজির হতাম 'শিরশিয়া ঝিলে'
সবে মিলে মহানন্দে,
মুখরিত হত নিরালা কুঞ্জ
পাখীদের কলছন্দে।
সেই সুরে মোরা মিলাতাম সুর
করিতাম কত রঙ্গ,
তৃণের সবুজ জাজিমের 'পরে
এলায়ে দিতাম অঙ্গ।

হির্‌ণি প্রপাতের ধারে বসে অতিক্রান্ত কৈশোরস্মৃতি নতুন করে মনে পড়ল। আর রাঁচি পৌঁছেই মনে পড়ল কবির অবিস্মরণীয় 'হিতোপদেশ'—

চাও যদি বাঁচতে হে, যাও তবে রাঁচিতে,
ঘাবড়ালে চলবে না টিকটিকে হাঁচিতে।

ডোরাণ্ডা ফরেস্ট রেস্ট হাউসের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে সুনির্মল বসুর কবিতার ভেলায় ভর করে ফেলে আসা কৈশোরে পাড়ি দিয়ে এলাম। মনে আছে সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সেই পূর্ণিমা-রাতে রাঁচি মোরাবাদী পাহাড়ের নীচে গাড়ি থামিয়ে অনেকক্ষণ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তর পাহাড় অরণ্যকে দেখেছিলাম। বহু বছরের ওপার হতে আমার মনের মধ্যে যে কবিতা ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল— তা সুনির্মল বসুর কবিতা—

শালবন ভেদ করে মৌন তাপস সম দাঁড়ায়ে পাহাড়,
চিকমিক করছিল অভ্রের ধুলোমাখা চূড়াটি তাহার,
তার ধারে বন্ তলে—
নিরালায় জঙ্গলে,—

কুটীরের আঙিনাতে
ছোট এক খাটিয়াতে
সাঁওতাল-ছেলে এক
বসে ঢুলছিল।
আকাশের চাঁদোয়াতে
চাঁদ ঝুলছিল।

সেদিন এই কবিতা আর জ্যোৎস্নাধোয়া প্রান্তরের সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকে ফিরে পেয়েছিলেম।

সুনির্মল বসু তাঁর সারা জীবন ঢেলে দিয়েছিলেন শিশু ও কিশোরদের খুশী করার সাধনায়। এর জন্য তাঁকে কম দুঃখ কষ্ট সইতে হয় নি। আর্থিক কৃচ্ছ্রতা ও অবহেলা, দুই-ই তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল, সে-কথা তাঁর মুখে শুনেছি। সহজে বলতে চাইতেন না। হাসিমুখে তিনি সব মেনে নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তিনি পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়ে সংসারে আসেন নি, এসেছিলেন তাজা প্রাণ নিয়ে। ছন্দোনৈপুণ্য ও কৌতুকবর্ণনার তাঁর দখল ছিল সহজাত। ছোটো ছোটো হাসির গল্প, দেশপ্রেমের গল্প লিখেছেন সুনির্মল বসু। সবই কবিতায়। পঁচিশ বছর ধরে তিনি বাংলার শিশু ও কিশোরদের আনন্দ দিয়েছেন।

একেবারে যারা কচি, মুখে যাদের আধ-আধ বোল ফুটেছে, তারা খুশী হবে 'রাঙা মামার ভাঙা আসর,' 'কুম্‌কুম্‌', 'রঙীন দেশের রূপকথা' পড়ে। যারা একটু বুঝতে শিখেছে তারা আনন্দ পাবে 'কিপ্টে-ঠাকুরদা,' 'শহুরে মামা,' 'আচ্ছা ফ্যাসাদ' পড়ে। স্কুলের ছেলেরা 'বীর শিকারি' প্রমুখ কৌতুকনাটিকার অভিনয় করে আনন্দ পাবে। আর কিশোররা আনন্দ পাবে 'মনে পড়ে', 'তিন চূড়ো পাহাড়ের দেশ,' 'শ্রীপঞ্চমীর ভোরে,' 'ঘূর্ণি হাওয়া চলে,' 'চাঁদ ঝুলছিল,' 'প্রথম প্রভাতে', ' বৈশাখী ভোর' পড়ে।

আমাদের স্কুল-জীবনের সবচেয়ে বড়ো উৎসব ছিল সরস্বতী পুজো। আজ সুনির্মল বসুর 'শ্রীপঞ্চমীর ভোরে' কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই ভোরের সুখস্মৃতি মনে পড়ছে—

চতুর্থী রাত শেষ হয়ে এলো, কাটে আঁধারের ঘোর,
বাংলার বুকে ধীরে ধীরে জাগে পঞ্চমীর ভোর।
পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয়ে যায় শিশুদের জাগরণ,
তার সাথে জেগে ওঠে আজ আমারো কিশোর-মন।
ফেলে-আসা সেই অতীতের দিনে ছুটে যেতে চায় প্রাণ,
মনে জাগে সেই ভুলে-যাওয়া স্মৃতি, আনন্দে মহীয়ান,
মনে পড়ে সেই অতি মধুময় দিনগুলি অতীতের,
চঞ্চল মন, চল্‌ চল্‌ ফিরে ফেলে-আসা পথে ফের।
স্বপ্নের রচা স্বর্গীয় সেই উৎসবময় পুর,
সেই অঞ্চলে মোর মন চলে আনন্দ ভারাতুর।

শ্রীপঞ্চমীর প্রভাতে আজিকে ভুলেছি বর্তমান,
ছেলেবেলাকার মধু-এলাকার পাই যেন সন্ধান।

আর কোন দিন সেই সুখময় কৈশোরে ফিরে যাব না। কিন্তু কবি সুনির্মল বসুর সহৃদয় দাক্ষিণ্যে সেই মধুর দিনগুলি যেন পুনরায় ফিরে আসে, অনেক সুখদুঃখভরা স্মৃতি নতুন করে জেগে ওঠে। নিজেকে নতুন করে ফিরে পাই।

নির্বাসিতের আত্মকথা

মহাত্মা গান্ধী ডাক দিয়েছেন, 'সারে হিন্দুস্থান উথল পাথল জায়েঙ্গে।' সমগ্র ভারতব্যাপী আওয়াজ উঠেছে, ' আংরেজ, হিন্দুস্থান ছোড়ো।' দিকে দিকে গম্ভীর আরাবে মুক্তি সেনানী শপথ গ্রহণ করেছে। প্রতি গুহামুখে অরণ্যে প্রান্তরে সে গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে : 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

সেই রক্তঝরা বিয়াল্লিশের দিনগুলির সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়েছে, তখন আমরা নিতান্ত কিশোর। উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, সুকুমার রায়ের রচনা শেষ করে সবে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে 'পথের পাঁচালী'পড়া শেষ করেছি। এমন সময় এলো ১৯৪১-এর জাপানী-বর্মী যুদ্ধ, তারপরই মন্বন্তর আর বিয়াল্লিশের আন্দোলন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সম্যক পরিচয় লাভের বয়স তখন হয়নি। কিন্তু ১৯৪২ সালেই দেশের কথা প্রথম জেনেছি। অঙ্ক-ইতিহাস-ইংরেজী-সংস্কৃত পাঠের মাঝে দেশ এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই প্রথম অনাত্মীয় মানুষকে আত্মীয় বলে ভাবতে শিখেছি। যাকে কোনোদিন দেখি নি, তাকে একদিনের পরিচয়ে দাদা বলে ডেকেছি। যার কথা কোনোদিন শুনি নি, তাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করেছি। আমরা মফঃস্বলের নিস্তরঙ্গ জীবনের মন্থর স্রোতে ভেসে চলেছিলাম। সকালে পড়া , দুপুরে স্কুল, বিকেলে খেলা আর গঙ্গার ধারে বসে আড্ডা, সন্ধ্যায় পড়া— এই বাঁধা রুটিনে চলেছিল অমাদের জীবন। কলকাতার কল্লোলের পর মফঃস্বলের এই জীবন আমার কাছে অসহ্য, দুর্বহ, ভারগ্রস্ত মনে হত। তবে মন ভোলাবার মতো গঙ্গা ছিল। কলকাতায় গঙ্গাকে কখনো আপন করে পাই নি,আর লেকের নিস্তরঙ্গ জলে মন ভরে না। এখন গঙ্গা আমার মনোহরণ করল। গঙ্গার স্রোতে ভেসে এলো নতুন মানুষ, নতুন জীবন।

আমাদের ছিল খেলার ক্লাব। শেষে তা হয়ে দাঁড়াল রাজনীতির ঘাঁটি। দূরবর্তী সদর-শহর থেকে অপরিচিত মানুষেরা এলেন। এক মুখ হাসি নিয়ে আমাদের পিঠে হাত রাখলেন। শোনালেন নতুন কাহিনী। আগস্ট বিপ্লব, ভারত ছাড়ো, বিস্ময়কর অন্তর্ধানের অন্তরাল থেকে

ভেসে-আসা কণ্ঠস্বর সুভাষচন্দ্রের। বের্লিন, সায়গন, টোকিও বেতারে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে আমরা রোমাঞ্চিত হলাম। সদর-শহর থেকে যাঁরা এলেন, তাঁদের কাছেই বৃহত্তর জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছি। পরমশ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাই (অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ) ও তাঁর শিষ্যেরা আমাদের নবজীবন-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

আর তখন অনেক নতুন নতুন বই পড়তে পেলাম। 'শহীদ ক্ষুদিরাম', 'ফাঁসীর সত্যেন,' 'কানাইলাল', 'দ্বীপান্তরের বাঁশি,' এবং অবিস্মরণীয় 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

শেষোক্ত বইটি পড়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। আজ পঁচিশ বছর পরে 'নির্বাসিতের আত্মকথা' আবার পড়লাম, নতুন করে মুগ্ধ হলাম। সেদিন এ-বই পড়ে বেদনা পেয়েছিলাম। আজো বেদনা পেলাম। সেদিনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আজকের প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য আছে, কিন্তু এই বইয়ের আবেদন বিন্দুমাত্র কমে নি।

মনে আছে, নবমন্ত্রদাতা অগ্রজেরা রাজনৈতিক স্টাডি-সার্কেলে নানা বিষয় আলোচনা করতেন। একদিন 'উপেনদা'র কথা উঠল। কে উপেনদা? অগ্রজ রাজনৈতিক কর্মীরা 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'উপেনদা' নামে উল্লেখ করতেন। তাঁদের কাছেই তখন জেনেছিলাম, বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূচনাকারী বাঙালী তরুণগোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন এই উপেন্দ্রনাথ। মানিকতলার বোমার মামলায় ধরা পড়ে বারো বছর আন্দামানে কাটিয়ে এসেছেন। সেইসঙ্গে আরো নাম শুনলাম— শ্রীঅরবিন্দ, দেবব্রত, হৃষিকেশ, ভূপেন, সত্যেন, উল্লাসকর। সেই বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথের সৃষ্টি 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

আশ্চর্য বই!

এই কথা ছাড়া আর কোনো মন্তব্য প্রথম পাঠের পর মনে আসে না। এই বই বারবার পড়া যায়, তবু কখনো পুরনো বলে মনে হয় না। সমস্ত বইটার মধ্যে বেদনা ও ক্রন্দন অন্তঃপ্রবাহের মতো বহে গিয়েছে। বাইরে হাসি স্ফূর্তি ঠাট্টার আবরণ দিয়ে সেই বেদনাকে ঢেকে রাখা হয়েছে।

বইটার সূচনা এত চমৎকার ও চিত্তগ্রাহী যে সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমনকে টেনে নেয় :

"১৯০৬ খৃষ্টাব্দ তখন শীতকাল। আসর বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় সবে মাত্র 'সন্ধ্যা'য় চাটিম চাটিম বুলি ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষার জন্য বরোদার চাকরী ছাড়িয়া আসিয়াছেন। বিপিনবাবুও পুরাতন কংগ্রেসী দল হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, সারা দেশটা যেন নূতনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।"

এই নূতনের প্রতীক্ষায় পাঠকমন ব্যাকুল হয়। 'নির্বাসিতের আত্মকথা' এই প্রতীক্ষার পরমাপ্রাপ্তি।

'নির্বাসিতের আত্মকথা' বড় ভয়ংকর কাহিনী। অথচ উপেন্দ্রনাথ অবহেলায় হাসিঠাট্টায় এই কাহিনী পরিবেশন করেছেন। যেখানে প্রাণ নিয়ে খেলা, সেখানে তিনি যৌবনের ভরা আনন্দ বিলিয়েছেন।

'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম', আর 'যুগান্তর'— এই তিনটি পত্রিকায় ১৯০৬ সালের বঙ্গদেশে যে ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল, উপেন্দ্রনাথ তার বর্ণনা দিয়েছেন।

আপন প্রাণের টানকে কত সহজেই না তিনি প্রকাশ করেছেন :

"আমি ঘর কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, আর পাঁচজনে মিলিয়া রাতারাতি ভারতটাকে স্বাধীন করিয়া লইবে, এতো আর সহ্য করা যায় না।

কলিকাতার যুগান্তর অফিসে দেখিলাম, ৩/৪ টি যুবক মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। গুলি-গোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়াছিলেন।"

অচিরে উপেন্দ্রনাথ 'যুগান্তর' দল-ভুক্ত হয়ে পড়লেন। বারীন্দ্রের সঙ্গে তিনি 'যুগান্তর' সম্পাদনা শুরু করলেন। হু হু করে দিন দিন 'যুগান্তরে'র গ্রাহকসংখ্যা বাড়তে লাগল। সেদিন ১৯০৬/০৭-এ বঙ্গদেশের অবস্থা বর্ণনা করেছেন উপেন্দ্রনাথ। আজ বারবার সেই বর্ণনা পড়তে ইচ্ছে করে :

" বাংলার সে একটা অপূর্ব দিন আসিয়াছিল। আশার রঙীন নেশায় বাঙালীর ছেলেরা তখন ভরপুর। 'লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে না রাখে কাহারো ঋণ।' কোন্ দৈবস্পর্শে যেন বাঙালীর ঘুমন্ত প্রাণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন অজানা দেশের আলোক আসিয়া তাহার মনের যুগযুগান্তরের আঁধার যেন মুছিয়া দিয়াছিল। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।' — রবীন্দ্র যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা সেই সময়কার বাঙালী ছেলেদের ছবি। সত্য সত্যই তখন একটা জ্বলন্ত বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরাই সত্য, ইংরেজের তোপ, বারুদ, গোলাগুলি, পল্টন, মেসিনগান— ওসব শুধু মায়ার ছায়া! এ ভোজবাজীর রাজ্য, এ তাসের ঘর— আমাদের এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম, মনে হইত যেন দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছেন।"

হাল্কা সূচনা কেমন করে অনতিবিলম্বে গভীর সুরে পরিণত হতে পারে, তার পরিচয় 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র প্রথম চার-পাঁচ পৃষ্ঠাতেই পাই। হাসি-কান্নার ধূপছায়া জমিতে উপেন্দ্রনাথ জীবনকে বয়ন করেছেন। তাই পুনর্বার হাসির কথা (না কি তাও বেদনা-জাত!)—

বারীন্দ্রকুমারের মুখে সুরট কংগ্রেসের বিবরণ :

"বারীন এক কথায় বলিয়া দিল— 'চোর, বেটারা চোর।' সমস্বরে আমরা সকলেই ধ্বনি করিয়া উঠিলাম— 'কেন? কেন? কেন?' বারীন বলিল— 'এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে, তাঁরা সবাই প্রস্তুত, শুধু বাংলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না সব ঢুঁ ঢুঁ। কোথাও কিছু নেই, শুধু কর্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। দু' একটা ছেলে একটু আধটু কাজ করবার চেষ্টা করছে, তাও কর্তাদের লুকিয়ে। খুব কসে ব্যাটাদের

শুনিয়ে দিয়ে এসেছি!"

তারপর মানিকতলার বাগানে বারীন্দ্র-উপেন্দ্র-উল্লাসকর প্রমুখ দল ধরা পড়ল। আলিপুর জেলে ছেলের দল বন্দী হল। এই বন্দীজীবনের অসাহয়তা উপেন্দ্রনাথ সহজ সুরে বর্ণনা করেছেন :

"ধরা পড়ার উত্তেজনা সামলাইতেই প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম একটি প্রায় সাত হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া কুঠরীর মধ্যে আমরা তিনটি প্রাণী আবদ্ধ আছি।.....

কুঠরীর সামনে একটি ছোট বারান্দা।...বারান্দার সামনে সরু লম্বা উঠান, তার তাহার পরেই অভ্রভেদী প্রাচীর। প্রাচীরটা ছিল আমাদের চক্ষুশূল। সেটা যেন অহরহ চীৎকার করিয়া বলিত— 'তোমরা কয়েদী, তোমরা কয়েদী। আমার হাতে যখন পড়িয়াছ, তখন আর তোমাদের নিস্তার নাই।' প্রাচীরের উপর দিয়া খানিকটা আকাশ ও একটা অশ্বত্থ গাছের মাথা দেখিতে পাওয়া যাইত। জেলখানার কবিত্ব কেবল এইটুকু লইয়াই, বাকি সবটাই একেবারে নিরেট গদ্য। আর সবচেয়ে কটমট গদ্য আহারের ব্যবস্থাটা। প্রথম দিন তাহা দেখিয়া হাসি পাইল, দ্বিতীয় দিন রাগ ধরিল, তৃতীয় দিন কান্না আসিল।"

কিন্তু উপেন্দ্রনাথ এই কান্নাকে প্রশ্রয় দেন নি। 'সেল' থেকে ছাড়া পেয়ে সবাইকে যখন একটা 'ওয়ার্ডে' একত্র রাখা হল, তখন ফুর্তি দেখে কে!

এই বিচারাধীন রাজবন্দীর দলের প্রাণে মৃত্যু শংকামাত্র নেই, অথচ ফাঁসি বা দ্বীপান্তর সুনিশ্চিত, তবু 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।' উপেন্দ্রনাথ এই শংকামুক্ত জীবনের আশ্চর্য বর্ণনা দিয়েছেন :

"সন্ধ্যার সময় আড্ডা বসিত। হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, দেবব্রত, কয়জনেই বেশ গাহিতে পারিত, কিন্তু দেবব্রত গম্ভীর পুরুষ— বড় একটা গাহিত না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন তাহার স্বরচিত একটা গান আমাদের শুনাইয়াছিল। ভারতব্যাপী একটা বিপ্লবকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা রচিত। তাহার সুরের এমন একটা মোহিনী শক্তি যে, গান শুনিতে শুনিতে বিপ্লবের রক্তচিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিত। গান বা গদ্য কস্মিনকালেও আমার বড় একটা মনে থাকে না, কিন্তু দেবব্রতের সেই গানটার দুই এক ছত্র আজও মনে গাঁথিয়া আছে—

> উঠিয়া দাঁড়াল জননী!
> কোটী কোটী সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল!
> রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
> রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
> রক্তবর্ণ ডালি, রক্তিম অঞ্জলি,
> বীর-রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল!

গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত

জলসঞ্জ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহ গর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে, মায়ের রক্ত-চরণ বেড়িয়া গগনস্পর্শী উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণ-বাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ব্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখন স্পর্শও করিতে পারিবে না।"

এইভাবে উপেন্দ্রনাথ ছবির পর ছবি এঁকেছেন। অব্যর্থলক্ষ্য তীরন্দাজের মতো তিনি লক্ষ্যভেদ করেছেন। হাস্য, রৌদ্র কারুণ্য, বৈরাগ্য— সব কিছুই তাঁর আয়ত্তে। সদ্যধৃত বর্ণনাপাঠে বিপ্লবের রক্তচিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত। রোমাঞ্চ আর উত্তেজনায় আমাদের শরীর মন শিউরে উঠত, একথা আজো স্পষ্ট মনে পড়ে।

এতক্ষণ যে-সব উদ্ধৃতি দিয়েছি, তার মধ্যে হাস্য, রৌদ্র রস দেখেছি। উপেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, জেল জীবনে " বিপুল হাস্যরসের মাঝে মাঝে একটু আধটু করুণ রসও দেখা দিত।" কী অসাধারণ সংযমের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ সেই রস সৃষ্টি করেছেন, আপন ব্যক্তিজীবনের বেদনা কত সংযত রূপে প্রকাশ করেছেন!

"শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কি রকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞাসা করায় শচীন লপ্‌সীর নাম করিল। পাছে লপ্‌সীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া তাহার পিতার মনে কষ্ট হয় , সেই ভয়ে শচীন লপ্‌সীর গুণগান বর্ণনা করিতে করিতে বলিল— 'লপ্‌সী খুব পুষ্টিকর জিনিস।' পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন — 'বাড়িতে ছেলে আমার পোলাও-এর বাটি টান মেরে ফেলে দিত, আর আজ লপ্‌সী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস!' ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয়, তাহা তখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই, তবে তাহার ক্ষীণ আভাষ যে একেবারে পাই নাই, তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র, কথা কহিতে পারে না। হয়ত এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলি আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল।"

সেই মৃত্যু-সমাসন্ন জেলখানা আর আদালত যাওয়া আসার পথে এই মুক্তপ্রাণ তরুণ বন্দীরা জীবনের যে জয়গান গাইতেন, উপেন্দ্রনাথ তার বর্ণনা দিয়েছেন :

"স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা যেমন মহাস্ফূর্তিতে বাড়ি ফিরিয়া আসে, আমরাও সেইরূপ আদালত ভাঙ্গিবার পর গান গাহিতে গাহিতে চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী চড়িয়া জেলে ফিরিয়া আসিতাম।" দুদিন বাদে কেউবা ফাঁসি কাঠে কেউ বা দ্বীপান্তরে যাবে— সে বিষয়ে সেদিন কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। হাসি ঠাট্টায় মরণ-ভয়কে এই মৃত্যুঞ্জয় বন্দীরা তুচ্ছ করে দিয়েছিলেন। 'নির্বাসিতের আত্মকথা' তাই সেদিন আমার কিশোরচিত্ত নব আনন্দ সঞ্চার করেছিল, দেশকে নবদৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছিল, জীবনের তাৎপর্য বদলে দিয়েছিল, বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের জীবনকে অসহ্য বোধ করতে শিখিয়েছিল।

উপেন্দ্রনাথ তারপর বর্ণনা করেছেন বিচার শেষের কাহিনী। সেসন্স কোর্টে রায়ের পর হাইকোর্টের আপীলের রায় প্রকাশিত হলে জানা গেল, তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অকুণ্ঠভাবে তিনি আপন প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন :

"মনটা যেন নিতান্তই অসহায় বালকের মত দিশেহারা হইয়া উঠিল। বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটাইয়া দিতে হইবে! এর চেয়ে যে ফাঁসী ছিল ভাল। ভগবানের দোহাই দিয়া যে নির্বিবাদে দুঃখকষ্ট হজম করিব, সে উপায়ও আমার ছিল না। ভগবানের উপর বিশ্বাসটা অনেক দিন হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ....কর্মকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলাম।... একটা অজ্ঞাতপূর্ব আশ্রয় পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম, প্রাণটা কাতর হইয়া বলিতে লাগিল— 'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

বিপদে পড়িলে আর কিছু লাভ না হোক, মানুষ নিজেকে চিনিবার অবসর পায়। কঠোর নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাহাই আরম্ভ হইল। সেসন্স কোর্টের রায় বাহির হইতেই আমাদের বেড়ি লাগাইয়া কুঠরীর মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইল। সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় এক একবার মনে হইত যেন পাগল হইয়া গেলাম। মাথার ভিতর উন্মত্ত চিন্তার তরঙ্গ যেন মাথা ফাটাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত দিন কাহারও সহিত কথা কহিবার জো নাই।"

স্পষ্ট মনে আছে, এই বর্ণনা পড়তে পড়তে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসত। আজো অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। এই বর্ণনার পরবর্তী অনুচ্ছেদে তার বিবরণ পাই—

"একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় পাশের কুঠরীতে একটি ছেলে চীৎকার করিয়া গান গাহিয়া উঠিল। তাল মান লয়ের সহিত সে গানের বড় একটা সম্বন্ধ নাই; কিন্তু সে গান শুনিয়া খুব এক চোট হো হো করিয়া হাসিয়া আর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া যে আমার প্রচণ্ড মাথাধরা ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ মনে পড়ে।"

সেই নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জেল-কুঠরীর মধ্যে বীর সন্ন্যাসী উপেন্দ্রনাথ এইভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন বলেই পরবর্তী এক যুগের আন্দামান-জীবন উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। সেদিন আমার অগ্রজ রাজনৈতিক কর্মীরা আমাদের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পড়তে দিয়েছিলেন কেন, তা আজ বুঝতে পারি। সেদিন এতটা বুঝি নি, কিন্তু 'আত্মকথা'-পাঠ একেবারে বিফল হয় নি বলেই মনে করি।

'আত্মকথা'র প্রথম থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ এদেশের কাহিনী, নবম থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ আন্দামান কাহিনী। শেষোক্ত কাহিনী বড় ভয়ঙ্কর কাহিনী। উপেন্দ্রনাথ এত নির্বিকারভাবে সহজে ঠাট্টার সুরে বর্ণনা করেছেন যে, মনে মনে উপেন্দ্রনাথকে বিরক্ত সন্ন্যাসী ও মুক্ত শিল্পী বলে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে।

এগার বছর আন্দামানে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। সঙ্গী বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর, হেমচন্দ্র ও আরো অনেকে (গদর দল, লাহোর ষড়যন্ত্রী, শিখ পল্টন)। গ্রন্থের এই অংশে আন্দামান

সেলুলার জেলের নারকীয় অত্যাচারের বর্ণনা। নরককে কীভাবে আনন্দক্ষেত্রে পরিণত করা যায়, তার পরিচয় দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ।

উল্লাসকর নারকীয় অত্যাচারের ফলে উন্মাদ হয়ে গেলেন। উপেন্দ্রনাথ লিখছেন :

"জেলেখানার প্রকৃত মূর্তি সেইদিন আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। বাঁচিয়া দেশে ফিরিবার ত আর আমাদের কোনও আশা নাই— কেহ ফাঁসি খাইয়া মরিবে, কেহ বা পাগল হইয়া মরিবে। আর যদি মরিতেই হয়, তবে আর স্বহস্তে এই যন্ত্রণার বোঝা উঠান কেন? প্রায় সকলেই স্থির করিলেন যে, যতদিন আমাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা না হয়, ততদিন কাজকর্ম করা হইবে না। এদিকে আমরা 'আল্টিমেটাম' দিয়া তাল ঠুকিয়া মরিয়া হইয়া রহিলাম, ওদিকে কর্তৃপক্ষও তাঁহাদের তূণ হইতে চোখা চোখা বাণ ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন।"

শুরু হল নারকীয় অত্যাচার। আর বাংলা তথা ভারতের রাজবন্দীদের প্রতিরোধ। এর ফলে কত প্রাণ অকালে ঝরে গেল, কে তার খোঁজ রাখে!

'নির্বাসিতের আত্মকথা' পড়তে পড়তে সেদিন আমার কিশোর চিত্তে অদেখা জেলের ছবি ভেসে উঠত। সেদিন প্রভাতফেরীতে আর সান্ধ্য বৈঠকে আমরা যখন গান গাইতাম,

'রক্তনিশি ভোরে কে ওই ডাকে মোরে'

তখন মনে হত সেই দূরবর্তী নির্বাসিতের বেদনা অনুভব করছি। যখন আমরা গাইতাম—

'উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত'

তখন ভাবতাম, আমাদের পূর্বসূরীরা আন্দামান জেলে ছোবড়া পিটেছেন, ঘানিতে ঘুরেছেন, ঘাস ছিঁড়েছেন। কাজি নজরুল ইসলামের গানে ও কবিতায় আমরা এঁদেরই দেখেছি। দ্বীপান্তরের বন্দিনী ভারতীর অর্চনা আজ কে করবে?— এই প্রশ্নে জবাবে নজরুল যে কবিতা লিখেছিলেন, তাতে এঁদেরই জয়গান করা হয়েছে।

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান হে
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা।'

— নজরুলের গানের মধ্যে আমার যাঁদের চিন্ময় মূর্তি দেখেছি, 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় তাঁদের মৃন্ময় মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছি। সেদিন নজরুলের গান আর 'নির্বাসিতের আত্মকথা' আমাদের সামনে দেশমাতৃকার ধ্যানের রূপটিকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছিল।

'নির্বাসিতের আত্মকথা' আমার কাছে দেশবরণের অন্যতম দীক্ষাগ্রন্থ হয়ে আছে। তাই একে ভুলতে পারি না, পারা সম্ভব নয়। বহু গ্রন্থপাঠের ও সাহিত্যরুচির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছি, কিন্তু 'নির্বাসিতের আত্মকথা' আজো আমার বন্ধু, সঙ্গী, সান্ত্বনাদাতা, আশ্রয়। Love is not Time's Fool. প্রেম সময়কে পরিবেশকে পরিবর্তনকে অস্বীকার করে জয়ী হয়। 'নির্বাসিতের আত্মকথা' সেই ভাবে সেদিন আমার কিশোরচিত্তকে লুঠ করে নিয়েছিল। একটু একটু করে বুঝতে শিখেছিলাম, দেশ কাকে বলে, বৃটিশ-শাসন কত ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর,

দেশসাধানার পথ কত বিপজ্জনক অথচ কত আকর্ষণীয়, আর দেশমাতার নামে উৎসর্গীকৃত অগ্রজ কর্মীরা কত শ্রদ্ধেয়।

কতবার পড়েছি কানাইলালের ফাঁসির বর্ণনা। উপেন্দ্রনাথ অনুপম ভঙ্গীতে আলিপুর জেলে মৃত্যুপ্রতীক্ষারত কানাইয়ের ছবি এঁকেছেন :

"আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে; জীবনের বাকি কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাই-এর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটি দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই— প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবারে সময় এক সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে, সেই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই যেন কোন্ শুভ মুহূর্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে। প্রহরীর নিকট শুনিলাম, ফাঁসীর আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউন্ড বাড়িয়া গিয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তিরোধের এমন পথও আছে, যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবানও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত।

তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজ-শাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবারই কথা। ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষরা বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল— 'তোমাদের হাতে এরকম ছেলে আর কতকগুলি আছে?' যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানের কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।"

আমরা মনশ্চক্ষুতে কানাইলালের ছবি দেখতাম— দৃঢ় অকম্পিত পদে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছেন— গলায় গান উঠত 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান'— আমরা তাঁদরেই দেশের ছেলে. এই অনুভূতিতে আমরা নব জীবন পেতাম।

'নির্বাসিতের আত্মকথা' ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বেরিয়েছিল। সেকালে এ বই-এর প্রচুর বিক্রি হয়েছে। আর আজ? একালের ছেলেরা এ বইয়ের নামই জানে না। স্বাধীন ভারতে যে জন্মগ্রহণ করেছে, সে কি 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পড়তে চায়? ঠিক জানি না। যদি না পড়তে চায় ত জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতা ও আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

খুব জানতে ইচ্ছে ছিল, এ বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কী।

সে কৌতূহলের নিবৃত্তি হ'ল যখন সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবেরে 'ময়ূরকণ্ঠী' পড়ি। আলি সাহেব 'উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— 'নির্বাসিতের আত্মকথা' রচনায় লিখেছেন,

"১৯২১ (দু চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে দেখি একগাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষার বিস্তর পুস্তক পেতেন। তাঁর পড়া হয়ে গেল তার অধিকাংশ বিশ্বভারতী পুস্তকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছিনে, এ বই সত্যসত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এ রকম বই বিরল, বাঙলাতে তো বটেই।

পরদিন সকাল বেলা গুরুদেবের ক্লাশে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কেউ পড়েছ ? বইখানা প্রকাশিত হওয়ামাত্রই রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে, তিনি সেখানা পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান, সেখান থেকে আমি সেটাকে কব্জা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কি করে? বয়স তখন অল্প, ভারী গর্ব অনুভব করলুম।

বললুম , 'পড়েছি।'

শুধালেন, 'কি রকম লাগল।'

আমি বললুম, 'খুব ভাল বই।'

রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য বই হয়েছে। এরকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।'

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি করে প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাতা কাবুলবিদ্রোহের সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, রবীন্দ্রনাথ বইখানার অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।"

'নির্বাসিতের আত্মকথা' আশ্চর্য বই। তা ফিরে ফিরে পড়বার মতো। তার ছবি স্মৃতিপট থেকে কখনো মুছে যাবার নয়। কত অনুভূতি, কত রসবাক্য, কত চারু বাক্যভঙ্গী, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা এই বইয়ে ছড়িয়ে আছে। হাস্যে ক্রন্দনে বৈরাগ্যে ত্যাগে বেদনায় জীবনোল্লাসে এ বই ভরপুর। কী আশ্চর্য সব ছবি! মৃত্যুভয়মুক্ত তরুণের কী অসাধারণ বীরত্ব! কী অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগ! এ বই পড়ে তাই দুঃখ হয় একালের কথা ভেবে। আলি সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আর্তনাদ করতে ইচ্ছে হয়— " আজ যখন বাংলাদেশের দিকে তাকাই, তখন বারম্বার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাঙলা দেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে?"

বিপ্লবী সন্ন্যাসী

দেশসেবার মন্ত্রে কৈশোরে আমাদের যাঁরা দীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রথমেই আমাদের কয়েকটি বই পড়িয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা', বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'দ্বীপান্তরের বাঁশি,' ও 'ফাঁসির সত্যেন,' 'শহীদ ক্ষুদিরাম' পড়েছিলাম। শেষ বইদুটির লেখকের নাম মনে নেই, মনে ছাপ রয়ে গেছে— নির্ভীক যৌবনের দুঃসাহসিক জীবনকথা। এ ছাড়া যে-তিনটি বই রাজনৈতিক দাদারা আমাদের বিশেষ ভাবে পড়িয়েছিলেন, পাঠ ও আলোচনার দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তা হল বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' এবং 'বর্তমান ভারত।'

কৈশোরে কল্পনাপ্রবণ মনে রঙ ধরাতে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবন যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, তার ওপর এই তিনখানি বইয়ে স্বামিজী আমাদের হৃদয় কেড়ে নিয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে যখন সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন' ও 'নূতনের সন্ধান' বইদুটি পড়ি তখন স্বামিজীর উপর ভক্তি আরো বেড়ে গেল। দেখলাম সুভাষচন্দ্রের লেখা চিঠিগুলি 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

দুখানি পত্রে সুভাষ স্বামিজীর এইসব বই কর্মীদের পড়তে বলেছিলেন — 'পত্রাবলী,' 'ভারতে বিবেকানন্দ,' 'বীরবাণী', 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য,' 'বক্তৃতাবলী,' 'ভাববার কথা,' 'পরিব্রাজক', 'চিকাগো বক্তৃতা,' 'বর্তমান ভারত'; সেই সঙ্গে সুপারিশ করেছিলেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।'

মনে পড়ে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী দিনগুলির কথা। রক্তঝরা বিয়াল্লিশের দিন, তার পরেকার অন্ধকার দিনগুলি, তারও পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের অমর বীর-কাহিনীর স্পর্শে জেগে-ওঠা সোনালী দিন। সেই দিনে পরিচয় হয়েছিল পরমশ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশায় অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। খুব স্পষ্ট মনে পড়ে, চুঁচুড়ার সংস্কৃতি সংসদের দোতলার ঘরে বসে মাস্টারমশাই আমাদের বলেছিলেন— বিবেকানন্দের বইগুলি পড়ো, অনেক-কিছু জানতে পারবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাদারা হাতে পৌছে দিয়েছিলেন 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' আর 'বর্তমান ভারত'।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থের সূচনাটি এতো চিত্তচমৎকারী যে প্রথম পাঠেই পাঠক লেখকের বশীভূত হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক দাদাদের এই জ্ঞানটা ছিল যে যতই তত্ত্বকথা ও বিপ্লবের কথা হোক তা যদি লেখার গুণে পাঠকচিত্ত জয় করতে অসমর্থ হয়, তবে তরুণ কর্মী তা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবে না। 'পরিব্রাজক' এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। তার পরিচয় — আজো 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের সূচনাটি মনের মধ্যে জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

উদ্বোধন-পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে সম্বোধন করে লেখা এই ভ্রমণ

বৃত্তান্তের (পরিব্রাজক ১৮৯৯) সূচনাটিতে প্রাণের স্ফূর্তি ও যৌবনের দুঃসাহস প্রকাশিত হয়েছে :

"স্বামীজি! ওঁ নমো নারায়ণায়— 'মো'-কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত করে নিও ভায়া। আজ সাতদিন হ'ল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, খবরটা লিখবো মনে করি, খাতাপত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ কিন্তু— ঐ বাঙালি 'কিন্তু' বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর— কুড়েমি। ডায়েরী, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখবো মনে করি, তারপর নানা কাজে সেটা 'অনন্ত কাল' নামক সময়েতেই থাকে, এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর— তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে করো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না— রাম হৃদয়ে বলে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুড়েমি। কি উৎপাত! 'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশ'— থুড়ি, হ'ল না 'ক্ব সূর্য প্রভববংশচূড়ামণি রামৈকশরণো বানরেন্দ্র': আর কোথা আমি দীন— অতি দীন। তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্র এক লাফে পার হয়েছিলেন। আর আমরা কাঠের বাড়ির মধ্যে বন্ধ হয়ে, ওছল পাছল করে, খোঁটাখুঁটি ধরে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্ছি। একটা বাহাদুরি আছে— তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস রাক্ষুসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি! খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙা চুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ করে ছুরিখানা তারই গায়ে বসায়— ভায়া একটু নধরও আছেন কি না। বলি হ্যাঁগো, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সী-সিকনেস্ হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো-পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মিকী কত জান, আমাদের গোঁসাইজী তো কিছুই বলছেন না। বোধ হয়— হয় নি, তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেইখানটায় একটু সন্দেহ হয়।"

এই বর্ণনার গুণ ব্যাখার অপেক্ষা রাখে না। ফূর্তি, ওজঃশক্তি, যৌবনের বেগ— সবই এতে সঞ্চারিত হয়েছে এবং উপস্থাপনের কৌশলে তা পাঠকহৃদয়ে অনায়াস প্রবেশ লাভ করে।

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের এই সূচনা পড়ে হেসে উঠেছিলেম— মনে জেগেছিল ফূর্তি। এক পাতা পরেই স্বামিজী যে অবিস্মরণীয় "গঙ্গার শোভা" বর্ণনা করেছেন, তার ওজস্বিতা ও ধ্বনিরোল শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে যায়। আমাদের সাপ্তাহিক ক্লাস-এ রাজনৈতিক তত্ত্বব্যাখার আসরে মাঝে মাঝে আলোচনা বন্ধ করে পাঠ হ'ত। মনে আছে, পাঠের সূচনাতেই আমি অবধারিত চীৎকারে করতেম— বিবেকানন্দের লেখা থেকে পড়া হোক। হৈ হৈ করে সে দাবি 'পাস্' হয়ে যেত। আর তত্ত্বব্যাখ্যাতা পরিবর্তিত হতেন পাঠকে।

যে কথা বলেছিলাম, 'পরিব্রাজকে'র সেই অবিস্মরণীয় গঙ্গার শোভা বর্ণনা। তার একমাত্র তুলনা রবীন্দ্রনাথের গঙ্গাবর্ণনা। এই তৃতীয়রহিত বর্ণনা বিবেকানন্দের কলমে গঙ্গাস্রোতের মতই নিঃসৃত হয়েছে— ভাষা যেন মন্ত্রপূত নির্ঝরের মতো প্রবাহিত হয়ে চলেছে :

"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল— যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোণা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু, হিমশীতল 'গঙ্গাং বারি মনোহারি' আর সেই অদ্ভুত 'হর হর হর' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের 'হর হর' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গবারির বৈরাগ্যপদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্যন্ত দেখেছ, কিন্তু আমাদের কদর্মাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণ শুভ্রা, সহস্র পোতবক্ষা এ কলকাতার বা বাল্যসংস্কার, কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে ঐ কি সম্বন্ধ!— কুসংস্কার কি?— হবে! গঙ্গা গঙ্গা করে জন্ম কাটায়, গঙ্গা জলে মরে, দূর দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায় তাম্রপাত্রে যত্ন করে রাখে, পালপার্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে।..

গেল বারে (বিদেশে) আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম— কি জানি! বাগে পেলেই এক-আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্ত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুত পদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত! সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বি-সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম— সেই 'হর্ হর্ হর্,' দেখতাম — সেই হিমালয় ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন— 'হর্ হর্ হর্ !!' "

আশ্চর্য এই বর্ণনা। আশ্চর্য এর ঝঙ্কার, মাদকতা আর ধ্বনিরোল। সেদিন আমার মনকে অভিভূত ও পরাজিত করেছিল এই বর্ণনা। ভাগীরথী (হুগলী) নদীকে দেখে সেদিন মনে মনে দেখেছি গোমুখীনিঃসৃত গঙ্গাকে, হৃষীকেশের হরিদ্বারের গঙ্গাকে, প্রয়াগের কাশীর গঙ্গাকে, মুঙ্গেরের উত্তরবাহিনী গঙ্গাকে, মুর্শিদাবাদের গঙ্গাকে। তারপর চোখের সামনে দেখেছি হুগলি নদীকে— আগেই দেখে এসেছি যে কলকাতার গঙ্গাকে, তাকে পুনরায় দেখেছি। এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে, তার সাধনাকে, তার সংস্কৃতিকে সামগ্রিকরূপে দেখেছি। স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছি বিবেকানন্দের রচনায়। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তৃতীয় যে লেখক আমাকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে রম্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত উপস্থিত করেন নি, মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপের ইতিহাসের পথে মানব-পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও সত্য সংকলন করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন, কালক্রমে 'রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন' মহা ধৈর্যশীল দরিদ্র মেহনতী মানুষ এই দুনিয়ায় আধিপত্য করবে।

আমাদের রাজনৈতিক তত্ত্বশিক্ষারও মূল কথা তাই— "আগামী ভবিষ্যৎ মেহনতী মানুষের।" স্বামিজীর লেখায় এই সত্যকে আমরা জীবনের মধ্যে পেয়েছি। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের

পদে পদে স্বাদুতা, অথচ সেই সঙ্গে আছে ইতিহাসের অভ্রান্ত বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যতের নির্দেশ।

'পরিব্রাজক' শেষ করতে না করতেই হাতে এসে গেল 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'। আমাদের পাশ্চাত্ত্যমোহ থেকে মুক্তি দিয়েছে এই গ্রন্থ।

এই গ্রন্থের সূচনাংশ পড়ে শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও দ্বেষ জন্মায়। সেদিন সেটাই প্রয়োজন ছিল। অথচ সে বলদর্পী পশ্চিমী শক্তি অর্ধজগৎ শাসন করছে, তাদের থেকে আমাদের কিছু শেখার আছে, — এই শিক্ষাও স্বামিজী দিয়েছিলেন। যে আধুনিক ভারতবর্ষ বিপ্লবের পথে যেতে চায়, তার পাথেয় হবে নির্মম আত্মবিশ্লেষণ ও শত্রুর স্বরূপ-বিশ্লেষণ। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' সেই পাথেয়। অসংখ্য দেশকর্মী এই বই পড়েছেন, সেদিন আমাদেরও পড়তে হয়েছিল।

কিন্তু কেবল কর্তব্যের অনুরোধে এই বই পড়ি নি। এর নিজস্ব আকর্ষণ শক্তি আমাকে টেনেছিল। তাই আজো একে ভুলি নি।

আমাদের সোনার ভারত সম্পর্কে সমস্ত মোহ ঘুচে গিয়েছিল এই গ্রন্থের সূচনাংশ পড়ে। কী আশ্চর্য ব্যঙ্গ, কী অসাধারণ প্রাণাবেগ, কী গভীর বিশ্লেষণ রয়েছে এই গ্রন্থে।

দুটি বিপরীত ছবি দিয়েছেন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'-কার স্বামিজী।

"বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থি-মজ্জা চর্বণ, অনশন-অর্ধাশন-সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপে দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল-পরিপ্লুত মহা-শ্মশান, তন্মধ্যে ধ্যানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী... ইউরোপীয়, পর্যটক এই দেখে।"

আর—

"নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে-বলে-কৌশলে পরদেশ পরধনাপহরণ পরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈক জীবন ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য অসুর।"

এই দুই ছবির কোনোটাই সর্বাংশে সত্য নয়, অর্ধসত্য মাত্র। সত্যসন্ধানী বিবেকানন্দ তারপরই বলছেন—

"আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইউরোপীয়দের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চলবে না, তাই ওরা প্রবল।

তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে— এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে তাই আমরা বেঁচে আছি।"

গত শতাব্দীর শেষবিন্দুতে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এইসব লেখা প্রকাশিত হয়। স্বদেশী

আন্দোলনের রক্তরাঙা দিন থেকে সুভাষচন্দ্রের মান্দালয়-কারাকক্ষের শান্ত প্রহর পর্যন্ত বিবেকানন্দের এইসব লেখা দেশকর্মীদের দিয়েছিল গভীর আত্মপ্রত্যয় ও দুর্জয় সাহস। আমাদের কৈশোরে দেশমন্ত্রে আমরা দীক্ষা পেয়েছিলেন এই সব লেখা থেকে— এরা আমাদের দিয়েছিল আত্মপ্রত্যয়, আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশক্তি।

কেবল আত্মউদ্বোধনের সহায়ক রূপে নয়, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' সরস রচনারূপে সেদিন আমার মনোহরণ করেছিল। এদেশে ওদেশে অশন বসন ভূষণ সংস্কার নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় লেখকের তীক্ষ্ণ ধী ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি ব্যক্ত হয়েছে সরস জীবনরসিকতা। বিবেকানন্দ যে 'শুকনো সন্নিসী' নন, তিনি যে 'রসে বশে' ছিলেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' ও পত্রাবলীতে পাই। এখানে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' থেকে একটি অংশ উদ্ধার করি— বেশ মনে পড়ে সেদিন আমরা এটি পড়ে কত আমোদ পেয়েছিলেন।

"সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দু কুড়ি কইমাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, এক শ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়। দিনরাত গাড়ি চড়ে, আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে, 'কলকেত্তাই' হওয়ার এই ফল!! আর সর্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব করতে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে অমনি একটু ওষুধ দাও, পোড়া বদ্দিও বলে না যে, দূর কর ওষুধ, যা, দু ক্রোশ হেঁটে আস্‌গে যা। নানান্ দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়া দেখছি। তবে আমাদের অত ডাল-ঝোল-চচ্চরি শুক্তো মোচার ঘন্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশি কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্যাদা বুঝছ না, এই আপসোস্। খাবার নকল কি ইংরেজের করতে হবে— সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব-বাঙলার, ওদের নকল কর যত পারো। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ, শেষ কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক্ মাত্র— আধা সাঁওতালী বীরভূম বাঁক্‌ড়োয় দাঁড়াবে!! তোমরা কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্বনেশে ময়দার তালে হাতে-মাটি দেওয়া ময়রারা দোকান্‌রূপ সর্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম বাঁকড়ো ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরের ফেলে দিয়েছে, কলাইয়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছ, ঢাকা বিক্রমপুরও টাইমাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে 'সইভ্য' হচ্ছে!! নিজেরা তো উচ্ছন্নে গেছ, আবার দেশ সুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড সভ্য, শহুরে লোক! তোমাদের মুখে ছাই! ওরাও এমনি আহাম্মক যে ঐ কলকেতার আবর্জনাগুলো খেয়ে উদরাময় হয়ে মর-মর হবে, তবু বলবে না যে,এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে— নোনা লেগেছে!! কোন রকম করে শহুরে হবে!!"

এই লেখা পড়ে সেদিন আমরা আড্ডায় বসে হো-হো করে হেসেছি। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছি— 'বৎসগণ, স্বামিজীর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা অদ্য ধামাপ্রমাণ মুড়ি খাইব।'

অরবিন্দ উঠে বলেছে— 'সেই সঙ্গে আলুর চপ, বেগুনিও খাইব।' সার্বজনিক চাঁদার পয়সার ধামাপ্রমাণ মুড়ি ও আনুষঙ্গিক এসে পড়ায় সে-যাত্রা আমার প্রস্তাবের ইজ্জৎ বাঁচলো।

স্বামী বিবেকানন্দের আমরা ছিলুম অন্ধ অনুরাগী। এই অনুরাগের কারণ তাঁর মনীষাদীপ্ত রচনা, বিদ্যুদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব ও সহাস্য চরিত্র। তাঁর তৃতীয় যে বইখানি সেদিন আমরা প্রায় কণ্ঠস্থ করেছিলেন, তার নাম 'বর্তমান ভারত।' একথা আশ্চর্যের নয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বসমরকালে বাংলা দেশের অগ্রণী ছাত্র ও কিশোর মাত্রেই এ বই পড়েছিল। আশ্চর্যের কথা এই যে, আজকের কিশোর-ছাত্র-যুবক এ বই পড়ে না। সেদিন আমি 'বর্তমান ভারত' পড়েছি। আজ তা এম এ বি এ ক্লাসে পাঠ্য। কিন্তু সারি সারি ছাত্রছাত্রীর চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এ বই তারা আগে কখনো পড়ে নি। মাত্র শতাব্দী-পাদের ব্যবধানে আমাদের কৈশোর ও ছাত্রজীবন আর এদের কৈশোর ও ছাত্রজীবন— এ দুয়ের মধ্যে কী দুস্তর ব্যবধান! এরা 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র নামই শোনে নি, 'বর্তমান ভারত' নামে একটা গদ্যাংশ সিলেবাসে আছে বলে তাদের অনুমান। হা ঈশ্বর, এর পর আর কী শুনতে হবে!

"বহুল পরিভ্রমণ, গর্বিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা পর্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত ও ভারতের দেশের আচার ব্যবহার এবং জাতীয়ত্বভাবসমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ অধ্যয়ন এবং স্বদেশেবাসীর প্রতি অপার প্রেম ও তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে স্বামিজীর মনে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, 'বর্তমান ভারত' তাহারই নিদর্শন স্বরূপ।" (প্রকাশক স্বামী সারদানন্দের ভূমিকা, ১৯০৫)

কেবল ভারত-ইতিহাস নয়, মানবজাতির উত্থানপতনের ইতিহাস এই গ্রন্থ। অর্ধশতাব্দ পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, আজ তা সত্যে পরিণত— পৃথিবীতে 'শূদ্রত্বের সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে'— দুনিয়াতে আজ মেহনতী মানুষের অভ্যুত্থান। উনিশ শতকের শেষ বিন্দুতে যেদিন রক্তমেঘে পশ্চিম-দিগন্তে শতাব্দীর সূর্য অস্ত গেল, সেদিন স্বামিজী বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেছিলেন, আগামী শতাব্দে শূদ্রের জয় হবে। এ দেশের রাষ্ট্রচিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের দানের যথার্থ মূল্যায়ন আজো হয় নি, যেদিন হবে সেদিন স্বামিজীর এই তিনটি গ্রন্থে মানবসমাজের বিশ্লেষণ সম্যক্ মর্যাদা পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাসের বলে আমাদের রাজনৈতিক দাদারা রাজনীতি ও দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন স্বামিজীর রচনা থেকে।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশসাধনার চরম রূপটি বিধৃত হয়েছে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের অন্তিম অনুচ্ছেদে। মনে পড়ে, সেদিন আমরা এটি কণ্ঠস্থ করেছিলেম— আজো তা আবৃত্তি করতে পারি— সেটিকে উচ্চারণ করে আজ স্মৃতির পটে গভীর রেখায় অঙ্কিত স্বামিজীর ছবিটি দেখি :

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা— এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না— তোমার

নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না— তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না— তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের— নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না— তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও না — নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি , মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল— ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারণসী, বল ভাই — ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, ' হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।''

পথের পাঁচালী

কিশোর-পাঠ্য সাহিত্য থেকে বয়স্ক-পাঠ্য সাহিত্যে আমার উত্তরণ ঘটল যে বইটিকে অবলম্বন করে, তার নাম 'পথের পাঁচালী'। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন লেখক যাঁকে কোনোদিনই বিস্মৃত হতে পারি না। স্মৃতির সরণি বেয়ে যখন পিছন দিকে অনেক দূর চলে যাই তখনি এক শান্ত বিকেলের কথা মনে পড়ে— সামনে উদার গঙ্গা, পিছনে লাইব্রেরির লাল বাড়িটা, গঙ্গাতীরে সবুজ মখমলের মতো ঘাসে আঁকা মাঠ।

তখন কলকাতায় বোমা পড়ো-পড়ো, জাপানী বিমান আক্রমণের ভয়ে কলকাতা সদাশঙ্কিত। সর্বদাই পালাই-পালাই ভাব, ঐ বুঝি বোমা পড়ল। তখন কলকাতার জীবনে কয়েকটি ইংরেজী শব্দ দৈনন্দিন জীবনের শামিল হয়ে গেল: এয়ার-রেড, সাইরেন, ব্ল্যাক-আউট, ইনভেশন, ইভাকুয়েশন, ব্যাফল-ওয়াল,ট্রেঞ্চ, এ-আর-পি। দিনকয়েকের মধ্যে কলকাতার চেহারা বদলে গেল। হংকং গেল, সিঙ্গাপুর গেল, রেঙ্গুন গেল, কলকাতাও বুঝি যায়। তখন শুরু হল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালানো। তার দিশা নেই। হুগলী জেলায় গঙ্গাধারে আমাদের একটা আস্তানা ছিল। সেখান থেকে ঠাকুরমার ডাকের পর ডাক আসতে লাগল। চলে এসো। বিপন্ন উদ্বিগ্ন পরিবারকে কলকাতা থেকে তুলে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে বাবা ফিরে এলেন মরণভয়ভীত কলকাতায়।

কী থেকে কি হয়ে গেল! কলকাতার ছেলে আমি চলে গেলুম মফঃস্বল শহরে। না, ঠিক শহর নয়, আধা-শহর আধা-পাড়া গাঁ। অপদার্থ পৌরসভার কল্যাণে সব রাস্তায় সন্ধের পর

আলো জ্বলে না। কেরাসিনের আলো, কোনদিন ল্যাম্পোস্টে জ্বলে, কোনদিন জ্বলে না। হারিকেন হাতে নিয়ে সন্ধের পর ঘুরতে হয়। হারিকেনের আলোয় লেখাপড়া। সন্ধের পর শহর ঝিমিয়ে পড়ে। রাস্তায় লোকচলাচল একেবারেই থাকে না। প্রহরে প্রহরে শিয়াল ডেকে ওঠে। ঝিঁ ঝিঁ আর মশার ঐকতান, ব্যাঙের ডাক আর বাঁশঝাড়ের মর্মর : এক আলাদা জগৎ। দক্ষিণ কলকাতার আলোকিত কলরবমুখরিত চঞ্চল জীবনের পর এই জীবনে পৌঁছে মনে হ'ল জন্মান্তর হল।

কিন্তু এই আধা শহর-পাড়াগাঁ কি আমায় কিছুই দেয় নি? দিয়েছে। রংপুরের শৈশব-স্বর্গের প্রকৃতি আর হুগলীর কৈশোর-মর্তের প্রকৃতির কত দুস্তর প্রভেদ! রংপুরে শরৎকালের নির্মেঘ আকাশে কখনো কখনো রঙীন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখেছি। উত্তরবঙ্গের প্রচণ্ড শীত ও বর্ষাকে পেয়েছি,আর এখানে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীতীরবর্তী শহরে জীবনের অন্য রূপ দেখেছি।

সবচেয়ে বড়ো লাভ, উদার গঙ্গাকে পেয়েছি। কলকাতার জীবনে গঙ্গা দেখার সুযোগ বিরল। হরেক রকম আকর্ষণের টানে কলকাতার মানুষ এত বিভ্রান্ত যে গঙ্গাতীরে বসার সময় পায় না। এখানে জীবনোপভোগের বিচিত্র আনন্দ ছিল না বলেই গঙ্গাতীরে প্রতি বিকেলে যেতাম। গঙ্গায় নেমে সেই প্রথম সাঁতার শিখেছি, দুপুরে স্নানের ছল করে সাঁতার কাটতে কাটতে মাঝগঙ্গায় চড়ায় তরমুজের সন্ধানে হানা দিয়েছি, কখন বা ওপারে চলে গিয়েছি, ফেরার সময় নৌকোয় ফিরেছি।

দ্বিতীয় লাভ, পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও শহর জীবনকে ভাল করে চিনেছি। কতদিন নির্জন দুপুরে বাগানে আম ও জামের সন্ধানে ঘুরেছি। কি করে অব্যর্থ সন্ধানে ঢিল মেরে আম পাড়তে হয়, কি করে চার ফেলে মাছকে টোপের দিকে নিমন্ত্রণ করে আনতে হয়, আর কি ভাবে খেজুর রসের হাঁড়ি না ভেঙে রস খেতে হয়— এসব শিখেছি। ছুটির দিনে অভিভাবকের সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে কি ভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়, তা শিখেছি।

তৃতীয় লাভ, হাতের কাছে একটা সম্পূর্ণ পাঠাগারকে পেয়েছি। গঙ্গাতীরে লাইব্রেরির সেই লাল বাড়িটায় সাহিত্যসম্ভোগের প্রথম পাঠ নিয়েছি। প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন, সুশিক্ষা হচ্চে স্ব-শিক্ষা, আর লাইব্রেরিতেই তা সম্ভব। তিনি আরো বলেছিলেন, লাইব্রেরি হচ্ছে মনের হাসপাতাল, এখানে বিদ্যার্থির মন স্কুলকলেজের কড়া শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বচ্ছন্দ বেড়ে উঠতে পারে। কর্তৃপক্ষের উদারতায় লাইব্রেরির স্ট্যাক-রুমে অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম, বইয়ের পর বই পড়ে শেষ করেছি, কিছুই বিচার করি নি— যা পেয়েছি তা'ই গোগ্রাসে গিলেছি। পাঁচকড়ি দে'র 'নীলবসনা সুন্দরী,' দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃন্ময়ী,' শশধর দত্তের 'মোহন ও রমা', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দু-খানি ছবি', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক', দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'রবার্ট ব্লেকের কাহিনী'— ভালো মন্দ সবরকম বই তখন পড়েছি।

কলকাতার ছেলে মফঃস্বলে গিয়েছি, গোড়ার দিকে কারুর সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারতাম না। জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুললে যে অবস্থা হয়, আমার তখন সেই অবস্থা। তখন

লাইব্রেরিকেই আশ্রয় করেছিলাম। কৈশোরক-বিভাগের বই দুমাসে শেষ । তারপর বয়স্কপাঠ্য গ্রন্থবিভাগ আক্রমণ করলাম। পড়ার অভ্যাসটা ওখানেই পাকাপোক্ত হল। সেই সঙ্গে দৃষ্টিশক্তিটাও খারাপ হল। স্কুলে ক্লাসঘরে বোর্ডের লেখা ঝাপ্‌সা ঠেকত। অঙ্কের মাস্টারমশাই দু-চারদিন ধমক দিলেন, তারপর বাবাকে বলে দিলেন। তখন আমাকে শ্রীরামপুরে নিয়ে গিয়ে বাবা চশমা করিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে তা আমার নিত্যসঙ্গী। চশমার শক্তি ক্রমশ বেড়েছে, আমার দৃষ্টিশক্তি কমেছে। কিন্তু তাতেও হার মানি নি। লাইব্রেরিতে যতক্ষণ সময় পেতাম, ততক্ষণ পড়েছি। গঙ্গাঘাটে বাঁধা জেলেদের নৌকায় বসে পড়েছি, হারিকেনের আলোয় জ্যামিতি-বই খুলে রেখে গল্পের বই পড়েছি। কী প্রচণ্ড নেশা, কিছুতেই ছাড়তে পারি না।

এই নেশার মধ্যেই একদিন পেয়ে গেলাম 'পথের পাঁচালী'। একবার মনে হয়, সেদিন আমার কোনো গাইড ছিল না বলে ভালমন্দ নানা বই পড়তে হয়েছে। আবার ভাবি, বোধ হয় তার ফল ভালই হয়েছে। ভালমন্দ লেখা চিনতে শিখেছি। পাঁচকড়ি দে'র 'নীলবসনা সুন্দরী' অপেক্ষা 'পথের পাঁচালী' যে বহুগুণে উৎকৃষ্ট, এটা সেই স্কুল-জীবনেই অনুভব করেছি,— সেদিন হয়ত আজকের মতো বিশ্লেষণের সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু কিশোরচিত্তে তার উৎকর্ষ ধরা পড়েছিল।

সেদিন 'পথের পাঁচালী' পড়তে গিয়ে দুটি বিষয় আবিষ্কার করেছিলাম। মনে হয়েছিল এ যে আমারই আত্মজীবনী, অপু ও আমি অভিন্ন। আরো মনে হয়েছিল, 'পথের পাঁচালী' আমার সমবয়সী। দ্বিতীয় অনুভূতিটি তথ্যনির্ভর। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'পথের পাঁচালী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে যেদিন গ্রন্থাকারে ভূমিষ্ঠ হল, সেদিন আমিও ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম। 'পথের পাঁচালী' ও আমি সমবয়সী বন্ধু। আমাদের এই বন্ধুত্ব কোনোদিন যাবার নয়। সংসারের স্বার্থবুদ্ধি ও ঈর্ষা এই বন্ধুত্বে কোনোদিন ফাটল ধরাতে পারবে না।

আর-একটি ঘটনা 'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে আজ মনে পড়ে। বেশ কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা। 'শনিবারের চিঠি'র দুর্দান্ত সম্পাদক সজনীকান্তের দোতলার ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি। কথা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উঠল। সজনীদা বিভূতিভূষণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও 'পথের পাঁচালীর' প্রথম প্রকাশক। যখন এই অসাধারণ উপন্যাস কোনো প্রকাশক ছাপতে রাজী হয় নি তখন সজনীদা স্বেচ্ছায় ওই দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণের কথা বলতে বলতে সজনীদা তার ডেস্কের ভিতর থেকে এক কপি 'পথের পাঁচালী' বার করে আর হাতে দিলেন। ওইটি প্রথম কপি। ছাপা-বাঁধাই শেষ হবামাত্রই বিভূতিভূষণ সজনীদা'কে এটি উপহার দেন, লেখা আছে— "অজয়কে— অপু"। সজনীদার উপন্যাস 'অজয়', তাই 'অজয়'কে 'অপু'র উপহার। সজনীদাও ফিরে এক কাপি 'অজয়' বিভূতিভূষণকে উপহার দিয়ে লিখেছিলেন, " অপুকে—অজয়।' আজ দুই বন্ধুর একজনও নেই, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র অপু আছে।

'পথের পাঁচালী' পড়ে গত সত্তর বছর ধরে বাঙালি কিশোর মাত্রেই ভেবেছে, এতো আমারই জীবন-পাঁচালী। সেদিন আমিও সে কথা ভেবেছিলাম। সাহিত্যসৃষ্টির সর্বজনীনতা বা

কাব্যের 'সন্তানবৃত্তি' সম্পর্কে সেদিন আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু মনে-মনে উপলব্ধি করেছিলাম, বিভূতিভূষণ আমার মনের কথাই লিখেছিলেন।

'পথের পাঁচালী' যেদিন হাতে এলো, সেদিনের আনন্দ আজ আর ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কেবল পরিণত বুদ্ধির এপার থেকে অপরিণত কৈশোরের ওপারে সাহিত্যসম্ভোগের ছায়াটি দেখতে পাচ্ছি। শেলীর মতো হয়ত সেদিন বলতে পারতাম, 'Rarely, rarely comest thou, Spirit of Delight,' সেই বিরল মুহূর্তটি সেদিন এসেছিল।

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, সেদিন 'পথের পাঁচালী' পড়তে পড়তে আমার চোখে জল এসেছিল। চোখের সামনে সব লেখা একাকার হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, লেখক এত নির্মম, এত উদাসীন, এত নিষ্ঠুর!

" অনেক দিন আগের সে দিনটা!

সে ও দিদি দুজনে বাছুর খুঁজিতে খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া উর্দ্ধশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল। সেদিন — আর আজ?

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢু-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটার তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে।...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথেঘাটে বাঁশবনে আমতলায় সে দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল, নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহকোণে ছিল— আজ কিন্তু সত্যসত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল।....

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে....

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক্-ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বারবার বলিতে চাহিল— আমি যাই নি, দিদি, আমি তোকে ভুলি নি, ইচ্ছা করে ফেলেও আসিনি— ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে—

সত্যই সে ভুলে নাই।

উত্তর জীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল।...

তখনই, এই সব সময়েই তাহার মনে পড়িত এক ঘন বর্ষার রাতে অবিশ্রান্ত, বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা—

অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?"

এই বর্ণনা তীক্ষ্ণ শায়কের মতো সেদিন আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছিল। নিপুণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ পাঠকের চোখের জল বার করেছেন, আর সেই মুহূর্তে সাহিত্যসম্ভোগের অ-লৌকিক আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছি। দুর্গানাম্নী কিশোরীকে আমি দেখি নি, সে কি কোনদিন কোথাও ছিল? কল্পনাসৃষ্ট এই মেয়েটিকে লেখক হয়ত দেখেছিলেন। 'পথের পাঁচালী' বইয়ের মধ্যে আমি তাকে স্পষ্টরূপে দেখেছি। মনে আছে দুর্গার জন্য সেই বিকেলে চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

বিভূতিভূষণ কত নির্মম শিল্পী, সেদিন তা মনে মনে অনুভব করেছি, আজ তা বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করি। বোধ হয় সেদিনের উপলব্ধি মূল্যবান ও পবিত্র ছিল।

লেখক ধীরে ধীরে পাঠককে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন দুর্গার মৃত্যুর জন্য। মৃত্যুর অস্পষ্ট কিন্তু নিশ্চিত উপলব্ধিটি প্রথম দুর্গার মনেই এসেছে। বিংশ পরিচ্ছেদে তার প্রথম ইশারা। আঃ, এই সব বর্ণনা পড়তে কী কষ্ট, কী-আনন্দ!

কত অনায়াসে বিভূতিভূষণ এই ইশারা আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

" দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট, এই অতিপরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধিসন্ধিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাব তলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন, ছায়া-ভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু— তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু হু করে— তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!

আর যদি সে না ফেরে— যদি নিতম পিসির মত হয়? ... কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে যাহা আর কখনো আসে নাই। দিনে রাতে, খেলা-ধূলার, কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে একথা তাহায় প্রায়ই মনে হয় ঠিক সে বুঝিতে পারে না তাহা কি, বা কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে...আসিতেছে... শীঘ্রই আসিতেছে।"

'পথের পাঁচালী'তে বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণ পুরনো যুগের প্রতিনিধি। তাঁকে নিয়ে উপন্যাসের সূচনা, তাঁর মৃত্যুতে এক যুগের অবসান। এই বৃদ্ধার কাছে দুর্গা আর অপু কত রূপকথা গল্প ছড়াই না শিখেছিল! মনে আছে সেদিন এই সব ছড়া খুব ভাল লাগত। সবগুলিই কণ্ঠস্থ ছিল। ছড়াগুলির সম্পূর্ণ রূপটি না পেয়ে ইন্দির ঠাকরুণের উপর রাগ হত।

ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুন্‌সে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চূড়ো বাঁধা এক মিন্‌সে।

'মিনসে'র 'মি' অক্ষরটার উপর অকারণ জোর দিয়ে ছোট্ট মাথাটি ঝুঁকিয়ে, ছোট্ট খুকী দুর্গা উচ্চারণ করে ভারি আমোদ পেত। মনে পড়ে ওইভাবে আমি আর আমার বোন পদটি উচ্চারণ করে আনন্দ পেতাম।

অনেক সদুপদেশ, অনেক মহৎ বাক্য, অনেক মূল্যবান জ্ঞানের কথা বিস্মৃত হয়েছি, মনে আছে এইসব ছড়া। রাণুদের বাগানে জঙ্গলের মধ্যে গন্ধ-ভেদালির পাতা খুঁজতে খুঁজতে দুর্গা মনের সুখে মাথা দুলিয়ে ছেলেবেলায় পিসির মুখে শোনা ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে
সুখ নেইকো মনে—

এই ছড়াটি আজো মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে। সাহিত্য-আস্বাদনের সেই দিনগুলিতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নিজেই জানি, আর ফিরে যাওয়া যায় না।

অপু নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামপ্রকৃতির সৌন্দর্যে ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। তার বাবার পুরনো বই-পুঁথি আর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা পড়ে দেশে বিদেশে মানসভ্রমণ করে বেড়াত। গ্রাম-প্রকৃতির হাতছানিতে সে সাড়া দিয়েছিল; ছাপা হরফের জগতের আমন্ত্রণ সে গ্রহণ করেছিল। জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা অপু এখানেই পেয়েছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে যখন ইভাকুয়েশনের হিড়িকে মফঃস্বলে চলে গেলাম, তখনি গ্রামজীবনকে চিনেছি। মনে আছে বাদু নামে একটি ছেলে আমার ক্লাসে পড়ত। একদিন তার সঙ্গে কাটোয়া লাইন ধরে চলে গেলাম কতদূর! বংশবাটি, ত্রিবেণী, কুন্তী, জিরেট, সোমড়া, বলাগড়— লাইন ধরে চলেছিলাম, স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে, দুধারের আমগাছ থেকে আম পাড়তে পাড়তে। কুন্তী, ঘিয়া, সরস্বতী— ছোট ছোট নদীর নামগুলি কী সুন্দর! হুগলীর সদর মহকুমার বহু গ্রামে এইভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি। অ্যাতো চমৎকার নামের গ্রাম আছে, তা আমার জানা ছিল না। এই সময়েই 'পথের পাঁচালী' পড়েছি। অপুর অনুভূতির সঙ্গে আমার অনুভূতি একাকার হয়ে গেছে।

অপুর মনে লতাপাতার মধুর গন্ধভরা দিনগুলি পূর্ব জন্মের সুখ-স্মৃতি বহন করে আনে, অজানা ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট আনন্দ তাকে ব্যাকুল করে তোলে। কিশোর অপু তার বাবার ট্রাঙ্কে একটি হলদে-পাতা, ছেঁড়া মলাট, নামপত্রহীন খণ্ডিত কাব্যগ্রন্থ পেয়েছিল। অপু জানত না কবির নাম। মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য। ভগ্নউরু রাজরথীর বর্ণনা পড়ে অপুর মনে ছবি ভেসে ওঠে-তাদের গ্রামের উত্তর মাঠে বনে ঘেরা মজা পুকুরটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ— সেখানেই "সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত বসতিশূন্য অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব বেদনা, কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনামুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাস, কখনো বা এক ভাগ্যহত নিঃসঙ্গ অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার (অপুর) প্রবর্দ্ধমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত ও সার্থক হয়! ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!"

চোখের জলের মধ্য দিয়ে অপুর সাহিত্যদীক্ষা হয়েছিল, অবলম্বন 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। চোখের জলের মধ্য দিয়ে আমার সাহিত্যদীক্ষা হয়েছিল, অবলম্বন 'পথের পাঁচালী'।

অপু দেখেছিল ইছামতীর বুকে কালবৈশাখীর ঝড়। আমি দেখেছিলাম ভাগীরথীর বুকে কালবৈশাখীর নৃত্য। ঝড় দেখে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় পড়া বিলাতযাত্রীর ভ্রমণকাহিনীর দক্ষিণ সমুদ্র বর্ণনার কথা অপুর মনে পড়েছিল। ঝড়ের বর্ণনা মিলিয়ে নিয়েছিলাম। গঙ্গাতীরবর্তী মাঠে বসে পড়ন্ত আলোয় যখন 'পথের পাঁচালী' পড়েছি, তখন মাঝেমাঝে চোখ তুলে উদার গঙ্গাকে, তার স্রোতকে, ভেসে যাওয়া তরণীকে দেখেছি। নিরুদ্দেশের পথে অপুর মতই সেদিন আমার মন উধাও হয়েছে।

স্পষ্ট মনে পড়ে, 'পথের পাঁচালী' একটানা পড়ে শেষ করতে পারি নি। পড়া শুরু করেই মনে হয়েছিল এ বই দ্রুতপঠনের নয়। থেমে থেমে এর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। 'পথের পাঁচালী'তে এমন সব বর্ণনা আছে যা সেদিন মনের তারে ঘা দিয়েছিল, আনন্দ বেদনার বিচিত্র সুর বাজিয়ে তুলেছিল। আজ নতুন করে 'পথের পাঁচালী' পড়ে সেদিনের স্মৃতি আর আনন্দবেদনাকে নতুন করে ফিরে পাই।

নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম থেকে বেরিয়ে নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলে মাঠের বাইরে আষাঢু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তায় মিশেছে গ্রাম্য পথটি। সেই পথে অপু বেরিয়েছিল তার বাবার সঙ্গে। তিনি চলেছেন শিষ্যবাড়ি, অপু চলেছে এই প্রথম বাহিরবিশ্বে— তার ছোটবেলা স্বপ্ন রেল লাইন দেখবে। সেই আনন্দের কথা বিভূতিভূষণ অসাধারণ নৈপুণ্যে বর্ণনা করেছেন। মনে আছে বাবার সঙ্গে আমিও রেল লাইন পেরিয়ে সড়ক ধরে অনেকদিন বেড়িয়ে এসেছিলাম। এদিকে রেল-লাইন চলে গেছে ব্যান্ডেল, ওদিকে কাটোয়া। সামনে পুরনো সড়ক চলে গিয়েছে সাতগাঁর দিকে। দু পাশে সারিবাঁধা আমগাছ। সারা পথ ছায়াচ্ছন্ন। দু পাশে ধানের ক্ষেত। সবুজ শীষে চঞ্চল ক্ষেত। সাতগাঁ কতদূর—অনেক দূরে? এ কথা ভেবে সেদিন ফিরে এসেছিলাম।

এইখানে অপুর অনুভূতির সঙ্গে সেদিন আমার অনুভূতি মিলেছিল। অপু আট বছর বয়সে রেলগাড়ি দেখেই নি। সে দিক থেকে আমি সৌভাগ্যবান, রংপুরে রেলগাড়ি অনেক দেখেছি। জেলাবোর্ডের সড়ক ধরে কিছুটা এগোলেই রেললাইন, ডানদিকে ভাঙলে স্টেশন। রাতের গাড়িতে যখন রংপুর থেকে কলকাতা এসেছি, তখন মাঝমাতে স্বপ্নের মধ্যে শুনেছি, স্টেশনের নাম খালাসীর কণ্ঠে— পার্বতীপুর, সান্তাহার। হঠাৎ এক ঘুমের পর মা ঠেলে জাগিয়ে দিতেন, বলতেন, এই দেখ, আমরা এসে গেলাম, সারা ব্রিজ। আধ ঘুমে তাকিয়ে দেখেছি বিস্তীর্ণ নদীবক্ষ, গুম্‌গুম্‌ শব্দে রাতের গাড়ি ছুটে চলেছে।

আর অপু? সেদিন তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হবে বলে তার বাবা রেল-লাইন ছেড়ে অন্য পথে অপুকে নিয়ে গেলেন।

"অপুকে অবশেষে জলভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল। তুমি চলিয়া যাইতেছ... তুমি কিছুই জানো না পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে— নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে

পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইলাম, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে।"

অপুর প্রতি বিভূতিভূষণের এই সান্ত্বনাবাণীতে জীবনের গভীর সত্য নিহিত আছে। কতবার কত নতুন জায়গায় গিয়ে অপুর মতই অচেনাকে দেখা ও না-দেখার আনন্দ ও দুঃখ পেয়েছি। মনে হয়েছে, আমিই অপু। 'পথের পাঁচালী' আর আমি সমবয়সী, সে আমার অন্তরের সখা, তার সঙ্গে কোনোদিন আমার বিচ্ছেদ ঘটবে না।

গল্পগুচ্ছের নদী

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 'নদী' কবিতাটির মধ্য দিয়ে। মনে পড়ে, বাবার মুখে প্রথম 'নদী' কবিতা শুনেছিলাম। এই দীর্ঘ কবিতাটি আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ছোটবেলায় এর আবৃত্তিতে ছিল অফুরান উৎসাহ।

'নদী'র কথা স্পষ্ট মনে আছে; তার কারণ ছোটবেলায় নদী দেখা আমার কাছে উৎসব-বিশেষ ছিল। মনে পড়ে রংপুর থেকে গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার ছুটিতে আমরা যখন হুগলীতে আসতাম, তখন রাতের বেলায় নদীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হতো। রংপুর থেকে সন্ধেবেলায় ট্রেন ছাড়ত। সান্তাহার পেরিয়ে রাতে পার্বতীপুর জংশনে এসে ট্রেন বদল করতে হতো। তারপর মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমের মাঝে মা আমাকে জাগিয়ে দিতেন : 'ঐ দেখ পদ্মা।' মনে আছে ঘুম ভেঙে অন্ধকারে দু চোখ ভরে পদ্মার দিকে তাকিয়ে থাকতাম, দীর্ঘ সারা ব্রিজের উপর দিয়ে রাতের গাড়ি পাড়ি দিত, গুম-গুম-গুম শব্দে শর্বরীর নৈঃশব্দ্য টুটে যেত। তারপর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়তাম। উত্তরবঙ্গ থেকে সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করে রাতে পদ্মা পেরিয়ে সকাল বেলায় পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী-তীরে এসে পৌঁছতেম। নদী থেকে নদীতে আমার ছোটবেলার যাত্রা বাঁধা ছিল। মনে পড়ে, তখন ভাগীরথীর (হুগলী নদীর) কী রূপ দেখেছি! আজকের মতো তা শীর্ণ হয়নি, বুকে চড়া জেগে ওঠে নি।

ছুটিতে বাড়ি এসে আমার কাজ ছিল লেখাপড়া বন্ধ রেখে খেলাধুলায় নিজেকে সমর্পণ এবং অশেষ দৌরাত্ম্যে কালযাপন। এর জন্য তিরস্কার-শাসন-লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অন্ত ছিল না। কিন্তু আমার নিরাপদ আশ্রয় ছিলেন আমার ঠাকুরমা। তিনি ছিলেন অভিভাবকস্থানীয়দের শাসন থেকে রক্ষালাভের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

ঠাকুরমার সঙ্গে রংপুর-কলকাতা বাসকালে বছরে মাত্র দুবার দেখা হতো। সেকারণেই ঠাকুরমা প্রশ্রয় দিতেন। তাঁর নাম ছিল পান্নাময়ী দেবী। একদা তিনি রূপসী ছিলেন, বয়সের ভারে তাঁকে ঈষৎ ন্যুব্জ দেখেছি, কিন্তু তখনো কিছু রূপ তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর যে গুণ আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত, তা হল তাঁর গল্পকথন নৈপুণ্য। আশ্চর্য, সেই ক্ষমতা! আজ সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করি, ছোটবেলায় ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে যে ছেলে রূপকথা ও হরেকরকম গল্প শোনে নি, তার মানবজন্ম বৃথা। ঠাকুরমার মুখে গল্প শোনাকে আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য বলে মনে করি।

ঠাকুরমার মুখে গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় বাঁশবেড়ের বাড়ির ছাদে শুয়ে কত গল্পই না শুনেছি! আজো সেই পরিবেশ মানসপটে অমলিন হয়ে আছে। বাইরের বাগানে দেবদারু গাছে ও ভিতরের আঙিনায় কাঁঠাল গাছে সারাদিনের অসহ্য গরমের শেষে সুখদ শীতল হাওয়ায় মর্মর বেজে উঠেছে, ছাদে মাদুরে শুয়ে আমরা ক'ভাই বোন ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনছি।

রূপকথার গল্প, ভূতের গল্প, চোরের গল্প, বাঘের গল্প থেকে আমরা প্রোমোশন পেয়ে পঞ্চতন্ত্রের গল্পে পৌঁছলেম। তারপরই ঠাকুরমা আমাদের রবীন্দ্রনাথেব গল্পে পৌঁছে দিলেন।

'পোষ্টমাস্টার,' 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'স্বর্ণমৃগ', 'ছুটি', 'সুভা' এইসব অমর গল্প ঠাকুমা আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন। পরে তিনি কৌশল বদলালেন, আমাদের বলতেন, পড়। আমি পড়তাম, তিনি শুনতেন।

আজ ভেবে দেখি, সেদিন এইসব গল্প ভালো লেগেছিল কেন। হয়ত একটা কারণ, এইসব গল্পে রবীন্দ্রনাথ কিশোর কিশোরীকে নায়ক-নায়িকারূপে এঁকেছেন, আর তাদের উপর লেখকের পিতৃহৃদয়ের স্নেহ বর্ষিত হয়েছে। আর একটা কারণ,আমার মনে হয়, গল্পের এইসব কিশোর কিশোরীরা আমার মতোই নদীকে ভালবাসত।

'পোষ্টমাস্টার' গল্পের সমাপ্তিতে গ্রামের ছোটো নদী সকরুণ বিচ্ছেদের বাহন হয়ে দেখা দিয়েছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে প্রমত্তা পদ্মা ক্ষুধিতা হয়ে খোকাকে গ্রাস করেছে। 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে কাশীর গঙ্গা অর্থমৃগয়ার ট্রাজেডিকে ত্বরান্বিত করেছে। 'ছুটি' গল্পে প্রথমে গ্রামের ছোটো নদী, পরে বড়ো নদী একটি কিশোরের জীবনে মুক্তির আনন্দ ও বন্ধনের বেদনার দূতীরূপে দেখা দিয়েছে। 'সুভা' গল্পে চণ্ডীপুরের গ্রামলক্ষ্মী তন্বী তটিনী বোবা মেয়ের খেলার সাথী হয়ে দেখা দিয়েছে।

ঠাকুরমা গল্পগুচ্ছ পাঠের সূচনা করেদিলেন।সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত গল্পগুচ্ছ পড়ছি. কোনো দিন গল্পগুচ্ছের আবেদন পুরনো হয় না। তা চির-নূতন, শিশুর মতো সজীব, কিশোরের মতো চঞ্চল। সেদিনের পদ্মা-গঙ্গায় সমর্পিতপ্রাণ কিশোরচিত্তে গল্পগুচ্ছের আবেদন দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ নদীকে বাদ দিলে গল্পগুচ্ছে কাহিনী থাকে, জীবন থাকে না। নদীই তার জীবন। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় সাধন হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ কেবল গল্পের মধ্যে গল্প বলেন নি, সেই সঙ্গে তাঁর সুগভীর জীবনপ্রেমও প্রকাশ করেছেন। এবং গল্প বলতে বলতে জীবনভাবনায় চলে গেছেন, কিন্তু তা সুন্দর ভাবে

গল্পের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ কি জানতেন না, তাঁর এইসব গল্প আমাদের মতো বহু কিশোর পড়বে? তিনি জানতেন, তবু তাঁর প্রকৃতিপ্রেম ও জীবনানুরাগের উঁচুসুরে বাঁধা গল্পবীণায় সুর যোজনা করতে দ্বিধা করেননি। সেদিন এইসব গল্প পড়ে সম্পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি (আজো কি পেরেছি?), তবু কিছু না বোঝার জন্যই তা ভালো লেগেছে— সেখানেই কিশোরমন কল্পনার অবকাশ লাভ করেছে। ফটিক বা সুভার সঙ্গে কিছুটা আত্মীয়তা বোধ করছি, খোকাবাবুর ঝুঁকে পড়া মাছধরার চেষ্টায় আনন্দ পেয়েছি, আবার বৈদ্যনাথের হতাশায় ও রতনের বেদনায় দুঃখিত হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের কি আশ্চর্য কৌশলে এইসব গল্পে প্রকৃতিকে সজীব চরিত্ররূপে ব্যবহার করেছেন! সেদিন কৌশলটি বুঝি নি, কিন্তু তার প্রভাব অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে অনুভব করেছি।

"গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলা দেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে প্রফুল্ল হৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।"

'সুভা' গল্পের এই বর্ণনাংশ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটবেলায় পড়া 'নদী' কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। আর সেইসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কবিতা— ' আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।' গল্পে রবীন্দ্রনাথ এখানেই থেমে যান নি। পরমুহূর্তে তাঁর প্রকৃতিপ্রেমকে গল্পের মধ্যে এতো অনায়াস ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন যে গল্পপাঠক ঐ ভালোবাসার অংশীদার না হয়ে পারে না।

"বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই! তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়াল ঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কিনা জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়, নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর, সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা— বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে-ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার, ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক

বিজন মূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত — একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।"

প্রকৃতির সঙ্গে সুভার এই অন্তরঙ্গ আত্মীয়সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যে একে জীবন-বিযুক্ত অনুভূতি বলতে পারি না, মনে হয় সুগভীর উপলব্ধিজাত এই বিবরণ। শেষ অনুচ্ছেদে যে স্তব্ধ মধ্যাহ্নের নদী ও প্রকৃতির বর্ণনা আছে, তা সেদিন বাঁশবেড়েতে গঙ্গার ধারে আমি নিজেই উপলব্ধি করেছি। গঙ্গাকে মধ্যাহ্নে, উষায়, সন্ধ্যায়, নিশীথে কতবার কতরূপে দেখেছি। শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় গঙ্গার বিচিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করেছি। খেয়া নৌকায় পারাপার করে, সাঁতার কেটে চড়ায় তরমুজ সংগ্রহাভিযানে গিয়ে, ঘাটে বাঁধা জেলে-নৌকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থেকে, জেলেদের সঙ্গে রাতে মাছধরার সঙ্গী হয়ে গঙ্গাকে দেখেছি। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে গল্পগুচ্ছের অভিজ্ঞতা বারবার মিলে গিয়েছে। গল্পগুচ্ছের পথে, নদীতরঙ্গের ধারায় রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে এসেছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার আগেই গল্পগুচ্ছ পড়া সাঙ্গ করেছি। বারবার পড়ে গল্পগুচ্ছের জগতের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে উঠেছিল। এইসব গল্প পড়ে উল্লসিত হয়েছি, অশ্রুপাত করেছি, মনের মধ্যে অসহ্য বেদনা বহন করে ক্লেশ অনুভব করেছি। তবু ছাড়তে পারি নি। বারবার পড়েছি।

কোন্ গল্পগুলি আমার মনোহরণ করেছিল ?— এই প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করতে আজ কুণ্ঠা নেই যে, 'সমাপ্তি', 'অতিথি' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' আমাকে কিনে নিয়েছিল। সাহিত্যসম্ভোগের অন্যতম পন্থা, সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার সঙ্গে পাঠকের আত্মীয়তাবোধ। এই মানদণ্ডে বিচার করলে আজ এ তিনটি গল্পের কথাই বারবার মনে পড়ে। বস্তুতঃ পক্ষে সেদিন এইসব গল্পের নায়ক-নায়িকার স্থানে নিজেকেই স্থাপন করে সুখ অনুভব করেছিলেম। আমি জানি, আমার প্রবীণ পাঠকেরা অন্ততঃ মনে মনে এই সুখানুভূতি স্বীকার করবেন। আমার বিশ্বাস, তাঁরাও একদিন আমারই মতো নিজেকে তারাপদ, অপূর্ব ও বরীচের মাশুল-কলেক্টর রূপে গল্পের জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই সব গল্প কেন এতো ভালো লেগেছিল, তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আজ দিতে পারব না। কারণ, ভালোবাসা চিরকালই যুক্তিহীন। আর যাই হোক, যুক্তি দিয়ে বিচার করে হিসেব কষে প্রেমে পড়া যায় না। যে পারে বলে, সে অনৃতবাদী। তাই রবীন্দ্র-গল্পের প্রতি আমার এই তীব্র আকর্ষণের একমাত্র ব্যাখ্যা, পাঠক-হৃদয়ের ভালোবাসা। আমার হৃদয়ে এই গল্পগুলি নবজন্ম লাভ করে আমারই হয়ে উঠেছে, তা লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে নি, আমার একান্ত হৃদয়গত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

'সমাপ্তি' গল্পের সূচনায় বর্ষণক্ষান্ত প্রভাতে রৌদ্র ছায়ার কোলাকুলি, শেষে চুম্বনে অশ্রুতে মাখামাখি। সারা গল্পটি প্রকৃতির ফ্রেমে বাঁধা। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, সকালের কাঁচা সোনার রোদ, — এরই মাঝে অপূর্বকুমারের জীবনে মৃন্ময়ীর আবির্ভাব। হাসিতে গল্পের সূচনা, অশ্রুতে গল্পের শেষ। মনে হয়, সমস্তটা যেন গানের সুরে বাঁধা।

এই গল্পে মৃন্ময়ীর প্রতি অপূর্বর আকর্ষণ, মৃন্ময়ীর প্রত্যাখ্যান ও শেষে প্রেমের দিগ্বিজয়ী আর্বির্ভাব সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। তা এতোই মধুর, এতোই কোমল, এতোই নিখুঁত যে বিশ্লেষণের দ্বারা সেই অখণ্ড প্রেমস্বর্গকে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে না। মুগ্ধ মন নিয়ে এই গল্প পড়েছি। আমার বিশ্বাস, সকল পাঠকই তাই করেছেন।

'সমাপ্তি' গল্পের যে পরিচ্ছেদটি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, তা পঞ্চম পরিচ্ছেদ। বস্তুতঃ স্নেহ-বাৎসল্য ও দাম্পত্যজীবনের প্রথম আনন্দের এমন করুণ-মধুর বর্ণনা আমি ত আর দেখি না।

মায়ের অনুমতি না নিয়েই অপূর্ব নবপরিণীতাকে বধূকে নিয়ে তার তার শ্বশুরমশায় স্টীমার কোম্পানীর দরিদ্র কেরানী ঈশান বাবুর কর্মস্থল কুশীগঞ্জের স্টীমার-স্টেশন অভিমুখে নদীপথে যাত্রা করল। এই যাত্রাপথের বর্ণনা, পিতাপুত্রীর মিলন, অপূর্ব-মৃন্ময়ীর আগমনে ঈশানবাবুর আনন্দ ও বিদায়ে দ্বিগুণ নিরানন্দের আশ্চর্য বর্ণনা আমাকে বারবার অভিভূত করেছে। কুশীগঞ্জের স্টীমার-স্টেশনে তিন দিনের জন্য যে স্নেহ-স্বর্গলোক রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন, তার তুলনা আমার চোখে পড়ে নি। আশ্চর্য সেই বর্ণনা :

"পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নব দম্পতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, 'বাবা।' সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজ-মহিষী, এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।"

তিনটি দিন স্বপ্নের মতো কেটে গেল। তারপর বিদায়।

"মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।"

'অতিথি' গল্পে তারাপদ সকল বাঙালি কিশোরের প্রতিনিধি। তার মধ্যে সকল ছেলের আনন্দ ও মুক্তি গান গেয়ে উঠেছে। লেখক তাকে বলেছেন, রাজহংসের মতো,মুক্ত বিহঙ্গমের মতো। 'সমাপ্তি' গল্পের মতো 'অতিথি' গল্পও প্রকৃতির ফ্রেমে বাঁধা। এই গল্পেও নদী হয়ে উঠেছে একটি সজীব চরিত্র। নদীর বর্ণনায় গল্পের আরম্ভ ও শেষ।

তারাপদ সংসারে অতিথি। কিছুদিনের জন্য সে আসে, সকলের স্নেহ কেড়ে নেয়, তারপর হঠাৎ একদিন তার অন্তর্ধান ঘটে। সে যেন গতিরাগের গান, মুক্ত হরিণ, ছোটার আনন্দে সে ছুটে চলে।

তারাপদর বর্ণনা আর নদীর বর্ণনা পর্যায়ক্রমে গল্পে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার ছোটোবেলায় শোনা 'নদী'-র কথা আবার এখানে মনে পড়ে :

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
নদীতে কেন ওঠে এত ঢেউ?

তারাপদর মুখের শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশিত হতো। তা দেখে কেবল কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নন, পাঠকমাত্রেই মুগ্ধ হয়। লেখক তারাপদকে বলেছেন গত জন্মের তাপসবালক এ-জন্মে সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রীযুক্ত বালক। লেখক আরো বলছেন সে যেন তরুণ জলদেবতা। এই তরুণ জলদেবতা সংসারে দুদিনের জন্যে আসে, স্নেহডোরে সকলকে বাঁধে, তারপর সবাইকে কাঁদিয়ে চলে যায়।

তারাপদ যে নববর্ষার মেঘ দেখে মতিলালবাবুর স্নেহস্বর্গ পরিত্যাগ করে গেছে, সেই মেঘ সেদিন গঙ্গাতীরে কালবৈশাখীতে প্রত্যক্ষ করেছিলেম। নদীপথে কতো অজানা নৌকা, অচেনা বজরা, বিদেশী রাহী চলে যায়। এই দৃশ্য আমার কাছে সেদিন এত পরিচিত ছিল যে 'অতিথি' গল্প আমার কাছে বাস্তব অপেক্ষা সত্য মনে হয়েছিল। মনে আছে শ্রাবণের ভরা গঙ্গা খেয়া নৌকায় পেরিয়ে আমরা ত্রিবেণী থেকে ওপারে ঘোষপাড়ার মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন অভিভাবকদের নিষেধ অমান্য করে ও প্রহার নিশ্চিত জেনেই আমরা মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। তারাপদ যে কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের মেলা দেখার জন্য স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে পালাবে, তা আমার কাছে সেদিন খুবই সঙ্গত বলে মনে হয়েছিল।

এই জন্যেই তারাপদকে আমার মনোমত বন্ধু বলে মনে করেছিলেন। তারাপদর পলায়নের সন্ধ্যায় নববর্ষার মেঘ-সমারোহের এই বর্ণনা সেদিন প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেম বলেই এই ছবি আমাকে আজো অভিভূত করে।

"জ্যোৎস্নাসন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে : কলিকাতার কন্‌সর্টের দল বিপুল শব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে, যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, পশ্চিম দেশীয় নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সঙ্গীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে — উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল— পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল — নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা -- চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে, মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিতেছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে, দেখিতে দেখিতে

গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল।''

এই বর্ণনায় ভাষার দামামা বেজে উঠেছে, মেঘের মাদল-শব্দে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছে। সেই আকাশ-জোড়া ধ্বনির তালে পৃথিবীর রথযাত্রা। রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য ইমেজ তারাপদর আসক্তিবিহীন উদাসীন অতিথি অভিধাকে সার্থক করে তুলেছে। মনে আছে ঘোষপাড়ার মেলায় গিয়ে সার্কাসে জিমনাস্টিক খেলা দেখতে গিয়ে বারাবার ভেবেছি, হয়ত এখানেই কোথাও বসে তারাপদ এই খেলার সঙ্গে দ্রুত তালে লখনউ ঠুংরির সুরে বাঁশি বাজাচ্ছে।

আমার সঙ্গী জগা বলেছে— 'চলে আয়, এতক্ষণ ধরে কি দেখছিস্!' মনে মনে উত্তর দিয়েছি— ' আমি তারাপদকে খুঁজছি।'

এবার শেষ গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর স্মৃতি। পাঠক, লক্ষ্য করবেন, আমার সবকটি প্রিয় গল্পেই নদী রয়েছে। বোধ করি, নদী আর রবীন্দ্র-গল্পধারা আমার কিশোরচেতনায় এক হয়ে গিয়েছিল। ভালোবাসার জাদুস্পর্শে এই ঐক্যচেতনা সেদিন আমার মনে সত্য হয়ে উঠেছিল। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পরিত্যক্ত রহস্যময় প্রাসাদ আমাকে জাদু করেছিল, কিন্তু আমাকে টানত প্রাসাদের পাদমূলে প্রবাহিতা শুস্তা নদী। লেখক বলেছেন, তা সংস্কৃত 'স্বচ্ছতোয়া'র অপভ্রংশ। হয়ত তা ঠিক। সেদিন আমার চেতনার মধ্যে শুস্তা-নামটি অংকৃত হতো। হুগলী জেলায় ভাগীরথী নদী দেখে শুস্তাকে কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেলপথে ত্রিবেণী থেকে কয়েক মাইল দূরে প্রবাহিতা শীর্ণা কুন্তী নদীকে দেখে শুস্তা নদীকে কল্পনা করতে চেয়েছি।

বরীচের মাশুল-কালেক্টারের জীবনে অলৌকিকের আবির্ভাব ঘটেছে এই শুস্তা নদীর জলে। উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বেঁকে দ্রুত নৃত্যে শুস্তা ধাবমানা,— এই বর্ণনাতেই শুস্তা গল্পের অন্যতমা রহস্যময়ী নারীচরিত্র হয়ে উঠেছে। এই শুস্তার জলেই সেই অদৃশ্য নর্তকীদের জলকেলি ও কলহাস্যে লৌকিক জগতে অলৌকিকের আবির্ভাব হয়েছে।

সেদিন অলৌকিকের আবির্ভাব ঠিক মতো উপলব্ধি করি নি, আজো করি না। তবু সেদিনের কিশোরচিত্তে তার প্রশ্রয় ছিল অবারিত। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর রোমান্সের আয়োজনকে সেদিন বিশ্বাস করতে বাধা ছিল না। তাই কুন্তী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে শুস্তা নদীর কথা ভেবেছি। মনে মনে ভেবেছি, হয়ত এখনি সেই তাতার-সুন্দরীদের কলহাস্যে নির্জন নদীতীর মুখরিত হয়ে উঠবে। হায়! সে তো কল্পনা! তবু বলি. হোক সে মিছে কল্পনা, তবু সে মধুর।

বরীচের মাশুল কালেক্টরের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা সেদিন আমার কিশোর-চিত্তকে আলোড়িত করেছিল। আজো তার মধুর স্মৃতি আমার চিত্তে জড়িত বিজড়িত। কতবার যে এই বিবরণ পড়েছিলেম, তার ইয়ত্তা নেই। রোমান্সের স্বাদ পেয়েছিলেম এখানে।

''তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সূর্যাস্তের

কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরামকেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্ণের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল, তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়াযবনিকা পড়িয়া গেল— এখানে পর্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্যাস্তের সময় আলো আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল, যেন অনেক মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোনো মূর্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়ে স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, এবং সন্তরণকারীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তাবৃষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।"

এই অনবদ্য বিভ্রান্তি 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মায়াময় পরিবেশটি গড়ে তুলেছে। সেদিন শীর্ণা কুন্তী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে শুস্তা-তটবর্তী মাশুল-কালেক্টরের অনুভূতি আপন মনে সৃজন করেছি। উত্তরবঙ্গের তিস্তা ও পদ্মা, পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী, সরস্বতী, কুন্তী নদীর সঙ্গে আমার ছোটবেলায় পরিচয়। সে-পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিহারের সিংভূম জেলার অন্তর্গত চাইবাসার প্রান্তশায়িনী রোরো নদী। এক পুজোর ছুটিতে রোরো নদীকে দেখে এসেছি। শুস্তা নদীর অনুভূতি রোরো নদীকে দেখার পর পূর্ণতা লাভ করল। রাঁচী চাইবাসা জামসেদপুর পথে চাইবাসা-প্রান্তে রোরো নদীকে পেয়েছিলাম। রোরোকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদ্বৎ মনে পড়ে গেল 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে শুস্তা নদীর বর্ণনা :

" নির্জন পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে।"

আমার শৈশব-কৈশোরের সহজ স্মৃতি রোরো নদীর দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধতর হলো। এই বর্ণনার সঙ্গে রোরো নদীর কোনো পার্থক্য নেই। মনে আছে চাইবাসা থেকে লুপুংগুটু যাবার পথে গাড়ি থেকে নেমে রোরো নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিলেম। সেই মুহূর্তে কৈশোরের কুন্তীতীরের অনুভূতি মনে পড়ে গেল। মনে হলো, রোরো নদীর স্থির অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহু বিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে! একই মুহূর্তে সন্তরণকারিণীদের কলহাস্য, তরঙ্গভঙ্গ ও বনমর্মর শুনতে পেলাম।

আমার সঙ্গী হাত ধরে টানলেন— ‘ চলে এসো, কী দেখছ?’

মনে মনে বলি, ‘নদীর পটভূমিতে রবীন্দ্র-গল্প-সম্ভোগের স্মৃতিকে নতুন করে ফিরে পাচ্ছি।’

নদীর পটভূমিতে কেবল রবীন্দ্রনাথের জগৎ নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসলোকও আমার কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিম-উপন্যাস পড়েছি রবীন্দ্র-গল্প পড়ার আগেই। বঙ্কিম-উপন্যাসে যে নদী বারবার দেখা দিয়েছে, তার নাম ভাগীরথী— যার তীরে আমার কৈশোরজীবনের একটা অংশ কেটেছে। আর রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে নদী বারবার দেখা দিয়েছে, তার নাম পদ্মা— যাকে শৈশবে রংপুর কলকাতা ট্রেনযাত্রায় মাঝরাতে ঘুমঘোরে সারা ব্রিজের উপর থেকে দেখেছি। ভাগীরথীর সঙ্গে আমার যেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়, আর কোনো নদীর সঙ্গে নয়। কলকাতা ও হুগলী, দু জায়গাতেই ভাগীরথীকে পেয়েছি।

‘কপালকুণ্ডলা’র শেষাংশে শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলা সপ্তগ্রামের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দূরবর্তী ভাগীরথীর দৃশ্য উপভোগ করেছে, ‘মৃণালিনী’র হেমচন্দ্র বাতায়নপথে ভাগীরথী দেখে মুগ্ধ হয়েছে, ‘চন্দ্রশেখরে’ ভাগীরথীর অগাধ জলে প্রতাপ শৈবলিনী সাঁতার দিয়েছে, আর ‘ইন্দিরা’তে ইন্দিরা গঙ্গা দেখে মুগ্ধ উক্তি করেছে : “গঙ্গা দেখিয়া আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। আমার এত দুঃখ, মুহূর্ত-জন্য সব ভুলিলাম। গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়। তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ— ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর রৌদ্রের চিকি-মিকি — যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর জল জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে। ... গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্ত নয়নে কয়দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।”

এই গঙ্গাকে ইন্দিরার মতোই আমি প্রাণ ভরে দেখেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, দুজনেই নদীর চোখে মানবজীবনকে দেখেছেন, এ বিশ্বাস আমার বদ্ধমূল।

রবীন্দ্রনাথ কি গঙ্গার বর্ণনা করেন নি? করেছেন। সেই অতুলনীয় কোমল-মধুর গঙ্গা বর্ণনা কে বিস্মৃত হবে? শান্তিপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীরের যে অপূর্ব বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ রেখে গিয়েছেন, তার তুলনা কোথায়?

গল্পগুচ্ছের সংসার-উদাসী মুক্তপ্রাণ কিশোররা নদীকে আশ্রয় করে অজানা পথে পাড়ি দিয়েছে। মনে আছে, ভাগীরথী-তীরে বসে এইসব কিশোরদের এ-কারণেই খুব আপন মনে হতো। গল্পগুচ্ছের এই নদীপ্রীতি সে-সময়ে পড়া কবির ‘শিশু’ কাব্যেও পেয়েছিলেম। ‘শিশু’

কাব্যের ছেলেটির সঙ্গে গল্পগুচ্ছের তারাপদ-ফটিক-মৃন্ময়ীর চরিত্রগত পার্থক্য নেই। 'শিশু' কাব্যের কবিতাগুলিতে নদীর যে ছবি, তা সেদিন আমাকে কল্পনা করে নিয়ে হয় নি, কারণ তা প্রত্যক্ষ ও সত্য ছবি ছিল। মনে পড়ে, ঐ সব কবিতায় শিশুর মতো মনে মনে বলতেম—

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ঐ পারে—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকা
বাঁধা সারে সারে।

মনে মনে আরো বলতাম—

মধু মাঝির ঐ যে নৌকাখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে,
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো,
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা—
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে।
আমি কেবল যাই একটিবার
সাত সমুদ্র তেরোনদী পার।।

রাজসিংহ

যে-বয়সটাতে মনে রোমাঞ্চ গভীর দাগ কেটে যায়, সে-বয়সে বিচক্ষণ সাহিত্যবিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকে না, সাহিত্যসম্ভোগের তীব্র নেশাই প্রবল। প্রবীণ জহুরী পাঠকমন এই কথা ভেবেই অল্পবয়সী পাঠকমনের দিকে তাকিয়ে অনুকম্পার হাসি হাসে এবং ভাবে সে জিতেছে। কারণ সে আর রোমান্সরসের তীব্রতায় উত্তেজিত হয় না, সুখ-দুঃখে তেমন করে আন্দোলিত হয় না, সেএখন পরিপক্ক প্রবীণ বিচক্ষণ। অনেক সময় ভাবি তাতে পাঠক হিসাবে আমার ক্ষতি হয়েছে, না ,লাভ হয়েছে। এখন আর উপন্যাস বা কাব্য পড়ে চট করে চোখের পাতা ভিজে ওঠে না, মন ভারি হয়ে থাকে না, দিনরাত্রির মূল্য সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু সাহিত্যসম্ভোগের এই তীব্রতা থেকে বঞ্চিত হয়ে কি-বা লাভ হয়েছে?

যে-বয়সে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপম উপন্যাস 'রাজসিংহ' পড়ি, সে-বয়সে ঐ গ্রন্থপাঠে যে আনন্দ পেয়েছিলাম,আজ সে গ্রন্থ পড়িয়ে ও বিশ্লেষণ করে কি সে আনন্দ পাই? এই প্রশ্নের উত্তরে পরিণত সাহিত্যবুদ্ধির সপক্ষে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু সেই প্রথম পাঠের অনুরাগ, আনন্দ, উত্তেজনা নতুন করে ফিরে আসে না, একথাও সত্য। 'রাজসিংহ' উপন্যাস সেদিন কিশোরচিত্তে যে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল, আজ স্মৃতিসরণি বেয়ে অতিক্রান্ত জীবনে ফিরে গিয়ে দেখি, সে দাগ এখনো মুছে যায় নি। রাজসিংহ উপন্যাস আমার বঙ্কিম-পাঠের প্রথম যুগের প্রণয়লিপি। এই উপন্যাস পড়তে গিয়ে আবার সেই স্কুল-জীবনের কথা মনে পড়ে যখন বঙ্কিম-উপন্যাস প্রথম পড়ি। বাড়িতে ছিল দু'খণ্ডে বাঁধানো বসুমতী সংস্করণ বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ উপন্যাস, দ্বিতীয় ভাগ বিবিধ। পঁচিশ বছর আগে ঐ দুটি খণ্ডই অনেকবার পড়েছিলাম। স্বভাবতই উপন্যাস-খণ্ডের প্রতি অনুরাগ ছিল প্রবল। আর 'রাজসিংহে'র প্রতিই ছিল তা প্রবলতম। বঙ্কিমের এত উপন্যাস থাকতে রাজসিংহের প্রতি কেন এই আকর্ষণ একথা বোঝার বয়স তখন হয় নি, আর আজকে সেদিনের মুগ্ধতা হারিয়ে ফেলেছি। কাজেই আজ আর সে-বিচার সম্ভব নয়। কেবল সেদিনের অনুরাগ পুনঃ স্মরণ করা যেতে পারে।

রাজসিংহ-পাঠের সঙ্গে একজনের ছবি আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি আমার কে? কেউ না, কিন্তু তিনি আমার আত্মার আত্মীয়। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই কেশববাবু। হুগলী জেলায় গঙ্গাতীরবর্তী জনপদের হাইস্কুলে ইংরেজি ও বাংলার শিক্ষকরূপে তিনি যেদিন প্রথম এলেন, তখন আমরা নবম শ্রেণীর ছাত্র। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাদের মনোহরণ করলেন। তাঁর রূপ, তাঁর প্রসন্ন হাসি, তাঁর কথা বলার ঢঙ, তাঁর পাঠ — সবটা আমাদের মোহমুগ্ধ করেছিল। জানি, এখানে প্রবীণ পাঠক হেসে বলবেন, ছোটবেলার ভালো-লাগা মানসিক দুর্বলতা মাত্র। ঐ সময়টাতে বীর-পূজার পাত্র সন্ধানে কিশোর-মন ব্যাকুল হয় এবং যাঁকে সামনে পায় তাঁকেই বীরপদে বরণ করে, হৃদয়ে বসিয়ে অর্চনা করে। প্রবীণের ঠাট্টা সত্ত্বেও স্বীকার করব, হ্যাঁ, সেদিন আমরা তাঁকে ভালোবেসেছিলাম , পূজো করেছিলাম। আমার ত মনে হয়, বয়ঃসন্ধিকালে বাড়ির বাইরেকার জগতের সঙ্গে পরিচয়সাধনের প্রথম ধাপ অনাত্মীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আত্মীয়ের প্রতি ভক্তি স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধা আমরা হাতে হাতেই পাই, তা অর্জন করতে হয় না, তা আমাদের কাছে জলবায়ু আলোর মতো স্বতঃসিদ্ধ রূপে আসে। কিন্তু অনাত্মীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, ভালোবাসা আমাদের গড়ে তুলতে হয়। আত্মীয় ছাড়া যখন অন্য পাত্রে আমরা ভালোবাসা অর্পণ করি, তখন সেখানে আমরা পরিণতি লাভ করি। এই পরিণতি যে লাভ করে নি, সে ব্যর্থ। যে বালকটির বাড়ির বাইরে বন্ধু নেই, আর স্কুল-জীবনে যে ছাত্র কাউকে শ্রদ্ধার পাত্ররূপে পেল না, তার চেয়ে বঞ্চিত আর কে আছে?

আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের মাস্টারমশায়কে এই বিশুদ্ধ অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পাত্ররূপে পেয়েছিলাম। তিনি আমাদের স্কুলে পড়াতেন, স্কুলের বাইরেও পড়াতেন। থাকতেন মেসে একখানা ঘর নিয়ে। সেই ঘরেই ছিল আমাদের জটলা। স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে অন্য বই

পড়তাম। সেই ঘরে বসেই দেশসেবার ব্রতে আমাদের প্রথম দীক্ষা হয়েছিল। 'শহীদ ক্ষুদিরাম,' 'বুড়িবালামের তীরে,' ফাঁসির সত্যেন,' 'ঊনপঞ্চাশী', 'নির্বাসিতের আত্মকথা', 'সিনফিন' প্রভৃতি বই আমরা সে-ঘরে বসেই প্রথম পড়েছি। আর পড়েছি কাব্য উপন্যাস। তখন ঝোঁকটা ছিল দেশপ্রেমের, স্পষ্ট করে বলা যায় রোমান্টিক দেশপ্রেমের। সেই সূত্রেই পড়েছি গোর্কির 'মাদার', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার-পতন'। আবার তার থেকে চলে গিয়েছি সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। এবং পড়েছি 'রাজসিংহ'।

আগেই বলেছি, বাড়িতে ছিল বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী। ঐ আড্ডায় না গেলেও আমার বঙ্কিম-চর্চা আটকাত না। কিন্তু মাস্টারমশায়ের মুখে সমগ্র 'রাজসিংহ' শুনেছি। Group reading -এর প্রথম ধারণা হয় তাঁর কাছেই। নানা বই তিনি পড়েছেন, আলোচনা করেছেন। তিনি ছিলেন শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী এবং সুকণ্ঠ গায়ক ও কবি। তাঁর শেষোক্ত পরিচয়টি জানতে আমাদের বেশী সময় লাগে নি। মাস্টারমশায় ছিলেন কুমিল্লা-ত্রিপুরার লোক। তাঁর প্রিয় গায়ক শচীন দেববর্মণের কতো গান তাঁর কণ্ঠে শুনেছি। দেশপ্রেমের কতো গান তাঁর কাছে শিখেছি। কতো প্রভাতফেরীতে তাঁর কাছে শেখা গান আমরা গেয়েছি। মাস্টারমশায়ের কাছে কোরাসে দেশপ্রেমের গান গেয়ে আমাদের লজ্জা ভেঙেছে, আমরা সংকীর্ণ ব্যক্তিত্বের গুহা থেকে বেরিয়ে গোষ্ঠীজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের উদার ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছি।

তিনি আমাদের 'রাজসিংহ' পড়ে শুনিয়েছিলেন। বাড়িতে 'রাজসিংহ' পড়েছি, সে এক অভিজ্ঞতা। তাঁর ঘরে বসে আমরা পাঁচ-সাত জনে পড়া শুনেছি, সে আর-এক অভিজ্ঞতা।

মানবজীবনের যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কথা বঙ্কিমের উপন্যাসে বার বার তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠেছে, তার প্রথম পরিচয় মাস্টারমশায়ের কণ্ঠে বাঙ্ময় রূপ ধারণ করেছিল। তিনি পড়তেন খুব চমৎকার। তাঁর কণ্ঠে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর আকৃতি প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করত। পুরুষের সচেতন আত্মানুভূতি, নারীর প্রবল হৃদয়াবেগ, মানবজীবনে প্রবৃত্তি-লীলার দুর্ভেদ্য রহস্য ও নিয়তির অমোঘ বজ্রশাসন বঙ্কিম-উপন্যাসে যে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে বিধৃত, তার আংশিক উপলব্ধি সেদিন আমাদের হয়েছিল ঐ পাঠের ফলে। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাঠ ও বাচিক অভিনয়ের ফলে যে-কোনো সাহিত্যবস্তুর অর্ধেক উপলব্ধি সম্ভব। এই বিশ্বাস আমার দৃঢ়তর হয়েছে মাস্টারমশায়ের মুখে রাজসিংহ-পাঠ শুনে। বঙ্কিম-উপন্যাসে মানবজীবনের যে ট্রাজেডি লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা সম্পূর্ণ উপলব্ধির বয়স তখন হয় নি, কিন্তু তার অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে সেদিন গেঁথে গিয়েছিল, একথাও স্বীকার্য।

আজ নতুন করে সেদিনের সুখস্মৃতি স্মরণ করি। একখানি ছোটো ঘর। মেঝেতে মাদুর পাতা, চারদিকে ছড়ানো বই পত্র পত্রিকা। দক্ষিণ কোণে পূর্বাস্য হয়ে মাস্টারমশায় বসেছেন, তাঁকে ঘিরে আমরা ক'জন ভক্ত ছাত্র। এক কোণে ধূপকাঠি জ্বলছে। সুরেলা কণ্ঠে মাস্টারমশায় পড়ছেন। 'আনন্দমঠে'র নির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্রের এক নতুন রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম যখন মাস্টারমশায় আমাদের 'রাজসিংহ' পড়ে শোনালেন।

'রাজসিংহ' সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদারের একটি উক্তি ঐ পাঠ শোনার অনেক দিন পরে পড়ি :

"দুর্গেশনন্দিনী যেমন তাঁহার কবিজীবনের প্রথম রোমান্স, রাজসিংহও তেমনি তাঁহার জীবন-শেষের শেষ রোমান্স— কবিহৃদয়ের Swan-song। ইহাতে সর্বজিজ্ঞাসা, সর্ব-জীবন-সমস্যার সর্বভাবনামুক্ত হইয়া, কবি-বঙ্কিম তাঁহার কল্পনার উপাধানে ক্লান্ত ললাট ন্যস্ত করিয়া আপন কবি-জীবনের একটি বিষামৃত-মধুর রমণীয় স্বপ্ন দেখিয়াছেন— সেই মবারক-জেবউন্নিসার প্রেম-কাহিনী।'

সেদিন ঠিক এভাবে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে সম্পর্কে ভাবি নি। সেদিনের পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আজকের এই সমালোচনাকে মিলিয়ে দেখছি, মনে হচ্ছে সেদিনের রোমান্সপ্রিয় মুগ্ধ পাঠক সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দে পথ হারায় নি।

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, মাস্টারমশায় যখন পড়তেন, তখন কী আগ্রহের সঙ্গে আমরা শুনতাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর গুণে সপ্তদশ শতকের মুঘল ও রাজপুত জগতের রোমান্সের সিংহদ্বার সেদিন আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে খুলে গিয়েছিল। আমরা মনে মনে রাজস্থানের পার্বত্য রন্ধ্রপথে, দিল্লীর আলোকিত চাঁদনী-চৌকে, জেবুন্নিসার রঙমহলে ঘুরে বেড়িয়েছি।

মাস্টারমশাই কৌতুকতরল কণ্ঠে রূপনগরের অন্তঃপুরের বর্ণনা পড়তেন :

"সম্প্রতি তাঁহার (বিক্রমসিংহের) অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য, ক্ষুদ্র রাজধানী, ক্ষুদ্র পুরী। তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত। গালিচার অনুকরণে শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তর রঞ্জিত হর্ম্যতল; শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত নানাবর্ণের রত্নরাজিতে রঞ্জিত কক্ষপ্রাচীর; তখন তাজমহল ও ময়ূরতক্তের অনুকরণই প্রসিদ্ধ, সেই অনুকরণে ঘরের দেওয়ালে সাদা পাথরের অসম্ভব পক্ষীসকল, অসম্ভব রকমে, অসম্ভব লতার উপর বসিয়া,অসম্ভব জাতীয় ফল ভোজন করিতেছে। বড় পুরু গালিচাপাতা, তাহার উপর একপাল স্ত্রীলোক, দশজন কি পনরজন। নানারঙের বস্ত্রের বাহার; নানাবিধ রত্নের অলঙ্কারের বাহার; নানাবিধ উজ্জ্বল কোমল বর্ণের কমনীয় দেহরাজি,— কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্বাদলশ্যামা;— খনিজ রত্নরাশিকে উপহসিত করিতেছে।"

'অসম্ভব', 'নানা', 'বাহার' শব্দের নিপুণ ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্র একটি রোমান্সজগৎ গড়ে তুলেছেন। এই বর্ণনা শুনে সেদিন আমাদের চিত্তে কৌতুকের ঢেউ লেগেছেলি। এই কৌতুকের রসে 'রাজসিংহ' উপন্যাসরে সূচনা,সমাপ্তিতে জেবুন্নিসার বিলাপধ্বনিতে উদয়পুরের আকাশ মুখরিত।

সাধু বাংলা গদ্যের চরম ঐশ্বর্য আমরা সেদিন 'রাজসিংহে' পেয়েছি। মাস্টারমশায় উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনায় যখন দিল্লীর বর্ণনা পড়লেন তখনি আমরা এবিষয়ে সচেতন হই। এই বর্ণনাপাঠে পাঠকের কণ্ঠস্বরে পূর্বের কৌতুকতারল্য আছে, সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংহত গাম্ভীর্য :

"জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত সৈকত-পুলিন-মধ্যবাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকূলে নগরীগণপ্রধানা মহানগরী দিল্লী, প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে— সহস্র সহস্র মর্মরাদি

প্রস্তরনির্মিত মিনার গম্বুজ বুরুজ, উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অতিদূরে কুতবমিনারের বৃহৎচূড়া,ধূমময় উচ্চস্তম্ভবৎ দেখা যাইতে ছিল। নিকটে জুম্মা মসজিদের চারি মিনার নীলাকাশে ভেদ করিয়া চন্দ্রালোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা; বিপণিতে শত শত দীপমালা, পুষ্পবিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিকজন-পরিহিত পুষ্পরাজির গন্ধ, আতরের গোলাপের সুগন্ধ, গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরীগণের কখন উচ্চ, কখন মধুর হাসি, অলঙ্কারশিঞ্জিত , — এই সমস্ত একত্রিত হইয়া, নরকে নন্দন কাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে। ফুলের ছড়াছড়ি — নর্তকীর নূপুরনিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তসুরের আরোহণ অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা,কমনীয় কামিনী করতলকলিত তালের চট-চটা, মদ্যের প্রবাহ, বিলোল কটাক্ষবহ্নি প্রবাহ; খিচুড়ী পোলাওয়ের রাশি রাশি; বিকট, কপট, মধুর, চতুর চতুর্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদধ্বনি, দোলার বাহকের বীভৎস ধ্বনি; হস্তীর গলঘণ্টার ধ্বনি, এক্কার ঝন্‌ঝনি— শকটের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি।"

আশ্চর্য এই বর্ণনা! সাব্লাইম থেকে রিডিক্যুল্, গভীর গম্ভীর থেকে তরল হাস্যতরল, সবেরই সমাবেশ হয়েছে। যে দিল্লী নগরী প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলছে, সেই নগরীতেই গন্ধ ধ্বনি চিত্র মিলে নরকে নন্দনকাননের ছায়ার মতো অদ্ভুত মোহ সৃষ্টি করছে, —বঙ্কিমচন্দ্রের এই ইঙ্গিত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিন মাস্টারমশাই এ বিষয়ে আমাদের সচেতন করেছিলেন।

এহ বাহ্য। নরকে নন্দন দিল্লী নগরী থেকে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের নিয়ে গেছেন রাজস্থানে উদয়সাগরতীরে। দিল্লি চাঁদনী চৌকে জীবনের উৎসব; আলোকিত রাজপথে নর্তকীর নৃত্যগীত, বাজিকরের বাজি ও অশ্বারোহীর দৃপ্ত গতিতে জীবনের উল্লাস উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। ওখানে নির্মল অন্ধকার পর্বতচূড়া, শান্ত উদয়সাগর,আর তারই নীচে মৃত্যুর মুখোমুখি দুটি হৃদয়। কী আশ্চর্য বৈপরীত্য!

সম্রাটদুহিতা বিলাসিনী পাপনিমগ্না জেবুন্নিসার আশ্চর্য পরিণতি সাধনই এই উপন্যাসের অন্বিষ্ট, বাকি সবকিছুই বাহিরের সজ্জা! "ঐ যুদ্ধ, ঐ রণশিবির ও সেনা-সমারোহ— সন্ধিবিগ্রহের যত কিছু কূটনীতি, এবং রূপনগরওয়ালী ও আরংজীব ও রাজসিংহের ঐ আজব-কাহিনী— একটি লিরিক কবিতার এপিক ভূমিকার মত, বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রাণ আর এক কাহিনীর স্বপ্নরসে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই চিরন্তন মানব-মানবীর— সেই যুগল প্রেমের অসহ্য জ্বালা ও অসহ্য সুখের কাহিনী; এ স্বপ্ন সেই প্রেমের — যে-প্রেমে রাজনন্দিনী ভিখারিনী হয়, এবং অতি সামান্য অতি সাধারণ জীবনযাত্রী পুরুষ প্রেমের রাজতিলক ললাটে পরিয়া মহামহীয়ান হইয়া উঠে।" (মোহিতলাল মজুমদার)

'রাজসিংহ' উপন্যাস অসহ্য জ্বালা ও অসহ্য সুখের কাহিনী। সেদিন মাস্টারমশায় আমাদের এই চিরন্তন প্রেমের কাহিনী পড়ে শুনিয়েছিলেন। আজ ভাবি, সেদিন স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের কাছে এই কাহিনী পাঠ করা অন্যায় হয়েছিল কিনা। অনেক ভেবেও এর মধ্যে কোন অন্যায় দেখি নি। সেদিন মাষ্টারমশায় আমাদের অবজ্ঞা করেননি বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের

পরিণততম কীর্তি আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন। তিনি আমাদের পাঠকচিত্তের পাঠকচিত্তের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন নি বলেই আমাদের কাছে জেবুন্নিসা-মবারকের বিষামৃতপূর্ণ প্রণয়কাহিনী পাঠ করতে পেরেছিলেন। এই উপন্যাস পড়ে আমরা সেদিন মানসিক অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছিলাম। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল যৌবনের সিংহদ্বারে। আর পথপ্রদর্শক ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রাণের শেষ স্বপ্ন জেবুন্নিসা-মবারকের প্রেম কাহিনী। আর সে কাহিনী চরম রস-পরিণতি লাভ করেছে উপন্যাসের শেষভাগে— অষ্টম খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে। মাস্টারমশায় যখন এই অংশ পড়তেন, তখন তিনি সমগ্র হৃদয় ঢেলে দিতেন এই পাঠে। বাচিক অভিনয়গুণে প্রণয়ীযুগলের অসহ্যবেদনা আমাদের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে দেখা দিত।

আশ্চর্য সেই বর্ণনা; তা আজো পড়ি। আশ্চর্যতর সেই পাঠ; তা আজো আমার কানে বাজে। জেবুন্নিসার কাতর অনুনয় মাষ্টারমশায়ের দ্রবীভূত কণ্ঠস্বরে বেজে উঠেছিল, মবারকের মৃত্যু সংকল্পঘোষণা মাষ্টামশায়ের রুদ্ধকণ্ঠ আর্তনাদে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। আমরা সেদিন স্তম্ভিত হয়ে সেই পাঠ শুনেছিলাম। আজ নতুন করে সেদিনের স্মৃতি স্মরণ করি।

কী আশ্চর্য সেই বর্ণনা :

"সহস্র দীপের রশ্মি প্রতিবিম্বসমন্বিত, উদয়সাগরের অন্ধকার জলের চতুপার্শ্বে পর্বতমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, পটমণ্ডপের দুর্গমধ্যে ইন্দ্রভবনতুল্য কক্ষে বসিয়া মবারক জেব-উন্নিসার হাত, আপন হাতের ভিতর তুলিয়া লইল। মবারক বড় দুঃখের সহিত বলিল, 'তোমাকে আবার পাইয়াছি, কিন্তু দুঃখ এই যে, এই সুখ দশদিন ভোগ করিতে পারিলাম না।'....

জেব-উন্নিসা সজল নয়নে বলিল, 'ঈশ্বর অবশ্য করিবেন যে, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিবে। তুমি আমার কাছে না আসিলে আমি মরিব।'

উভয় চক্ষুর জল ফেলিল। তখন মবারক ভাবিল, 'মরিব, না, মরিব না।' অনেক ভাবিল। সম্মুখে সেই নক্ষত্রখচিতগগনস্পর্শী পর্বতমালা-পরিবেষ্টিত অন্ধকার উদয়সাগরের জল— তাহাতে দীপমালাপ্রভাসিত পট-নির্মিত মহানগরীর মনোমোহিনী ছায়া— দূরে পর্বতের চূড়ার উপর চূড়া— বড় অন্ধকার। দুইজনে বড় অন্ধকারই দেখিল।"

সেই অসহ্য সুখ ও অসহ্য শংকার মাঝে দেখা দিল নিয়তির দূতী— দরিয়া বিবি! তখন—

"বড় সুখের সময়ে, সহসা বিনা মেঘে সম্মুখে বজ্রপতন দেখিলে যেমন বিহ্বল হইতে হয়, জেব-উন্নিসা ও মবারক সেইরূপ হইল। তিনজনে কেহ কোন কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মবারক বলিল, 'ইয়া আল্লা! আমাকে মরিতেই হইবে।'

জেব-উন্নিসা তখন অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, ' তবে আমাকেও'।"

সমালোচক প্রশ্ন করেছেন, চির-অভিশপ্ত প্রেমের এমন লিরিক আর্তশ্বাস, আর কোথাও কি এমন অপূর্ব নাটকীয় মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে মাষ্টারমশায়ের পাঠের গুণে সেদিন নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নমুক্ত একই বৃন্ত-ধৃত জীবনমৃত্যুর এই অমৃতরাগ কী ভাবে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও বিষপাত্রের ফেনোচ্ছ্বাসে রক্তরাগরূপে ঝলসে ওঠে, তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

পালামৌর পথে

"আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রলোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ায় পাণ্ডুবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতাম।"

বক্রোটায় যখন কিশোর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, সেদিন হিমালয়ের আহ্বান তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় এই বর্ণনা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে মাউন্ট আবুতে সপ্তাহব্যাপী বাসের অভিজ্ঞতা। সেই কাচের জানালা, সেই নির্মল নৈশাকাশ, সেই সুতীব্র শৈত্য, সেই মৌন গম্ভীর আরাবল্লী পর্বতমালা— আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে।

পর্বতের স্মৃতি আমার জীবনে দূর স্বপ্নের মতো বর্তমান। প্রথম যে ছবিটি দেখি, তা রংপুরের। অনতিক্রান্ত বাল্যের স্বর্গলোক রংপুরে একদিন সুনীল শারদাকাশের পটে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গকে দেখেছিলাম। এ দেখায় কোনো ভুল নেই। আমার স্মৃতিপটে তা এত স্পষ্ট ও নির্ভুল যে কোনো বিস্মৃতির ধূলিরাশিতে তা আচ্ছন্ন হয় নি।

এর পর উত্তরবঙ্গ ছেড়ে চলে আসি রাঢ়ের সমতলে। এখানে পর্বত দেখার সুযোগ ছিল না। কলকাতা ও হুগলী জেলার শহরকে ঘিরে রেখেছে গঙ্গা। তাই কৈশোরে গঙ্গাই আমার আশ্রয়। নদী আমার কৈশোরকে ভরে রেখেছে।

এই কালে যত বই পড়েছি, তার মধ্যে একটির কথা, আজো আমার স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনে আছে, স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থে তার অংশবিশেষ পড়ে সম্পূর্ণ বইয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। যে লাইব্রেরি আমার স্কুলজীবনের প্রধান আশ্রয় ছিল, সেখান থেকে অচিরাৎ সংগ্রহ করলেম বইখানি। বসুমতী-সংস্করণ সঞ্জীব-গ্রন্থাবলীর মধ্যে তা পেলাম। সে বই বার বার পড়া যায়। কোনোদিন তা পুরনো হয় না। বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পালামৌ" সেদিন আমার মনোহরণ করেছিল। গঙ্গাতীরবর্তী সেই মফস্বল শহরের শান্ত দুপুরে পালামৌর পথে কতবার যে মানস-পরিভ্রমণ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। সেই লাতেহার গিরিমালা, সেই কোল যুবক যুবতীদের নাচ, পালামৌর অরণ্যে সহস্র সহস্র মধুকর-গুঞ্জরিত মহুয়া ফুলের গাছ আমার মনোহরণ করেছিল।

মধ্যপ্রদেশের কাইমোরে ও বিহারের জামালপুর ও চাইবাসায় কিছুদিন বাস করেছি— কোথাও এক মাস, কোথাও বা দুই সপ্তাহ পর্বত-সান্নিধ্যে থেকেছি। 'পালামৌ' পড়ার বহু বছর পরের কথা। কিন্তু যৌবনকালের মধ্যদিনে এই পর্বত-সান্নিধ্য আমার মনে যে স্মৃতি

অনিবার্যভাবে জাগ্রত করে তুলেছে, তা "পালামৌ" পাঠের স্মৃতি।

মাউন্ট আবুতে সূর্যাস্তদর্শনক্ষেত্রে, কাইমোর পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে, জামালপুরের কালী পাহাড়ের শীর্ষে বা চাইবাসায় লুপুংগুটু পেরিয়ে ববকেলা পাহাড়ের জঙ্গলের পথে কেন জানি না "পালামৌ' গ্রন্থের কথা বারবার মনে পড়েছে।

পালামৌ অরণ্যের মহুয়া ফুলের স্মৃতি সঞ্জীবচন্দ্রের মনকে প্রবলভাবে অধিকার করেছিল। আজ নতুন করে সেই বর্ণনা পড়ি আর নিজের স্মৃতিচিত্রশালায় ধরে রাখা পটচিত্রগুলি স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। "পালামৌ" স্মৃতিরোমন্থন, কৈশোরে পড়া "পালামৌ" আজ তাই আমার জীবনে অধিকতর সত্য হয়ে উঠেছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের কবিমন আশ্চর্য নৈপুণ্যে সূক্ষ্ম তুলিকায় সেই স্মৃতিপট অঙ্কন করেছে। তাঁর বর্ণনায় পাঠক-হৃদয়ের স্মৃতি-তন্ত্রী মুহূর্তের মধ্যে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। "পালামৌ" গ্রন্থশেষে সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন :

"নিত্য মুহূর্তে এক একখানি নূতন পট আমাদের মনে ফোটোগ্রাফ হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহা সমুদয় অবিকল সেই পটে থাকিতেছে। সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু সে পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ স্পর্শ সকলই থাকে, ইহা বুঝাইবার নহে, সুতরাং সে কথা থাক।

"প্রত্যেক পটের এক একটা করিয়া বন্ধনী থাকে, সেই বন্ধনী স্পর্শমাত্রেই পটখানি এলাইয়া পড়ে, বহুকালের বিস্মৃত বিলুপ্ত সুখ যেন নূতন হইয়া দেখা দেয়।" পালামৌ-আলেখ্য দর্শনের এইটিই চাবিকাঠি। এইটি যাঁর করায়ত্ত, তিনিই স্মৃতিলোকের রুদ্ধ দুয়ার খুলে প্রবেশ করতে পারেন। সঞ্জীবচন্দ্র পেরেছিলেন এবং স্মৃতিলোকের অম্লান পুষ্পগুলি দেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তা পাঠককেও দেখিয়েছেন।

কৈশোরে পড়া "পালামৌ" আজো ভালো লাগে। তার কারণ বোধহয় এই সূত্রে নিহিত আছে। পটবন্ধনী স্পর্শমাত্রেই স্মৃতিপটে ছবি উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

সঞ্জীবচন্দ্র আমার স্মৃতিলোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেদিন ও আজ নানা স্মৃতিকে পুনর্জীবিত করে তুলেছেন। মনে পড়ে, কাইমোর সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর যে কোয়ার্টার্সে মাসখানেক বাস করেছিলাম, সেখানে রোজ দুধ দিতে আসত কাইমোর পাহাড়ের ও-পারের গ্রামবাসী এক বৃদ্ধ গোয়ালা। পাহাড় পেরিয়ে যাতায়াতে তার ঘণ্টা তিন-চার লাগত। টাটকা নির্ভেজাল দুধ সে নিয়ে আসত। আমার কাজ ছিল তার সঙ্গে গল্প করা, তার গ্রামের খবর জানা। একদিন সেই বৃদ্ধ সরল বিশ্বাসের সঙ্গে কলকাতার কথা জানতে চেয়েছিল। নানা কথার মধ্যে সে প্রশ্ন করেছিল— কলকাতায় কি দুধে জল মেশানো হয়? এই প্রশ্নে মনে মনে হেসেছিলেম, পরে লজ্জিত হয়েছিলেম। স্মৃতিপটে ঐ সরল বৃদ্ধের ছবিটি আজো অম্লান হয়ে আছে। যখনি কাইমোরের সেই সুখস্মৃতি মনে পড়ে, তখনি সেই বৃদ্ধের ছবি দেখতে পাই। ঐ বৃদ্ধই স্মৃতিপটবন্ধনী।

সঞ্জীবচন্দ্র "পালমৌ' গ্রন্থে এই ধরনের স্মৃতিলোক-নির্বাসিত অথচ স্মৃতিপটবন্ধনী-স্পর্শমাত্রে উজ্জীবিত আলেখ্য রচনা করেছেন।

"মৌয়ার ফুল শেফালিকার মত ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে বৃক্ষতল একেবারে বিছাইয়া থাকে। সেখানে সহস্র সহস্র মাছি মৌমাছি, ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কোলাহলে বন পুরিয়া যায়। বোধহয় দূরে কোথায় একটা হাট বসিয়াছে। একদিন ভোরে নিদ্রাভঙ্গে সেই শব্দে যেন স্বপ্নবৎ কি একটা অস্পষ্ট সুখ আমার স্মরণ হইতে হইতে আর হইল না। কোন্ বয়েসের কোন্ সুখের স্মৃতি, তাহা প্রথমে কিছুই অনুভব হয় নাই, সে দিকে মনও যায় নাই। পরে তাহার স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল। .... আমার নিজ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ইহজন্মের স্মৃতি। বাল্যকাল আমি যে পল্লীগ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি, তথায় নিত্য প্রাতে বিস্তর ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল বাধাইত। সেই সঙ্গে ঘরে বাহিরে, ঘাটে পথে হরিনাম— অস্ফুট স্বরে, নানা বয়সের নানা কণ্ঠে , গুণ গুণ শব্দে হরিনাম মিশিয়া কেমন একটা গম্ভীর সুর নিত্য প্রাতে জমিত , তাহা তখন ভাল লাগিত কিনা স্মরণ নাই, এখনও ভাল লাগে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সুর আমার অন্তরের কোথায় লুকানো ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। কেবল সুর নহে, লতা-পল্লব-শোভিত সেই পল্লীগ্রাম, নিজের সেই অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গিগণ, সেই প্রাতঃকাল, কুসুম-সুবাসিত সেই প্রাতর্বায়ু, তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হইল। সকলগুলি একত্র মিলায় এই সুখ, নতুবা কেবল মৌমাছির শব্দে এই সুখ নহে।"

মৌমাছির সুর এই স্মৃতিপটখানির পটবন্ধনী। এর স্পর্শে সঞ্জীবচন্দ্রের মনে বাল্যের পল্লীস্মৃতি আর যৌবনের পালামৌস্মৃতি এক সূত্রে বাঁধা পড়েছে। সহৃদয় পাঠকমাত্রেই সঞ্জীবচন্দ্রের এই উপলব্ধির সত্যতা স্বীকার করবেন। এই পটচিত্রে রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্পর্শ শব্দ সবই আছে, কেবল অনুকূল ক্ষণের অপেক্ষা, সেই ক্ষণে তা প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। রংপুরের স্মৃতি আমার মনের মধ্যে নিত্য বিরাজমান। আজ যখন কেউ কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা বলে, তখনি আমার মনের মধ্যে সেই বাল্যস্মৃতি— সেই সুনীল আকাশে রক্তাভ কাঞ্চনজঙঘার ছবিটি ভেসে ওঠে, — সেই সুখময় বাল্যজীবনের সহস্র স্মৃতি পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। কাঞ্চনজঙ্ঘা আমার কাছে রংপুর স্মৃতিচিত্রের পটবন্ধনী, যেমন সঞ্জীবচন্দ্রের কাছে মৌমাছির গুঞ্জন।

সেই অবিস্মরণীয় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে তিরিশ বছর বাদে আবার দেখলাম। কোচবিহার থেকে শীতল অপরাহ্ণে প্লেনে কলকাতায় আসছি। নির্মেঘ নীল আকাশ। প্লেন চলেছে পাঁচ হাজার ফুট উপর দিয়ে। নীচে ছবির মতো দেখা যায় নদীরেখাঙ্কিত শ্যামল সমতলভূমি। বসেছিলাম জানালার ধারের সীটে। হঠাৎ নীল আকাশের গায়ে ফুটে উঠল অপরাহ্ণিক সূর্যের আলোয় রাঙা ধ্যানগম্ভীর কাঞ্চনজঙ্ঘা। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলাম আমার ফেলে-আসা বাল্যের স্বপ্নচিত্র কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। মুহূর্তের মধ্যে সময়ের স্রোতে উজানে ফিরে গেলাম বাল্যকালে। মনে মধ্যে কে যেন গুঞ্জন করে উঠল --- এই ত সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা! রংপুর স্মৃতিচিত্রের

পটবন্ধনীতে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ফিরে পেলাম। কোচবিহারের তোর্ষা নদীর বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে শীতের ভোরে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখেছি। নতুন করে ফিরে পেয়েছি বাল্যের স্মৃতিসঙ্গী কাঞ্চনজঙ্ঘাকে।

'পালামৌ' গ্রন্থে পেয়েছিলাম লাতেহার পাহাড়ের ছবি। এই সেদিন তাকে নতুন করে ফিরে পেলাম উত্তরবঙ্গে। কোচবিহার জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ির পথে পথে বারবার এই জয়ন্তী পাহাড় জাগিয়ে দিয়েছে আমার পূর্বতন স্মৃতিকে। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেছে মধ্যপ্রদেশের কাইমোর পাহাড়, বিহারের জামালপুরের কালী পাহাড় আর রাজস্থানের আবু পাহাড়। কিছুই হারায় না। আনন্দ বিষাদে মেশানো ছবিগুলি স্মৃতিচিত্রশালার বন্ধ দুয়ার খুলে আজ আমার চিত্তপটে রঙীন হয়েদেখা দিয়েছে। এইসব পাহাড়ের সঙ্গে যে সব সঙ্গীসঙ্গিনীদের স্মৃতি জড়িত, আজ তারা আমার কাছে নেই, কিন্তু মনের মধ্যে সেইসব ছবি অম্লান হয়ে আছে।

"পালামৌ" কৈশোরে ভালো লাগত, আজো ভালো লাগে,— স্মৃতিপটে পালামৌর ছবি নিত্য উজ্জ্বল,— তার কারণ, বোধ করি ব্যাখ্যা করবার নয়, তা উপলব্ধি ও অনুভূতি-সাপেক্ষ। বস্তুত সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ভ্রমণগ্রন্থ নয়, প্রবন্ধ নয়, স্মৃতি-উদ্দীপক মনোরম মধুর রচনা মাত্র। এই মধুর রচনার জন্মস্থান সঞ্জীবচন্দ্রের কবিহৃদয়, এর রস মধুর রস। সঞ্জীব-হৃদয়ের প্রীতি মাধুর্যে ভরা "পালামৌ" যে পড়ে নি, সে হতভাগ্য; যার ভালো লাগে না, সে কৃপার পাত্র।

সঞ্জীবচন্দ্রের সৌন্দর্যসৃষ্টি আয়াস-বর্জিত সরল সৌন্দর্যরচনা, তাঁর সৌন্দর্যদৃষ্টি শিশুর সহজ বিস্ময়ভরা আনন্দ-দৃষ্টি। বোধ করি এই জন্যই "পালামৌ" গ্রন্থের ছবিগুলি এত প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট ও নিরাভরণ।

বরাকর নদীপারের ছবিটি নতুন করে দেখি :

"যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাসী তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকা দ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহাদের যুবতীরা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে। আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক একবার দেখিতেছে। শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলের উপর উঠিতেছে।"

তারপরই পালামৌর পথের দৃশ্যটি দেখি :

"রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশ মত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম.। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে

অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল, কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তাহার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরও কতক দূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে , সর্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন— ঘন নিবিড় বন।"

বর্ণনাগুণে অঙ্কননৈপুণ্যে পালামৌ-পথের ছবিটি এখানে দৃষ্টিমোহন রূপে স্বাভাবিক রূপে ফুটে উঠেছে। রাঁচি থেকে আমি পালামৌ যাই নি, কিন্তু কয়েক বছর আগে রাঁচি থেকে চাইবাসা গিয়েছি, সঞ্জীবচন্দ্রের এই বর্ণনাকে চোখের সামনে দেখেছি। কৈশোরে পড়া "পালামৌ" আমার মনের মধ্যে ছবি হয়ে ছিল, আজ তাকে দৃষ্টিপথে ফিরে পেয়েছি। এর জন্য সঞ্জীবচন্দ্রকে ধন্যবাদ, তিনিই আবার পুরনোকে নতুন রূপে, কৈশোরস্মৃতিকে পুনর্জীবিত করে ফিরিয়ে দিলেন।

কোল-যুবতীর আলেখ্যরচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের ক্লান্তি নেই। মদ্যপানরতা যুবতী, নৃত্যরতা যুবতী, পথগামিনী যুবতী— নানারূপে শিল্পী তাকে দেখেছেন। কোল যুবতীর ছবিগুলি সঞ্জীবচন্দ্র রাজপুত মিনিয়েচার পেন্টিং-এর ঢঙে এঁকেছেন।

"তাহার পর আবার কতদূর গিয়া দেখিলাম, পথশ্রান্তা মদের ভাঁটিতে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। গ্রামমধ্যে যে যুবতীদের দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারাও আকারে অলঙ্কারে অবিকল সেইরূপ, যেন তাহারাই আসিয়া বসিয়াছে। যুবতীরা উভয় জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া দুই হস্তে শালপত্রের পাত্র ধরিয়া মদ্যপান করিতেছে, আর ঈষৎ হাস্যবদনে সঙ্গীদের দেখিতেছে।....

"যুবতীর মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন বড় ভয় পাইয়াছে,অথচ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আছে। তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন, অতি উর্দ্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে। আমি অনিমিষ লোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম।"

"হাস্য-উপহাস শেষ হইলে নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতীসকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সমউচ্চ,সকলগুলিই পাথুরে কাল, সকলেরই অনাবৃত দেহ, সকলেরই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে চঞ্চল। যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃন্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল, তার পরেই তাহার নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন, তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না, দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়া

ছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথায় ফুলগুলি নাচিতে লাগিল, বুকের ধুক্ ধুকি দুলিতে লাগিল।.....

তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে এক একবার চিতিয়া পড়িতেছে, আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসি তেছি।"

সঞ্জীবচন্দ্র কবি ও রূপকার। রূপের বস্তুলোক নির্মাণে তাঁর যেমন নৈপুণ্য, অনুভূতির ভাবলোক রচনায় তেমনি দক্ষতা। সেই বহু পঠিত বহুশ্রুত অংশটি পুনরায় উচ্চারণ করি :

"নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম; তাঁবুতে শতকার্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম, চারিটা বাজিলেই আমি অস্থির হইতাম, কেন তাহা তখন ভাবিতাম না। পাহাড়ে নূতন কিছুই নাই, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমায় সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি, এ বেগ আমার একার নহে। যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধুর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে, জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে, জলে যে যাইতে পাইল না, সে অভাগিনী। সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে। আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে। বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয়, আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।"

কৈশোরে 'পালামৌ' পড়ে কল্পনায় এক অচেনা প্রকৃতি সৌন্দর্যলোককে পেয়েছিলেম, আজ 'পালামৌ' পড়ার সঙ্গে সেই প্রকৃতিদৃশ্যকে বাস্তবে উপভোগের মাধ্যমে বহুগুণে ফিরে পেয়েছি। স্মৃতি এখানে বাস্তবের সঙ্গে রমণীয় পরিণয়ে মিলিত হয়েছে। তাই 'পালামৌ' গ্রন্থ ও তার রচয়িতা আমার স্মৃতিপটে নিত্যবিরাজমান।

দেবদাস

অনেক দিন আগের কথা। ছেলেবেলার কথা। স্পষ্ট মনে পড়ে। ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে পায়েহাঁটা পথে ধুলো মেখে শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎ জন্মতিথিসভায় গিয়েছিলেম। গিয়ে দেখি, শরৎচন্দ্রের ভিটে জঙ্গলে ভরা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম, কোনো চাকচিক্য নেই, জীবনস্রোতে ভাঁটা পড়েছে। শান্ত স্তব্ধ দুপুরে কিশোর শরৎচন্দ্রে লীলাভূমি দেবানন্দপুরে দাঁড়িয়ে , মনে পড়ে, ক্লেশ বোধ করেছিলেম। সেদিন শরৎস্মৃতিভবন তৈরী হয় নি। তৈরি হবার প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে। স ভায় কি বক্তৃতা হয়েছিল কিছুই মনে নেই। মনে আছে উদ্বোধনী সংগীতের কয়েকটি চরণ—

'শরতের চাঁদ পাই নি আমরা, পেয়েছি শরৎচন্দ্রে।'

এই চরণ মনের মধ্যে অনেকদিন গুঞ্জন করে ফিরেছিল। আজো বিরল অবসর মুহূর্তে এই

চরণটি মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

এই গানের মধ্যে বাঙালির মনের কথা ধ্বনিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেবল বাঙলা ভাষার বড়ো লেখক নন, তিনি আমাদের হৃদয়ের লোক, দরদী সঙ্গী। শরৎচন্দ্রের গৌরব এখানে, দুর্বলতাও এখানে। শরৎ-সাহিত্যের সম্পর্কে বহু সমালোচনা পড়ে শেষ পর্যন্ত ছোটবেলার ঐ ধারণাতেই আমার নিষ্ঠা। শরৎচন্দ্র বাঙালির হৃদয়ের ধন। এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

শরৎচন্দ্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত পঁচিশ বছর (১৯১৩-১৯৩৮) বাংলা কথাসাহিত্যে রাজত্ব করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, কল্লোল-গোষ্ঠী— সকলের প্রভাবকে এড়িয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর মনের কথা লিখে গেছেন। বাঙালিকে কাঁদিয়ে বাঙালির হৃদয়-সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছিলেন।

শরৎচন্দ্রকে বাঙালির কাছে জনপ্রিয় করে তোলারা দায়িত্ব বহন করেছিলেন দুই প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আর বসুমতী সাহিত্যমন্দির। বিশেষ করে বসুমতী-প্রকাশিত শরৎ-গ্রন্থাবলী শরৎচন্দ্রকে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। আমার মনে হয় (হয়ত এ ধারণা ভুল হতে পারে) বসুমতীর সুলভ সংস্করণে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি পায় নি বলে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছয় নি। রবীন্দ্র-উপন্যাসের পাঠকসংখ্যা শরৎ-উপন্যাসের পাঠকসংখ্যার কাছে পৌঁছতে পারে নি, একথা অস্বীকার করা যায় না।

কিশোরপাঠ্য সাহিত্য ছেড়ে বয়স্কপাঠ্য সাহিত্যে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি শরৎ-উপন্যাস পড়ে, এ কথা কবুল করতে আমার কুণ্ঠা নেই। শরৎচন্দ্র পড়ার আগে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী পড়েছি। চোখের জলে সাহিত্যদীক্ষা হয়েছে— সেদিন অপু দুর্গার দুঃখে আমার মনের মধ্যে যে বেদনাবোধ জাগ্রত হয়েছে, তা'ই আমাকে সাহিত্যবোধে উন্নীত করেছে। কিন্তু পথের পাঁচালিকে বয়স্কপাঠ্য উপন্যাস মনে করতে আমার বাধে। আসলে পথের পাঁচালীকে যে কোনো বয়সে পড়া যায়। বয়স্কজীবনের গুরুতর সুখদুঃখ পথের পাঁচালীতে নেই, সেখানে আছে কৈশোরের আনন্দ-বেদনা। অপুর মধ্যে সেদিন আমি নিজেকেই দেখেছি, অপুর জগৎ আমারই কৈশোর জগৎ।

শরৎ-উপন্যাসই আমাকে যৌবনে— মানসিক যৌবনে উত্তীর্ণ করে দিল। স্কুলে পড়তে পড়তেই শরৎ-উপন্যাস পড়েছি। বস্তুতঃ স্কুল ছাড়ার আগেই শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়া শেষ করেছি। আজ মনে হয় তার ফলে আমার ক্ষতি হয় নি, বরং লাভবান হয়েছি। বাড়িতে বসুমতী সংস্করণ শরৎ-গ্রন্থাবলী ও বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী ছিল, আরো বই ছিল, চুপি চুপি এই দুটি গ্রন্থাবলী পড়তে শুরু করেছি। শেষে যখন অভিভাবকেরা জানতে পেরেছেন তখন প্রকাশ্যেই পড়েছি।

শরৎচন্দ্রের কোন্ উপন্যাসে সেদিন আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে যে বইয়ে নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছিল, সে বই আমায় তীব্র আকর্ষণ করেছিল। সে বই এক ও অদ্বিতীয় 'দেবদাস' উপন্যাস। দেবদাস

বাংলাদেশের সর্বাধিক পঠিত উপন্যাসের অন্যতম। বহু বাঙালির মতো আমিও দেবদাস পড়ে লজ্জিত, দুঃখিত, বিস্মিত হয়েছিলেম। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত এই উপন্যাস আমার জন্মের আগেই বঙ্গদেশে খ্যাতি লাভ করে। আমার বোধোদয়ের কালে দেবদাস চলচ্চিত্র (১৯৩৫) প্রমথেশ বড়ুয়ার কল্যাণে বাঙালির হৃদয় লুঠ করে নেয়।

দেবদাস উপন্যাস ও দেবদাস চলচ্চিত্র পড়তে ও দেখতে আমার বেশি সময় লাগে নি। দুটি কাজই সেদিন সে বয়সে আমার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল এবং সে-কারণেই তার প্রতি আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। বড়ুয়া-যমুনা-অমর মল্লিকের অভিনয় ও অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গানে সেদিন আমার জগৎ ভরে গিয়েছিল। সিনেমা দেখেছি দু-একবার, কিন্তু দেবদাস উপন্যাস পড়েছি অসংখ্যবার। পড়ে তা কোনোদিন পুরনো হয়নি।

আজ অনেকদিন পরে সেদিনের কথা মনে করে আনন্দ পাই। স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে সেদিনের পাঠকের মানস-প্রতিক্রিয়ার ছবিটি দূর থেকে দেখতে পাই। দেবদাস-পার্বতী-চন্দ্রমুখী প্রেমের কাহিনী সেদিন আমাকে বয়স্কপাঠ্য সাহিত্যজগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল, এই সত্যটি নতুন করে উপলব্ধি করি। অথচ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সেদিন যে ধারণা পোষণ করতাম, আজ তা বর্জন করেছি। সেদিন যে-সব কারণে তাঁকে মহৎ ঔপন্যাসিক বলে মনে করেছিলাম, আজ সে-সব কারণেই শরৎচন্দ্রকে মহৎ লেখক বলে মনে হয় না। তবু শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের সর্বজনীন অনুরাগ থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে পারি নি, শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়ে সাহিত্যচর্চার কথা ভাবতে পারি না।

'দেবদাস' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র মানবিক দুর্বলতার যে-সব ছবি এঁকেছেন অংকননৈপুণ্যে তা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, এ'কথা অস্বীকার করা মূঢ়তা। তের বছরের পার্বতীর জন্য আঠারো বছরের দেবদাসের calf-love -এর ছবি দেখে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার মতো অনেকেই মুগ্ধ হয়েছিল। এতে লজ্জা নেই। পার্বতী দেবদাসকে ভালবাসত, সে ভালবাসার অপর নাম অধিকারবোধ। দেবদাস পার্বতীকে কোনোদিন কি ভালবেসেছিল? বোধ হয় না। অথচ দেবদাসের আসক্তি ও দুর্বলতার বর্ণনায় পাঠক (এবং অধিক সংখ্যায় পাঠিকা) মুগ্ধ হয়েছে।

'দেবদাস' উপন্যাসের অবিস্মরণীয় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পড়ে মনে মনে ক্লেশ বোধ করেছিলেম এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাঙালিমাত্রেই সেই বেদনামিশ্রিত সুখানুভব করেছে। রাত একটার সময় দেবদাসের শয়নকক্ষে পার্বতী— এই ছবিটি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেছে। নিষিদ্ধ প্রেম, বয়স্ক প্রেমের পাঠ এখানেই গ্রহণ করছিলাম।

সেই ছবিটি আর-একবার দেখতে ইচ্ছে করে।

"পায়ের উপর হাত রাখিয়া পার্বতী ধীরে ধীরে ডাকিল, দেবদা!—

দেবদাস ঘুমের ঘোরে শুনিতে পাইল, কে যেন ডাকিতেছে।

চোখ না চাহিয়াই সাড়া দিল, উঁ—

ও দেবদা—

এবার দেবদাস চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। পার্বতীর মুখে আবরণ নাই। ঘরে দীপও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে, সহজেই দেবদাস চিনিতে পারিল; কিন্তু প্রথমে যেন বিশ্বাস হইল না। তাহার পর বলিল, একি! পারু না কি?

হাঁ, আমি।

দেবদাস ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল। বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় বাড়িল, কহিল এত রাত্রে?

পার্বতী উত্তর দিল না, মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রে কি একলা এসেছ না কি?

পার্বতী কহিল, হাঁ।

দেবদাস উদ্বেগে, আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, বল কি। পথে ভয় করে নি।

পার্বতী মৃদু হাসিয়া কহিল, ভূতের ভয় আমার তেমন করে না।

ভূতের ভয় না করুক, কিন্তু মানুষের ভয় ত করে! কেন এসেচ?

পার্বতী জবাব দিল না; কিন্তু মনে মনে কহিল, এ সময়ে আমার তাও বুঝি নেই।....

কাল তোমার লজ্জায় কি মাথা কাটা যাবে না?

প্রশ্ন শুনিয়া পার্বতী তীব্র অথচ করুণ-দৃষ্টিতে দেবদাসের মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া অসঙ্কোচে কহিল, মাথা কাটাই যেতো— যদি না আমি নিশ্চয়ই জানতুম, আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।

দেবদাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, আমি! কিন্তু আমিই কি মুখ দেখাতে পারব?

পার্বতী তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, তুমি? কিন্তু তোমার কি দেবদা?

একটুখানি মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, তুমি পুরুষমানুষ। আজ না হয় কাল তোমার কলঙ্কের কথা সবাই ভুলবে; দুদিন পরে কেউ মনে রাখবে না— কবে কোন্ রাত্রে হতভাগিনী পার্বতী তোমার পায়ের উপর মাথা রাখবার জন্যে সমস্ত তুচ্ছ করে এসেছিল!

ও কি পারু?

আর আমি—

মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবদাস কহিল, আর তুমি?

আমার কলঙ্কের কথা বল্‌চ? না— আমার কলঙ্ক নেই। তোমার কাছে গোপনে এসেছিলাম বলে যদি আমার নিন্দে হয়, সে নিন্দে আমরা গায়ে লাগবে না।

ওকি পারু? কাঁদছ?

দেবদা নদীতে কত জল। অত জলেও কি অমারা কলঙ্ক চাপা পড়বে না?

সহসা দেবদাস পর্বতীর হাত দু'খানি ধরিয়া ফেলিল— পার্বতী!

পার্বতী দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, এইখানে একটু স্থান দাও, দেবদা!

তারপর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। দেবদাসের পা বাহিয়া অনেক ফোঁটা অশ্রু শুভ্র

শয্যার উপর গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পরে দেবদাস পার্বতীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, পারু, আমাকে ছাড়া কি তোমার উপায় নেই?

পার্বতী কথা কহিল না। তেমনি করিয়া পায়ের উপর মাথা পাড়িয়া পড়িয়া রহিল। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শুধু তাহার অশ্রু-ব্যাকুল ঘন দীর্ঘশ্বাস দুলিয়া-দুলিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।"

পার্বতীর এই ছবি, আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতার ছবি, কেবল দেবদাসকে নয়, বাঙালি পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল, এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

চোখের জল, নির্জন নিশীথ, আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না, ঘরে যুবক-যুবতী— আয়োজনের আর বাকি নেই— এই পরিবেশে জাদুকর শরৎচন্দ্র রোমান্টিক প্রেমের আতিশয্যের ছবি এঁকেছেন।

তারপর অষ্টম পরিচ্ছেদে বাঁধে জল আনতে গিয়ে পার্বতীর সঙ্গে দেবদাসের সাক্ষাৎকারের ছবিটি পাই। রূপবতী অভিমানিনী পার্বতী আর অনুতপ্ত অহংকারী দেবদাসের এই অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকার পাঠক-পাঠিকার চোখের জল ঝরিয়েছে।

দেবদাস পার্বতীকে প্রেমের যে অভিজ্ঞান উপহার দিয়েছে, তা অঙ্গুরীয় নয়, চুম্বন নয়, কপালে ছিপের বাঁটের আঘাতে গভীর ক্ষত। এই ছবি দেখেই বাঙালি পাঠক আত্মহারা হয়েছে। রক্তে পার্বতীর মুখ ভিজে গিয়েছে, দেবদাস নিজের পাতলা জামার খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে জলে ভিজিয়ে পার্বতীর কপালে বেঁধে দিচ্ছে, এই ছবি দেখে সেদিন এক অনাস্বাদিত-পূর্ব অভিজ্ঞতার উত্তীর্ণ হয়েছিলেম।

"পার্বতী আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, দেবদাদা গো—

দেবদাস ফিরিয়া আসিল। চোখের কোণে একফোঁটা জল—।

বড় স্নেহজড়িত কণ্ঠে কহিল, কেন রে পারু!

কাউকে যেন বলো না।

দেবদাস নিমিষে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া পার্বতীর চুলের উপর ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, ছিঃ — তুই কি আমার পর পারু?"

চোখের জল আর হৃদয়-ব্যাকুলতায় মেশানো এই ছবি। অতিকথন, আতিশয্য, অতিরেক; সেন্টিমেন্টালিজমের চূড়ান্ত। এতেই বাঙালি পাঠক মজেছে। বলতে লজ্জা নেই সেদিন আমিও মজেছিলাম।

আজ বুঝি শরৎচন্দ্র করুণরসের শিল্পী, — এরকম একটি ভ্রান্ত ধারণা পাঠকসমাজে চালু আছে। কিন্তু করুণরসের মূলমন্ত্র মিতভাষিতা, বস্তুতঃ সকল মহৎ শিল্পকর্মেরই মূল কথা। বাঙালি পাঠক তা মানতে চায় না। বাঙালির প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্রও তা মানেন নি। শ্রীকান্ত, দেবদাস, চরিত্রহীন, বড়দিদি— সর্বত্রই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি— যেখানেই তিনি করুণরসের সাহায্যে পাঠকের চোখে জল আনার সচেতন প্রয়াস করেছেন সেখানেই তিনি

আর্টের সংযম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, উৎকৃষ্ট সাহিত্যবস্তু থেকে নিছক ভাবালুতা, সেন্টিমেন্টালিজমের সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্রের নায়কেরা এই জন্যেই বিবর্ণ— তারা বেশীর ভাগই করুণরসের চরিত্র। আর করুণরসের আতিশয্যের ফলে তাদের একজনের মধ্যেও পৌরুষ দেখা যায় না— যারা শ্রীকান্তের মতো বন্ধনহীন, জন্ম-সন্ন্যাসী, ভবঘুরে, তাদের মধ্যেও না। শরৎচন্দ্রের মধ্যে বাঙালিত্ব খুব বেশি মাত্রায় আছে। সেই কারণেই তিনি জীবনকে করুণরসের আতিশয্যের মধ্যে দেখেছেন। তাঁর বিষয়বস্তু অতি পুরাতন— প্রেমের জয়। ভাবাকুল রোমান্টিক দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র প্রেমের জয় দেখিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে দেশকালাতিক্রমী মহৎ চেতনা নেই।

তবু 'দেবদাস' পড়ে সেদিন মুগ্ধ হয়েছি, বারবার মুগ্ধ হতে চেয়েছি। এই ছবি ঘুরে ঘুরে এসেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেবদাস বাড়ি এসেছে। দুজনে আবার সাক্ষাৎকার। সে পার্বতী নেই, সে দেবদাসও নেই। দেবদাস মদ খেতে শিখেছে, চন্দ্রমুখীর কাছে যেতে শিখেছে, আর পার্বতী জমিদার-গৃহিণী হয়েছে।

আবার সেই ঘর। দেবদাসের ঘর, কাল সন্ধ্যা।

"পার্বতী ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া মেঝের উপর বসিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া হাসিল, তাহার মুখ বিষণ্ন, কিন্তু শান্ত। হঠাৎ কৌতুক করিয়া কহিল, যদি অপবাদ দিই?

পার্বতী সলজ্জ, নীলোৎপল চক্ষু দুটি একবার তাহর পানে রাখিয়া, পরক্ষণেই অবনত করিল। মুহূর্তে বুঝাইয়া দিল, এ কথা তাহার বুকের মাঝে চিরদিনের জন্য শেলের মত বিঁধিয়া আছে, আর কেন? কত কথা বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল।...

দেবদাসের কথার ভিতরে শ্লেষ বা বিদ্রূপের লেশমাত্র ছিল না, প্রসন্ন হাসি-হাসি মুখে অতীতের দুঃখের কাহিনী বলিল। পার্বতীর কিন্তু বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুখে কাপড় দিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনে মনে বলিল, দেবদাদা, ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার সম্বল! তুমি আমাকে ভালবাসতে— তাই দয়া করে আমাদের বাল্য-ইতিহাস ললাটে লিখে দিয়েচ। ও আমার লজ্জা নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের সামগ্রী!....

দেবদাস কহিল, ওরে পারু, দোর খুলে দে। পার্বতী কথা কহে না।

ও পারু।

আমি কিছুতেই যাব না, বলিয়া পার্বতী অকস্মাৎ রুদ্ধ আবেগে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল— বহুক্ষণ ধরিয়া বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল। ঘরের ভিতর এখন গাঢ় অন্ধকার— কিছুই দেখা যায় না। দেবদাস শুধু অনুমান করিয়া বুঝিল, পার্বতী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে— ধীরে ধীরে ডাকিল, পারু!

পার্বতী কাঁদিয়া উত্তর দিল, দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট। দেবদাস কাছে সরিয়া অসিল। তাহার চক্ষেও জল— কিন্তু স্বর বিকৃত হইতে পায় নাই। কহিল, তা কি আর জানি নে রে।

দেবদা, আমি যে মরে যাচ্ছি। কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না— আমার যে

আজন্মের সাধ—

অন্ধকারে চোখ মুছিয়া দেবদাস কহিল— তারও ত সময় আছে।

.... পার্বতী পুনরায় কহিল, দেবদা, আমার বাড়ি চল।

.... দেবদাস অনুমান করিয়া পার্বতীর পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, এ কথা কখন ভুলব না। আমাকে যত্ন করলে যদি — তোমার দুঃখ ঘুচে— আমি যাব। মরবার আগেও আমার এ কথা স্মরণ থাকবে।"

পার্বতীর সঙ্গে দেবদাসের এই শেষ দেখা। বেঁচে থাকতে আর দেখা হয় নি।

এই চূড়ান্ত সেন্টিমেন্টাল দৃশ্যে উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের সেন্টিমেন্টাল মুহূর্তের ভূমিকা রচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র বাঙালি পাঠকের চোখে যত জল আছে, সবটাই টেনে বার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং স্বীকার করতেই হয়, সে-কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত।

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে এই রোমান্টিক প্রেমের আলেখ্য রচনা করেছেন। কেবল পার্বতীর প্রেমে নয়, চন্দ্রমুখীর প্রেমে এই একই প্রেমব্যাকুলতা রূপায়িত হয়েছে। অথচ চন্দ্রমুখী পার্বতী নয়। সে প্রেমব্যবসায়িনী, নাগরীবৃত্তিতে নিপুণা, অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক ও কঠিন। তবু শরৎচন্দ্র তাকেও চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন এবং বিশুদ্ধ প্রেম অর্থাৎ রোমান্টিক প্রেমের জয়পতাকা চন্দ্রমুখীর জীবনে উড়িয়েছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে চন্দ্রমুখী আপনাকে অকপটে ব্যক্ত করেছে। পার্বতীর মতো লজ্জাশীলা সে নয়। পার্থক্য এইমাত্র। বাকি চন্দ্রমুখীও পার্বতী।

"মনে মনে বলিতে বলিতে সহসা তাহার মুখ দিয়া অস্ফুট বাহির হইয়া পড়িল, নিজেকে দিয়েই বুঝেছি, সে তোমাকে কত ভালবাসে!

দেবদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, কি বল্‌লে?

চন্দ্রমুখী কহিল, কিছু না! বলছিলাম যে, সে (পার্বতী) তোমার রূপে ভোলে নি। তোমার রূপ আছে বটে, কিন্তু তাতে ভুল হয় না। এই তীব্র রূপ সকলের চোখেও পড়ে না, কিন্তু যার পড়ে, সে আর চোখ ফিরাতে পারে না। বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি যে কি আকর্ষণ, তা যে কখনো তোমাকে ভালবেসেছে, সে জানে। এই স্বর্গ থেকে সাধ করে ফিরে যাবে, এমন মেয়েমানুষ কি পৃথিবীতে আছে?

আবার কিছুক্ষণ নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, এ রূপ ত চোখে পড়ে না! বুকের একেবারে মাঝখানটিতে এর গভীর ছায়া পড়ে। তারপরে দিন শেষ হয়ে গেলে আগুনের সঙ্গে চিতায় ছাই হয়ে যায়।

দেবদাস বিহুল-দৃষ্টিতে চন্দ্রমুখীর পানে চাহিয়া কহিল, আজ এ-সব তুমি কি বলচ?"

এই স্মরণীয় প্রেমদৃশ্য দেখে দেবদাসের মতো বাঙালি পাঠকও বিহ্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু তার এমন ক্ষমতা থাক না যে লেখককে প্রশ্ন করে— 'এ-সব তুমি কি বল্‌চ?'

এখানেই শরৎচন্দ্রের ওস্তাদী মার!

তারপর পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। প্রেমিকসর্বস্বা চন্দ্রমুখী এবার দেবদাসের কাছে নিজেকে

অনাবৃত করেছে।

"দেবদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বৌ, তুমি আমার কে যে, এত প্রাণপণে আমার সেবা করছ?

চন্দ্রমুখী লজ্জবনত বধূও নহে, অ-বাকপটু বালিকাও নহে, মুখপানে স্থির শান্ত-দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহজড়িত কণ্ঠে বলিল, তুমি আমার সর্বস্ব— তা আজও বুঝতে পার নি?"

তারপর চন্দ্রমুখীর কাছে দেবদাসের শেষ বিদায় গ্রহণ।

"চোখ মুছিয়া কহিল, আবার কবে দেখা পাব?"

দেবদাস কহিল, বল্‌তে পারি না, তবে বেঁচে থাকতে তোমাকে কোন দিন ভুলব না, তোমাকে দেখবার তৃষ্ণা আমার কখনো মিটবে না।

প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী সরিয়া দাঁড়াইল। চুপিচুপি বলিল, এই আমার যথেষ্ট! এর বেশী আশা করি নে।"

জীবনে আর কোনোদিন চন্দ্রমুখীর সঙ্গে দেবদাসের দেখা হয় নি। এখানে শরৎচন্দ্র চন্দ্রমুখীকে আদর্শ সতীসাধ্বীরূপে দেখিয়েছেন। দেখানোর গুণে পাঠক সংশয়প্রকাশের অবকাশ পায় নি, তাকে মেনে নিতে হয়েছে, চন্দ্রমুখী রমণীকুলে রত্ন!

পার্বতী ও চন্দ্রমুখী— দু' ক্ষেত্রে বিদায়দৃশ্যে একই বিষয়ের অনুবৃত্তি হয়েছে। প্রেমিকা দয়িতের সেবিকা হতে চেয়েছে। বাঙালি পাঠককে ভেজাবার এই অব্যর্থ কৌশল শরৎচন্দ্র বারবার প্রয়োগ করেছেন। বিস্ময়ের কথা বারবারই সফল হয়েছেন। শরৎচন্দ্রের নায়িকা মাতৃস্বভাবা, তাঁর নায়ক স্নেহবুভুক্ষু কিশোর। হৃদয়াবেদন-অপচয়ের ছবিটি শরৎচন্দ্র নিপুণভাবে অংকন করেছেন। তাঁর কাছে প্রেম রোমান্টিক ভাবাকুলতা মাত্র, আর জীবন সংকীর্ণ সমাজসীমায় বদ্ধ আর্তির সমষ্টি মাত্র।

শরৎচন্দ্রের সহানুভূতির মধ্যে ডস্টয়েভস্কি বা টলস্টয়ের বিশ্বব্যাপী compassion নেই, saintliness নেই, religiousness নেই, আছে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে গভীর দরদ। ভাবালুতার পাথেয় নিয়ে শরৎচন্দ্র জীবনসাগর পাড়ি দিয়েছেন। সে সাগর আসলে গণ্ডিবদ্ধ পল্বল মাত্র। তবু স্বীকার করতেই হয়, শরৎচন্দ্রের আঁকা ছবিতেই প্রেমের লীলা প্রথম দেখেছি। একারণেই 'দেবদাস'কে ভুলতে পারি না।

দীনেশচন্দ্র

স্কুলের শেষ ধাপে যখন পড়ি, তখন আমার উপনয়ন হয়। উপনয়নের স্মৃতি আজো আমার স্পষ্ট হয়ে আছে। সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন একটা রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা ছিল, যা আমাকে মোহাবিষ্ট করেছিল। মস্তক মুণ্ডন, কাষায় পরিধান, ত্রিরাত্রি দণ্ডীঘরে বাস, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক, হবিষ্যান্ন রন্ধন ও দণ্ড ধারণ, পবিত্র গায়ত্রী উচ্চারণ ও সূর্যবন্দনা : সমস্তটাই আমাকে

মুগ্ধ করেছিল। তারপর সেই ভিক্ষা গ্রহণের অনুষ্ঠান ঃ পরিচিত আত্মীয়-আত্মীয়ারা আমাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখছেন, তাদরে সেই দৃষ্টিতে আমারও নবজন্ম হচ্ছে, সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করেছিলেম 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ। দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণের রোমাঞ্চকর অনুভূতি সেদিন আমাকে অভিভূত করেছিল এবং মনে হয়েছিল, উপনয়ন অনুষ্ঠান জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য ও মূল্যবান অভিজ্ঞতা। সমস্ত দম্ভ ও অহমিকা বর্জন করেও আজো এই ধারণা পরিবর্তনের কারণ দেখি না। সেদিন মনে মনে বলেছিলেম, ' এ আমার নতুন জন্ম; নতুন জন্ম।'

উপনয়ন উপলক্ষে নানা উপহার পেয়েছিলেম। তার মধ্যে স্বভাবতই যা আমাকে লুব্ধ করেছিল, তা হ'ল বই। বস্তুত এর চেয়ে প্রিয়তর কোনো উপহারের কল্পনা সেদিন আমার ছিল না, আজো নেই। সেদিন নিজেকে তরুণ ব্রহ্মচারীরূপে দেখে যে আনন্দ পেয়েছিলেম, জীবনের অন্যান্য ভূমিকায় সে আনন্দ পাই নি। এই আনন্দের সমর্থন সেদিন যে-সব উপহৃত বইয়ে পেয়েছিলেম, তার মধ্যে প্রধান 'পৌরাণিকী' ও 'রামায়ণী কথা।' এই দুটি গ্রন্থের লেখক আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন— যিনি বঙ্গবীণার সেবায় জীবন নিয়োজিত করেছিলেন।

কেন জানি না, দীনেশচন্দ্রের এই দুটি বইয়ের কথা আমার উপনয়ন-স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বোধকরি, তরুণ ব্রহ্মচারীর মনে সুরে বাঁধা ছিল এই বইদুটির সুর। 'পৌরাণিকী' ও 'রামায়ণী কথা' রচনার প্রেরণা সনাতন ধর্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাস দীনেশচন্দ্রকে রামায়ণ, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের জগতে টেনে নিয়ে গেছে; এইসব গ্রন্থের কাহিনীর পুনর্বিবৃতি দীনেশচন্দ্রের আত্মসন্ধান, এ কথা বললে ভুল বলা হবে না। 'পৌরাণিকী' ও 'রামায়ণী কথা'র আকর্ষণ ত্রিবিধ— মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মতো সুগম্ভীর ধ্বনিরোলসমন্বিত ভাষা, কাহিনীর গাম্ভীর্য, আর দেবোপম নরচরিত্রের মহিমা। ভারতের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ, তার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় সাধনের উপযুক্ত মুহূর্ত কৈশোর আর তার উপযুক্ত গ্রন্থরূপে 'রামায়ণী' কথা ও 'পৌরাণিকী'র দাবি অগ্রগণ্য। তাই দীনেশচন্দ্রের এ বই দুটির কথা বার বার মনে পড়ে।

তরুণ দ্বিজরূপে সেদিন নিষ্ঠাভরে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী-জপ ও আহ্নিক করতাম, সেই পবিত্র ধর্মাচরণে আনুকূল্য করেছিল 'রামায়ণী কথা ও 'পৌরাণিকী'। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সমাজ', 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের বিবরণ পাঠের আগে দীনেশচন্দ্রের বইদুটি পড়েছিলেম। এই বইদুটিতে যে ভারতকে চিনেছিলেম, রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যে সেদিন তারই ছবি দেখেছিলেম।

'পৌরাণিকী'তে দীনেশচন্দ্র একটি সুন্দর গল্প লিখেছেন— 'জড়ভরত' । এর ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র অল্প কথায় ভারতবর্ষকে ব্যাখ্যা করেছেন। স্পষ্ট মনে পড়ে দীনেশচন্দ্রের কবিকল্পনা আমার কিশোর মনকে কী ভাবে অভিভূত করেছিল। দীনেশচন্দ্র নিপুণভাবে একটি চিত্র রচনা করেছেন :

"ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেবমন্দির। এখানে দিবারাত্র পূজার কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিতেছে। কেহ চন্দন ঘষিতেছে, কেহ বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র চয়ন করিতেছে, কেহ সংকল্প করিয়া লক্ষ নাম জপ করিতেছে, কেহ সংকল্প করিয়া লক্ষ নাম জপ করিতেছে, কেহ

নৈবেদ্যসজ্জা করিতেছে, ঘরে ঘরে ঠাকরুণ প্রতিষ্ঠিত আছেন, গৃহস্থ পুত্রকলত্রাদি লইয়া যেরূপ বিব্রত, সেই গৃহদেবতাকে হইয়াও বিব্রত, তাঁহার সেবা এবং পরিচর্যার জন্য বরং তাহাকে বেশী ভাবিতে হয়। ভগবানকে এরূপ গৃহের গণ্ডীতে আনিয়া অপরিহার্য অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে আর কোথায় দেখা যায়? কোটি কোটি কণ্ঠের 'মা' 'মা' শব্দ, কোটি কোটি হস্তের পুষ্পাঞ্জলি জগন্মাতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইতেছে।"

ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেবমন্দির— এই উক্তি সদ্য-উপবীতধারী কিশোরমনে একটি উজ্জ্বল বর্ণরঞ্জিত ছবি এঁকে দিত। আমাদের আধা-গ্রাম আধা-শহরের প্রান্তে যে অদ্বিতীয় হংসেশ্বরী মন্দির আছে, তার সঙ্গে এই ছবি একাত্ম হয়ে যেত।

ঐ ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন :

"এই ধর্মকথায়ই আমাদের ঐক্য। সেদিন অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে যে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইয়াছিল, কে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। কুম্ভমেলার সেই সিন্ধুতরঙ্গের ন্যায় অগণিত যাত্রীর দল কাহার চেষ্টায় একত্র হইয়া থাকে।"

প্রয়াগের কুম্ভ মেলা দেখি নি, হরিদ্বারের কুম্ভমেলা দেখেছি। আর মুক্তবেণী ত্রিবেণীতে অর্দ্ধোদয় যোগের মেলা, শ্রাবণী পূর্ণিমার মেলা কতোবার দেখেছি! গঙ্গার ধারে সেই রাস্তা দিয়ে জুটমিল আর দরাপ খাঁ গাজীর সমাধি পেরিয়ে ত্রিবেণীতে কতো দিন বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় গিয়েছি!

দরাপ খাঁ গাজীর এই গঙ্গা-স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে দফর খানের সমাধি দেখেছি—

সুরধুনি মুনিকন্যে, তারয়েঃ পুণ্যবন্তং—
স তরতি নিজপুণ্যৈস্— তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি তু গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপনাং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং— তন্মহত্তবং মহত্ত্বম্।।

সমস্তটা মিলিয়ে যে অনুভূতি, 'পৌরাণিকী' আর 'রামায়ণীকথা'য় তার সমর্থন পেয়ে সেদিন উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেম আর সে-কারণেই বারবার এই বইদুটির কাহিনীগুলি পড়েছি। স্কুলের উঁচুক্লাসে সংস্কৃত ভাষাচর্চার যে উন্মাদনা ছিল, তাও পরিপুষ্ট হয়েছিল 'রামায়ণী কথা'য় উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকনিচয়ে।

মনে পড়ে দীনেশচন্দ্রের 'বেহুলা' (পৌরাণিকী) পড়ে চোখে জল এসে গিয়েছিল।

গাঙ্গুড়ের জলে বেহুলার ভেলা ভেসে চলেছে—এই ছবিখানি দীনেশচন্দ্র অশেষ নৈপুণ্যে এঁকেছেন— কতবার মনে করেছি আর ঐ বর্ণনা পড়ব না, কিন্তু অসংখ্যবার সে সংকল্প ত্যাগ করে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তা পড়েছি।

"তখন অপরাহ্ন— চম্পক-নগরের লোক গাঙ্গুড়ের কূলে ধরে না, লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তাহাদের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত ও তাহারা গদগদকণ্ঠ। তাহারা বলিতেছে, 'বুদ্ধিহীন তরুণী জননী, আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইও না। তোমার স্বামী নাই, কিন্তু চম্পকবাসী আমরা তোমার সন্তান, আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইও না।' সনকা উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বলিতেছে, 'আমার

সাবিত্রী, ঘরে ফিরিয়া এস, আমি লখার শোক তোমাকে দেখিয়া ভুলিব।' গ্রামান্তর হইতে লোকেরা আসিয়া দেখিতেছে— স্বামীর শবের পার্শ্বে স্থির সৌদামিনীর মত সাধ্বী বসিয়া আছেন, গাঙ্গুড়ের জলে ভেলা ভাসিয়া যাইতেছে, লোকে বলিতেছে, ' আমরা সতী সাবিত্রীর কথা পুরাণে শুনিয়াছি। ঐ দেখ, তাঁদের একজন নগরে প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।'

গাঙ্গুড়ের তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া ভাসিয়া ভেলাখানি যাইতেছে, বেহুলা ভাবিতেছেন, যে দেশে মৃত্যু নাই, সেই দেশ হইতে তিনি স্বামীর জীবন আনয়ন করিবেন।

শোকোন্মত্তা মাতা সনকা কোনক্রমেই নদীতীর ছাড়েন না, ধূলায় পড়িয়া আছাড়ি পাছাড়ি খাইতে লাগিলেন।....

দেখিতে দেখিতে বেহুলা, শব ও ভেলা নদীর তরঙ্গে সুদূরে চলিয়া গেল।....

ও কে যায়! গাঙ্গুড়ের জলে ভেলায় ভাসিয়া মৃত স্বামীকে অঙ্গে রাখিয়া কে যায়! জীবন-সঙ্গিনী অনেক দেখিয়াছ, মরণ-সঙ্গীকে একবার দেখ। সধবার মাথায় সিন্দূর অনেক দেখিয়াছ, বিধবার মাথায় সিন্দূর দেখিয়া যাও। এই ঘোর নদীর জল—প্রভাতের সূর্য সেই সিন্দূর-বিন্দু উজ্জ্বল করিতেছে, এই ঘোর নদী-জল— সন্ধ্যার আঁধারে নক্ষত্রের ম্লান জ্যোতিতে বেহুলার দেহ ঈষদুদ্ভাসিত হইতেছে।"

'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে ভক্ত পূজারী অ্যাখ্যা দিয়েছেন। রামায়ণের সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়ে আসছে, দীনেশচন্দ্র সেই হৃৎস্পন্দনকে বাংলা গদ্যভাষায় আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

উপেন্দ্রকিশোর মারফৎ রামায়ণের গল্পের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তারপর কৃত্তিবাস। তারপরই দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণী কথা'। দীনেশচন্দ্র দশরথ, রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা, হনুমান ও বালির চরিত্র চিত্রণ করেছেন। এই চরিত্রশালায় প্রবেশ করে সেদিন যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেম, আজো তেমনি মুগ্ধ হই। এর মধ্যে দশরথ, রামচন্দ্র, ভরত ও সীতার আলেখ্য মারফৎ দীনেশচন্দ্র সেদিন আমাকে কিনে নিয়েছিলেন। সাধু বাংলা গদ্যভাষার ধ্বনিরোল, অনায়াসগতি স্টাইল আর মূল রামায়ণের শ্লোকের সাহায্যে দীনেশচন্দ্র 'রামায়ণী কথা'র পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন।

দীনেশচন্দ্র ছবির পর ছবি এঁকে রামায়ণের আলেখ্যদর্শন করিয়েছেন। মনে পড়ে সেদিন এই চিত্রশালায় প্রবেশ করে আমি মুগ্ধ অভিভূত হয়েছিলেম। কয়েকটি ছবি আমার স্মৃতিপটে চিরবিলগ্ন হয়ে আছে।

প্রথম ছবি রোরুদ্যমান রাজকুমার ভরত ও চীর-বাসপরিহিত বনবাসী রামচন্দ্রের মিলন-দৃশ্য :

" চিত্রকূটের মনোহর শৈলমালা পরিবৃত প্রদেশে শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ বৃক্ষের পত্র ও কাণ্ড দ্বারা লক্ষ্মণ মনোরম পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন। মন্দাকিনীর তরঙ্গাভিঘাত শব্দ সেই স্থানে মন্দীভূত হইয়া শ্রুত হইত, রামচন্দ্র সেই বন্যবাটিকায় ভ্রাতা ও পত্নীর সঙ্গে বাস করিয়া সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। এই সময় মহতী সৈন্যমালা ও আত্মীয় সুহৃদ্বর্গ পরিবৃত হইয়া ভরত

তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিলেন।.....

নগ্নপদে জটাচীরধারী অনুগত ভৃত্যের ন্যায় চির-বৎসল ভরত আসিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে— 'ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি।' ' আপনার এই ভ্রাতা, শিষ্য ও সেবকের প্রতি প্রসন্ন হউন' বলিতে বলিতে উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া রামের পদতলে পতিত হইলেন। ভরতের মুখ শুষ্ক, লজ্জা ও মনস্তাপে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র অশ্রুপূরিত চক্ষে স্নেহের পুত্তলী ভরতকে ক্রোড়ে লইলেন ও কত স্নিগ্ধ সম্ভাষণে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্বক আদর করিতে লাগিলেন। ভরত দেখিলেন, সত্যব্রত রামচন্দ্রের দেহ হইতে দিব্য জ্যোতিঃ স্ফূরিত হইতেছে। তিনি স্থণ্ডিল-ভূমিতে আসীন, তথাপি তাঁহাকে সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র অধিপতির ন্যায় বোধ হইতেছে , তাঁহার দুইটি পদ্মপ্রভ চক্ষু উজ্জ্বল, জটা ও চীর পরিয়া আছেন, তথাপি, তাঁহাকে পবিত্র যজ্ঞাগ্নির ন্যায় দৃপ্ত হইতেছিল। ধর্মাচারী ভ্রাতা যেন রাজ্য ত্যাগ করিয়াই প্রকৃত রাজাধিরাজ সাজিয়াছেন। এই দেবপ্রভব অগ্রজের পদতলে পড়িয়া আর্তা রমণীয় ন্যায় ভরত কত স্নেহার্দ্র কথা বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের সংবাদ আদিকবির অতুল তুলিসম্পতে চিরউদার ও চিরকরুণ হইয়াছে।"

দ্বিতীয় ছবি পম্পাতীরে সীতাবিরহোন্মত্ত রামচন্দ্রের সকরুণ আলেখ্য :

"পম্পাতীরবর্তী স্থান বড় রমণীয়; তখন হ্রদকূলস্থ বনরাজির অঙ্গে অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন নব বাস পরাইয়া বসন্ত আগমন করিয়াছে। দূরে ঋষ্যমূকের শৃঙ্গ কৃষ্ণচ্ছায়া মেঘের সঙ্গে মিশিয়া আছে। গিরিসানুদেশ হইতে নিম্ন সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বনরাজির মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য কর্ণিকার বৃক্ষ পুষ্পসংচ্ছন্ন হইয়া পীতাম্বর-পরিহিত মনুষ্যের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। শৈলকন্দর-নিঃসৃত বায়ু পম্পার পদ্মরাজি চুম্বন করিয়া রামচন্দ্রের দেহ স্পর্শ করিল, সেই পদ্মকোষনিঃসৃত গন্ধবহ বায়ুর স্পর্শে শ্রীরামচন্দ্র মনে করিলেন— 'নিশ্বাস ইব সীতয়া বাতি বায়ুর্মনোহরং।' সিন্ধুবার ও মাতুলুঙ্গ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, কোবিদার, মল্লিকা ও করবী পুষ্প বায়ুতে দুলিতে ছিল, শিখী শিখিনীর সঙ্গে ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছিল, দাত্যুহ করুণকণ্ঠে ডাকিতেছিল, তাম্রবর্ণ পল্লবের অভ্যন্তরলীন রাগরক্ত মধুকর উড়িয়া সহসা কুসুমান্তরে প্রবিষ্ট হইতেছিল। অঙ্কোল, কুরুন্ট ও চূর্ণক বৃক্ষ পম্পাতীরের প্রহরীর ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। রামচন্দ্র এই প্রকৃতির সৌন্দর্যে আত্মহারা হইয়া সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন।

'শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী মৃদু-ভাষা চ মে প্রিয়া।'

'তিনি বসন্তাগমে নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। ঐ দেখ, লক্ষ্মণ, কারণ্ডব পক্ষী শুভ সলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় কান্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। আজ যদি সীতার সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইত, তবে অযোধ্যার ঐশ্বর্য কিংবা স্বর্গও আমি অভিলাষ করিতাম না। এখানে যেরূপ বসন্তাগমে ধরিত্রী হৃষ্টা হইয়াছেন, যে স্থানে সীতা আছেন, সেখানেই কি বসন্তের এই লীলাভিনয় হইতেছে? তিনি তাহা হইতে যেন কত পরিতাপ পাইতেছেন! এই পুষ্পবহ, হিমশীতল বায়ু সীতাকে স্মরণ করিয়া আমার নিকট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বোধ হইতেছে।

'পশ্য লক্ষ্মণ পুষ্পাণি নিষ্ফলানি ভবন্তি মে।' এই বিশাল পুষ্পসম্ভার আজ আমার নিকট

বৃথা! আমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে, বিদেহরাজকে কি বলিব? সেই মৃদুহাসির অন্তরালব্যক্ত চিরহিতৈষিণীর অতুলনীয় কথাগুলি শুনিয়া আর কবে জুড়াইব? লক্ষ্মণ, তুমি ফিরিয়া যাও, আমি সীতাবিরহে প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।"

তৃতীয় ছবি রমণীয় চিত্রকূটের আলেখ্য। মহাকবির পদাঙ্কানুসরণে দীনেশচন্দ্র চিত্রকূটের যে রমণীয় চিত্র অংকন করেছেন তা আমার কণ্ঠস্থ ছিল।

"তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আম্র ও লোধ্রদল পক্ক হইয়া শাখাগ্রে দুলিতেছিল। চিত্রকূটের কোনো অংশ ক্ষত-বিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধূসর, নিম্ন অধিত্যকাভূমি পুষ্পসম্ভারে প্রমোদউদ্যানের ন্যায় সুন্দর,কোথাও পর্বতগাত্র হইতে একটি শৈলশৃঙ্গ ঊর্ধ্বে উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়া আছে— অদূরে মন্দাকিনী-- কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেখার প্রান্তে বিলীয়মান। তরঙ্গরাজি সুন্দরীর পরিত্যক্ত বস্ত্রের ন্যায় বায়ু কর্তৃক ঘন আন্দোলিত হইতেছিল। কোথাও পার্বত্য ফুলরাশি স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতেছিল।"

এই সব রমণীয় আলেখ্য দেখিয়ে দীনেশচন্দ্র সেদিন এক মুগ্ধ কিশোরকে রামায়ণের করুণ-নিপুণ সৌন্দর্যলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' ও রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' ছাড়া আর কোনো তৃতীয় গদ্যগ্রন্থ 'রামায়ণী কথা'র পাশে দাঁড়াতে পারে না। ভক্ত পূজারী দীনেশচন্দ্র রামায়ণকে পবিত্র দেবস্থান বলে জেনেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেবমন্দির, তাঁর ভাষা সেই মন্দিরের স্নিগ্ধগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির মতো বেজে উঠেছে। বস্তুতঃ সেদিন সদ্যউপবীতধারী কিশোরের সামনে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যে অননুভূতপূর্ব অনুভূতিলোকের দ্বার উদঘাটিত হয়েছিল, দীনেশচন্দ্রের গদ্যরচনা সেদিন তার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছিল। তাই 'পৌরাণিকী' ও 'রামায়ণী কথা' আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তথাগতের পথে

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার বয়স তখন সাত। রংপুরে সন্ধ্যের পর বাবা আমাদের তিন ভাই-বোনকে গল্প শোনাতেন। রূপকথা ভূত প্রেত দত্যিদানোর গল্প নয়, পঞ্চতন্ত্র আর জাতকের গল্প ইংরেজি থেকেই তাঁর মুখে প্রথম শুনেছিলাম। কাউয়েল-অনূদিত 'দি জাতকস্' বই থেকে তিনি গল্প শোনাতেন। ইংরেজি গল্প মুখে মুখে বাবা বাংলায় বলে যেতেন, সেই সঙ্গে পালি ভাষায় শ্লোক আবৃত্তি করতেন। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে, সুযোগ পেলেই সেগুলি আবৃত্তি করে পাণ্ডিত্য জাহির করতাম। এখন সে-কথা ভেবে সেই কিশোরকে করুণা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মনে মনে জানি, তথাগত সম্পর্কে প্রথম অনুরাগ সেদিনই অর্জন করেছিলেম।

তথাগতের সেই অমৃত-বাণী কোনোদিন ভুলতে পারি না—

সব্ব পাপস্‌স অকরণম্

কুসলস্‌স উপসম্পদা,

সচিত্ত পরিয়োদপনম্,
এতং বুদ্ধানসাসনম্।'

তখন শ্লোকের অর্থ বুঝি নি, বুঝবার ক্ষমতাও ছিল না। ভালো লেগেছিল পালি ভাষার মধুর ঝঙ্কার। সর্ববিধ পাপ থেকে সতত বিরতি, পুণ্যসঞ্চয়ে সদা আসক্তি, সযত্নে আপন চিত্তমার্জনা— এই শিক্ষাই বুদ্ধগণ দিয়ে থাকেন। শাস্তার উপদেশের এই অর্থ আজ জানি মাত্র। কিন্তু এই পথে আজো যেতে পারলাম না।

সেদিন পালি ভাষা বুঝি নি। বহুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় পালিভাষার সঙ্গে পরিচয় হল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক গোকুলদাস দে যখন এম এ ক্লাসে পালিভাষার প্রথম পাঠ দিলেন, তখন বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ে গেল রংপুরে শোনা সেই সব পালি শ্লোক। মনে পড়ে গেল সে ত্রিশরণ মন্ত্র—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

মনে পড়ে গেল বাবার মুখে শোন সেই বুদ্ধ-প্রণাম মন্ত্র—

বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধবরঞাণ লাচনো,
লোকস্স পাপপ্কি সঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং।

রংপুরের কৈশোর-স্বর্গ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার অনেক পরে চারুচন্দ্র বসুর ধম্মপদ (অনুবাদ), বিজয়চন্দ্র মজুমদারের থেরীগাথা (অনুবাদ), ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতক (অনুবাদ) পড়েছি। পরীক্ষার তাগিদে পালি ভাষার ব্যাকরণ পড়েছি আর সেই সূত্রে জাতক-কাহিনী নতুন করে পড়েছি। মনে পড়ে, জাতকের গল্প বাবা শুরু করতেন এই পালি বাক্যটি বলে—

অতীতে বারাণসিয়াম্ ব্রহ্মদত্তে রাজ্জং কারেন্তে।

আমরা এই লাইনটি মুখস্থ করেছিলাম। গল্পের সূত্রপাতে আমরা তিন ভাই বোন সমস্বরে আবৃত্তি করতাম—

অতীতে বারণসিয়াম্ ব্রহ্মদত্তে রাজ্জং কারেন্তে।

সেদিন আমার পালি-বিদ্যা ঐ পর্যন্তই ছিল— এই বাক্যের অর্থটি আমার জানা ছিল— পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। পরে জেনেছি ৫৪৭ টি জাতকের মধ্যে ৩৭২ টির ঘটনা বারাণসীতে সংঘটিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন জাতকে বর্ণিত হয়েছে। বড় হয়ে আরো জেনেছি, জাতক প্রাচীনতম গল্পকথা। গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, বাণের হর্ষচরিত, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎ কথামঞ্জরী, সোমদেবের

কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ জাতকের পরে সংকলিত হয়েছিল। এদেশের বেতালপঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ, আরব দেশের বিদ্‌পাই-এর গল্প ও নৈশোপাখ্যানমালা, য়ুরোপের ডেকামেরন্‌, পেন্টামেরন, হেপ্টামেরন, ক্যান্টারবারি টেলস্‌ প্রভৃতি গল্প-সংকলনে জাতকের গল্প খুঁজে বার করা কঠিন নয়। এমন কি ঈশপের গল্পে জাতকের অনেক গল্প স্থান পেয়েছে, তা জেনেছি : অন্তত আঠারো উনিশটি ঈশপের গল্পের মূল পাওয়া যায় জাতকের গল্পে। সুতরাং জাতকের গল্প সারা পৃথিবীর গল্পের উৎস। খ্রিস্টজন্মের অন্তত চার শ বছর আগে তা সংকলিত ও প্রচারিত হয়। করুণাময় তথাগত নিজ মুখে বহু গল্প বলেছেন, কিছু বলেছেন তাঁর শিষ্যরা। জাতকের গল্প বৌদ্ধদের কাছে নিছক গল্প নয়, ধর্মকাহিনী। সিংহলদেশে দিনান্তে বিশ্রামকালে জাতকের গল্পস্মরণ নিষ্ঠাবান বৌদ্ধের ধর্মাচরণীয় নিত্যকর্ম।

জাতকের গল্পে খ্রিস্টপূর্বকালের ভারতবর্ষের জনজীবনের সুন্দর ছবি দেখি। সেদিনে আর্যাবর্তে ছয়টি নগর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, জাতকের গল্পে বারবার তাদের উল্লেখ পাই— চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, বারাণসীর উজ্জ্বল রঙীন ছবিগুলি সেই সম্পন্ন-অতীত আর্যাবর্তের পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরে। যেদিন প্রথম জাতকের গল্প শুনি, সেদিন এত কথা নিশ্চয়ই বুঝি নি, কিন্তু গল্পের প্রবল আকর্ষণে এইসব জনপদ ও জনজীবনকে ভালোবেসে ছিলেম।

উত্তরজীবনে এই ভালোবাসায় ছেদ পড়ে নি, উত্তরোত্তর তা বেড়েছে। পালিভাষার ঝঙ্কার ও জাতকের গল্পরসের আকর্ষণ বারবার আমাকে মোহাবিষ্ট করেছে। কতো অসংখ্য জাতক, কতো সুন্দর নাম, কতো সমৃদ্ধ উপাখ্যান,মানবজীবনের কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

শাস্তা কখনো রাজগৃহের নিকটবর্তী জীবকাম্রবনে, কখনো শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী জেতবনে, কখনো বা কপিলবস্তুর উপকণ্ঠে ন্যাগ্রোধারামে শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হয়ে এই গল্পগুলি বলেছিলেন। তারপর কতোদিন চলে গেছে, কতো রাজ্য ও নগরের উত্থান ও পতন হয়েছে, কতো মানুষের জন্ম ও মৃত্যু ঘটেছে। এই ভারতভূমির কতো পরিবর্তন হয়েছে, তবু এইসব অপূর্ব সুন্দর কাহিনী আজো রয়েছে। উনিশ শতকের ভারতবিদ্যাপথিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ এইসব কাহিনীর সৌন্দর্যে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

আজ নতুন করে জাতকের গল্প পড়ছি। আর সেই ফেলে-আসা কৈশোরদিনের কথা মনে হচ্ছে। সেদিন জাতকের গল্প শুনে যে আনন্দ পেয়েছিলেম, সে আনন্দ আজো আছে। তার প্রকারভেদ হয়েছে কিন্তু জাত বদলায় নি। আজ ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতক পড়ে সেই আনন্দকে নতুন করে ফিরে পাই।

ইচ্ছে করে একটি একটি করে গল্প পাঠককে শোনাই। তা সম্ভব নয়, তবু মনে হয় আমার মতো অনেকেই আছেন যারা নতুন করে জাতকপাঠের আনন্দ ফিরে পেতে চান। তাদেরই জন্য এই স্মৃতিরোমন্থন।

মৎস্যজাতকের সূচনাটি খুব সুন্দর।

একবার কোশলরাজ্যে অনাবৃষ্টিতে শস্য বিনষ্ট ও জলাশয় শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। জেতবনের দ্বারে যে পুষ্করিণী ছিল তাও শুষ্ক হয়ে যায়। কাদার মধ্যে কচ্ছপ মাছ লুকিয়ে ছিল, কাক ও শ্যেন তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে কাদা থেকে তাদের ধরে আহার করত। কচ্ছপ মাছের এই কষ্ট ও প্রাণহানি দেখে করুণাঘন তথাগতের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হল। তিনি বললেন, — 'আমি আজকেই বারিবর্ষণ করাব।' রাত্রিশেষে তিনি প্রাতঃকৃত্যঅন্তে শ্রাবস্তী নগরীতে ভিক্ষা সংগ্রহে গেলেন। ফিরে এসে তিনি ঐ শুষ্ক পুষ্করিণীর সর্বোচ্চ সোপানে দাঁড়িয়ে শিষ্যকে বললেন, 'আনন্দ, আমার বস্ত্র আনো, আমি এখানেই স্নান করব।'

'প্রভো, এখানে কী করে স্নান করবেন? জল শুকিয়ে গিয়েছে।'

'না, আমি এখানেই স্নান করব,তুমি স্নানবস্ত্র আনো।'

তখন শাস্তা স্নানবস্ত্র পরিধান করে সর্বোচ্চ সোপানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি এখনই জেতবনের পুষ্করিণীতে স্নান করব।'

সেই মুহূর্তে স্বর্গে শক্রের শিলাসন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তিনি কারণ জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ মেঘরাজকে আদেশ করলেন, 'এখনি কোশলে বারিবর্ষণ করো।'

এবং সেই মুহূর্তে কোশলরাজ্যের পূর্ব আকাশে মেঘ দেখা দিল, তা অচিরাৎ সহস্রগুণ হয়ে উঠল, তা বিদ্যুৎস্ফূরণ ও গর্জন করে উঠল ও মুহূর্তমধ্যে প্রবল বেগে বারিবর্ষণ শুরু হল। সমগ্র কোশলরাজ্য স্নাত ও তৃপ্ত হল। যতক্ষণ না সেই পুষ্করিণীর বারি সর্বোচ্চ সোপানে উঠল, ততক্ষণ বারিবর্ষণ বন্ধ হল না। তখন বুদ্ধদেব স্নান করলেন, গন্ধকুটীরে ফিরে এসে ভিক্ষুদের ধর্মোপদেশ দিলেন।

সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুরা ধর্মসভায় সমবেত হয়ে তথাগতের অলৌকিক ক্ষান্তি ও দয়াদাক্ষিণ্যের কথা আলাচনা করছিলেন। এমন সময় ভগবান বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, অতীত জন্মে যখন তিনি মৎস্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তখনও তিনি এরূপ বিস্ময়কর কাজ করেছিলেন।

তখন সমবেত ভিক্ষুদের কাছে শাস্তা মৎস্যজাতক-কাহিনী বর্ণনা করলেন।

"এই কোশলরাজ্যে এবং এই শ্রাবস্তী নগরে, যেখানে এখন জেতবন-সরোবর রহিয়াছে সেইখানে লতাবিতানপরিবৃত একটি সরোবর ছিল। বোধিসত্ত্ব মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সরোবরে বাস করিতেন। বর্তমান সময়ের ন্যায় তখনও অনাবৃষ্টি বশত তড়াগাদি জলহীন হইয়াছিল, মৎস্যকচ্ছপগণ পঙ্কের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল, তখনও কাক প্রভৃতি পক্ষিগণ আসিয়া পঙ্কমধ্যগত মৎস্যদিগকে তুণ্ড দ্বারা তুলিয়া উদরসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। জ্ঞাতিবন্ধুগণ বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, আমি ভিন্ন অন্য কেহই ইহাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অতএব আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া শপথপূর্বক বারিবর্ষণ করাইব, তাহা হইলে ইহাদের দুঃখ মোচন হইবে।এই সংকল্প করিয়া তিনি কৃষ্ণবর্ণ কর্দম ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। তাহার বিশাল দেহ কজ্জললিপ্ত চন্দকাষ্ঠনির্মিত পেটিকাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক পর্জ্জন্যদেবের উদ্দেশে বলিতে

লাগিলেন 'পর্জ্জন্য! আমি জ্ঞাতিগণের দুর্দশায় দুঃখিত, ইহা দেখিয়াও তুমি যে বারিবর্ষণ করিতেছ না, এ বড় আশ্চর্যের বিষয়। আমি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একে অপরের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি কখনও তণ্ডুলপ্রমাণ মৎস্যও উদরস্থ করি নাই অন্য কোন জীবেরও প্রাণহানি করি নাই। যদি আমার এই শপথ সত্য হয় তবে তুমি এখনই বারিবর্ষণ করিয়া আমার জ্ঞাতিগণকে বিপন্মুক্ত কর।' এইরূপে প্রভু যেমন ভৃত্যকে আদেশ করে, বোধিসত্ত্বও সেইরূপ দেবরাজ পর্জ্জন্যকে আদেশ দিয়া এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :

এস হে পর্জ্জন্য, কর গরজন,
কাকের আশায় পড়ুক ছাই;
কর কর তুমি বারি বরষণ,
বাঁচুক আমার জ্ঞাতিবন্ধুভাই।

এইরূপ, প্রভু যেমন ভৃত্যকে আদেশ করেন, বোধিসত্ত্বও সেই ভাবে পর্জ্জন্যকে আদেশ দিলেন। তখন প্রচুর বৃষ্টি হইল, বহু প্রাণী মরণভয় হইতে পরিত্রাণ পাইল। কালক্রমে বোধিসত্ত্বের জীবন শেষ হইল, তিনি কর্মানুরূপ ফললাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।" (ঈশানচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ, জাতক, প্রথম খণ্ড)

জাতকের এইসব কাহিনীতে সর্বজীবে দয়া ও আত্মভাব, স্নেহ ও করণা যেমন প্রদর্শিত হয়েছে, দুরূহ ধর্মতত্ত্ব তেমনি সহজ ভাষায় সর্ববোধগম্য করা হয়েছে। জাতককাহিনীতে সত্যচতুষ্টয় বর্ণিত হয়েছে : দুঃখ, দুঃখসমুদয় , দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধ-মার্গ। এই চার আর্যসত্য সেদিন বুঝি নি, অজো বুঝি না, তবে এ কথা বুঝি, এই জীবনপথে জাতককাহিনী আমাদের অনেক দুঃখ ক্লেশ নিবারণে সাহায্য করে। বুদ্ধ-কথিত অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ আমার সাধ্য নয়। সম্মা দিট্‌ঠি, সম্মা সঙ্কপ্পো, সম্মা বাচা, সম্মা কম্মন্তো, সম্মা আজীবো, সম্মা বায়ামো, সম্মা সতি ও সম্ম সমাধির কথা জ্ঞানে জানি মাত্র, তা অধিগত করতে পারিনি। তবু জাতক-কাহিনীতে জেনেছি দুঃখের ভোগের কারণ যে তৃষ্ণা, তা দমনের উপায় এই অষ্টাঙ্গিক-মার্গ।

জাতককাহিনীতে মানুষকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে সে সম্মান আর কোনো শাস্ত্র দেন নি। বৌদ্ধধর্ম বলে, যিনি এ যুগে বুদ্ধ, তিনি অতীত যুগে মৃগ, মর্কট, মৎস্য বা কূর্ম ছিলেন; যে এ যুগে মৃগ বা মর্কট সেও ভবিষ্যদ্‌যুগে পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়ে দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করবে। করুণাঘন শাস্তার অনুগ্রহে একদিন আমরাও নির্বাণ লাভ করব; এই পরম আশ্বাস জাতকাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে।

আজ অনেক সময় মনে হয়, জাতককাহিনী আমার পরম আশ্রয়। শোকে দুঃখে গ্লানিতে যখন আচ্ছন্ন হই, প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা মাৎসর্যের আক্রমণে যখন অভিভূত হই, বন্ধুবিচ্ছেদ আশাভঙ্গ বৈফল্যে যখন তাড়িত হই, তখন বার বার মনে হয় জাতককাহিনীই আমাকে রক্ষা করবে।

জাতককাহিনী আধুনিকের চেয়েও আধুনিক। একালের মানুষের জীবনসমস্যার

কাহিনীরূপ এর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। মনে পড়ে ছোটবেলায় শৃগালজাতক, বকজাতক, কটাহ্জাতক, ভীমসেন-জাতক শুনে ভালো লাগত। আর আজ কুদ্দাল-জাতক, শিবিজাতক, বিশ্বম্ভর-জাতক, মহাস্বপ্ন-জাতক আমার মনের অনেক সংশয় অপনোদন করে।

কুদ্দাল-জাতক কাহিনী পড়ে আমাদের আধুনিক মনে ধাক্কা লাগে। জেতবনে শাস্তা সান্ধ্য ধর্মসভায় ভিক্ষুদের বলেছিলেন :

"ভিক্ষুগণ, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্ত লঘু ও দুর্দমনীয়। বিষয়বাসনা এরূপ চিত্তকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখে। চিত্ত একবার আবদ্ধ হইলে সহসা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এরূপ চিত্তের বশীকরণ অতীব প্রশংসার্হ ও বশীভূত হইয়া ইহা পরম সুখাবহ ও কল্যাণসাধক হয়।

বিষয়ীর চিত্ত রিপু-পরায়ণ,
অসার বিষয়ে রত অনুক্ষণ।
হেন চিত্ত যেই বশীভূত করে,
প্রশংসা তাহার করে সব নরে।
চিত্তের দমন সুখের কারণ,
কল্যাণ তাহাতে লভে সর্বজন।

চিত্তের এই দুর্দমনীয়তাবশত পণ্ডিতেরাও লোভপরবশ হইয়া একখানি কুদ্দাল পর্যন্ত ফেলিয়া দিতে পারেন নাই এবং সেই সামান্য বস্তুর মায়ায় ছয় বার প্রব্রজ্যা পরিত্যাগপূর্বক সংসারী হইয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তমবারে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তাঁহারা ধ্যানফল লাভ করিয়া ছিলেন এবং লোভ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।'

এই কথা বলে তথাগত কুদ্দাল-জাতক গল্পটি বললেন :

"বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পর্ণিককুলে জন্মগহণ পূর্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর 'কুদ্দাল পণ্ডিত' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি কুদ্দাল দ্বারা একখণ্ড ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে শাক, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি উৎপাদন করিতেন এবং সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। সংসারে সেই একখানি কোদালি ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন সম্বল ছিল না। একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'গৃহে থাকিয়া আমার কি সুখ? আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব।'

এই সংকল্প করিয়া তিনি কোদালিখানি লুকাইয়া রাখিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বোধিসত্ত্বের মনে সেই ভোঁতা কোদালির লোভ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি পুনরায় সংসারে আসিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিতে লাগিল,— তিনি ছয়বার কোদালি লুকাইয়া রাখিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং ছয় বারই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর সপ্তমবার তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লগিলেন : 'আমি এই কুণ্ঠ কুদ্দালের মায়াতেই পুনঃ পুনঃ গৃহে আসিতেছি, এবার ইহা মহানদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রব্রজ্যা লইব।' তখন তিনি নদীতীরে গিয়া পাছে কুদ্দালের পতনস্থান দৃষ্টিগোচর হইলে প্রত্যাবর্তন পূর্বক উহা উদ্ধার করিবার ইচ্ছা হয় এই আশঙ্কায়, চক্ষুদ্বয় নিমীলন করিলেন,

বাঁট ধরিয়া হস্তিসমবলে মস্তকোপরি তিনবার ঘুরাইয়া কুদ্দালখানি নদীর মধ্যভাগে নিক্ষেপ করিলেন এবং 'আমি জিতিয়াছি! আমি জিতিয়াছি!' বলিয়া তিনবার সিংহনাদ করিলেন।

ইতঃপূর্বে বারাণসীরাজ্যে প্রত্যন্তবাসী প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহাদিগকে দমন করিয়া বারণসীপতি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। দৈবগতা ঐ সময়ে তিনি সেই নদীতরেই অবগাহনপূর্বক সর্বালঙ্কারভূষিত এবং গজস্কন্ধারূঢ় হইয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময় বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি বলিলেন, 'এ লোকটা 'জিতিয়াছি জিতিয়াছি' বলিতেছে। কাহাকে জিতিল? উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ত।'

বোধিসত্ত্ব উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'ভদ্র,আমি সংগ্রামের বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিতেছি। তুমি কিসে বিজয়ী হইলে?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, যদি চিত্তনিহিত রিপুগণকে জয় করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ সংগ্রামে জয়লাভ করাও বৃথা। আমি আজ লোভদমনপূর্বক রিপুজয়ী হইয়াছি।' ইহা বলিতে বলিতে তিনি মহানদী অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং জলকৃৎস্ন ধ্যান করিয়া তত্ত্বদর্শী হইলেন। তখন তাঁহার লোকাতীত ক্ষমতা জন্মিল, তিনি আকাশে আসীন হইয়া রাজাকে নিম্নলিখিত গাথায় ধর্মশিক্ষা দিলেন :

সে জয়ে কি ফল, পশ্চাতে যাহার আছে পরাজয়ভয়?
যে জয়ের কভু নাই পরাজয়, সেই সে প্রকৃত জয়।

ধর্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে রাজার মোহান্ধকার দূর এবং রিপুনিচয় প্রশমিত হইল। তাঁহার রাজ্যাভিলাষ দূরে গেল, প্রব্রজ্যালাভের বাসনা জন্মিল। তিনি বোধিত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ' আপনি এখন কোথায় যাইবেন?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আমি এখন হিমাচলে গিয়া তপস্বিভাবে বাস করিব।' 'তবে আমিও প্রব্রাজক হইব' বলিয়া রাজাও বোধিসত্ত্বের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজার সমস্ত সৈন্য এবং সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণাদি অপর সকলেও তাঁহার অনুগামী হইলেন।' (ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, প্রথম খণ্ড)।

মানুষ পঞ্চবন্ধন বা পঞ্চ ক্লেশ ভোগ করে অর্থাৎ লোভ, দোষ (ক্রোধ বা ঘৃণা), মোহ মান এবং ঔদ্ধত্য দ্বারা তাড়িত হয়। বাসনা থেকে যতক্ষণ মুক্তি না ঘটছে ততক্ষণ মানুষ এই পঞ্চবন্ধন যাতনা ভোগ করে। মুক্তি কোন পথে? বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি ও সঙঘানুস্মৃতি— এই ত্রিবিধ কর্মস্থান (ধ্যানের বিষয়) মারফৎ মানুষ মুক্তিপথে অগ্রসর হয়। এ'সব কথা বৌদ্ধদর্শন ও পালি সাহিত্য পড়তে গিয়ে জেনেছি। আরো জেনেছি যে, বুদ্ধ-ভক্তেরা স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামিমার্গ, সকৃদাগামিফল, অনাগামিমার্গ, অনাগামিফল, অর্হত্ত্বমার্গ ও অর্হত্ত্বফল লাভ করে নির্বেদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারের অসারতা উপলব্ধি করেন এ সংসারে তাঁদের বিরক্তি (বৈরাগ্য) জন্মে, পরিশেষে, তাঁরা নির্বাণ লাভ করেন। আরো জেনেছি ভগবান তথাগত জগতের সংশয় নিরাকরণের জন্যই কোটি কল্পকাল দানাদি দশপারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা সর্বজ্ঞত্ব বা বোধি লাভ করেছিলেন। দশ পারমিতার অর্থ যে দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য (সংসারত্যাগ), বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান

(দৃঢ়সংকল্প), মৈত্রী ও উপেক্ষা (বাহ্যবস্তুতে অনাস্থা) -- একথাও জেনেছি। কিন্তু এ কেবল জ্ঞানে জেনেছি, উপলব্ধি করি নি। জানি না, কোনোদিন কর্মস্থান, অর্হত্ত্ব, নির্বাণ, বোধি, নির্বেদ ও দশ পারমিতা বুঝতে পারব কিনা!

আপাতত জাতকাহিনী আমার আশ্রয় । কৈশোরে জাতকের গল্প শুনে খুশি হয়েছি। আজো সে কাহিনী পড়ছি। আজ আর কেবল গল্পের আকর্ষণ নয়, সেইসঙ্গে মানবজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সারাৎসার আমাকে আকৃষ্ট করে। আজ জাতকের গল্প পড়ে যুগপৎ আনন্দিত ও বিষণ্ণ হই। বহুবার এইসব কাহিনী পড়েছি, আরো বহুবার তা পড়তে ইচ্ছে করে। আর মনে মনে কল্পনা করি, ভগবান তথাগত শাস্তা জেতবনে সমাগত ভিক্ষুদের এইসব গল্প শুনিয়ে তাদের সংশয় অপনোদন করছেন; তাঁর কণ্ঠে আশ্বাস, নয়নে করুণাঘন দৃষ্টি, উত্তোলিত দক্ষিণ পাণিতে বরাভয়-মুদ্রা। এই কঠোর বাস্তব-সংসার স্বপ্নে দেখতে ইচ্ছে করি, আমিও যেন সেই কাষায়-পরিহিত ভিক্ষুদের পাশে বসে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে শাস্তার মুখ নিঃসৃত অমৃত-কাহিনী শুনেছি। জেতবনের শান্ত সন্ধ্যায়, কল্পনা করি, শাস্তার কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে জাতক-কাহিনীর প্রথম বাক্য---

অতীতে বারণসিয়াম্ ব্রহ্মদত্তে রাজ্জং কারেন্তে।

রামায়ণ

রামায়ণ সম্পর্কে নানা স্মৃতি আমার জীবনে জড়িয়ে আছে। রামায়ণকে নানা রূপে নানা পরিবেশ পেয়েছি। সেই সব স্মৃতি আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে উঠে আসছে।

প্রথম যে স্মৃতি মনে পড়ে, সে ছবি ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছে। শৈশবের কুয়াশা আর বর্ষা ভেদ করে সেই প্রায়-মুছে যাওয়া ছবিটি মনে পড়ছে। মনে পড়ে রংপুরে আলমনগরে কলেজকেন্দ্রিক বিস্তৃত ব্যাসরেখায় সারি সারি অধ্যাপক-ভবনগুলি। তারই একটিতে সন্ধ্যাবেলায় বারান্দায় বসে বাবার কাছে রামায়ণের গল্প শুনছি। বলা বাহুল্য যুদ্ধের খবরটাই সেদিন শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করেছিল। রামচন্দ্রকে বহু যুদ্ধ করতে হয়েছে। তার মধ্যে শূর্পণখাবধ, কুম্ভকর্ণবধ ও রাবণবধ সব চেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল।

মুখে শোনার স্তর পেরিয়ে যখন নিজে পড়ার স্তরে এসে পৌছলেম তখন 'ছোটদের রামায়ণ' পড়েছি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছাড়া আর কে আছেন যিনি বাঙালি শিশুদের জন্য অমন সুন্দর করে রামায়ণের গল্প বলবেন! বস্তু, 'ছোটদের রামায়ণ' পড়েই বড়োদের রামায়ণ পড়ার সাধ জেগেছিল। রংপুরের জীবনে শৈশবে সাহিত্যস্বাদ আমাকে দিয়েছিলেন যে ক'জন শিল্পী তার মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর অন্যতম। আজ ভাবি উপেন্দ্রকিশোর কী অসাধ্য সাধন করেছিলেন। ছোটদের উপযোগী করে রামায়ণের মহান গভীর আদর্শ কাহিনীকে তিনি উপস্থিত করেছিলেন। শৈশবের সেইসব সোনার দিনগুলির সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের সেই বইখানিও হারিয়ে ফেলেছি ।

রামায়ণ সম্পর্কে তার পরের স্মৃতি হুগলীতে ভাগীরথীতীরবর্তী জনপদে। বোমার ভয়ে যখন কলকাতা শুদ্ধ লোক পলাতক তখন সেই স্রোতের টানে আমরাও বছর চারেকের জন্য নির্বাসিত। সেদিন গঙ্গার উদার আহ্বান আমার কৈশোরজীবনকে ভরে তুলেছিল। ঠাকুরমার কাছে একখণ্ড সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ পেয়েছিলাম। তখন পড়ার নেশা আমাকে পাগল করে তুলছে। পুরনো ট্রাঙ্ক খুলে এই বইটি পেয়েছিলাম। ঠাকুরমাই বলেছিলেন, 'ওটা পড়।'

আমার অশেষ সৌভাগ্য, সেদিন কৃত্তিবাস-কচকচি আমি পড়ি নি। কৃত্তিবাসের কতটা আসল, আর কতটা নকল এই নিয়ে মহা মহা অর্কফলাযুক্ত পণ্ডিতদের মধ্যে যে ধুন্ধুমার এবং কৃত্তিবাসের কাল ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক নিয়ে বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের মধ্যে যে মল্লযুদ্ধ, তার কিছুই জানতাম না। ভাগ্যিস জানতাম না, জানলে সেদিন কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠের আনন্দ সমূলে বিনষ্ট হ'ত।

আজ শুনি, কৃত্তিবাসী রামাণের খোল নল্চে দুই-ই বদলেছে; সাত নকলে আজ আসল খাস্তা। তা হোক, সেদিন আমার আনন্দে কোনো ফাঁক ছিল না।

সত্যি সেদিন ভাল লাগত সেই বটতলা-সংস্করণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে। কী শ্রুতিসুখকর সেই সব বর্ণনা :

সীতা বলেন তুমি যদি হবে বনবাসী।
ঠাকুর বনে গেলে ঘরে কি করিবে দাসী।।
সীতার কথা শুনিলেন কমল-লোচন।
আমার সহিত সীতা তুমি যাবে বন।।

সীতার বনগমন-অভিলাষের পরই ভালো লাগত কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার বর্ণনা। মনে পড়ে খুব হাসি পেয়েছিল ঐ বর্ণনায়—

পূর্বজন্মে ছিল দুন্দুভি নামে অপ্সরা।
জন্মিল সে কুঁজী হয়ে নামেতে মন্থরা।।
কৈকেয়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রীমাতা।
রামের দুঃখের লাগি সৃজিল বিধাতা।।
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী।
রামরাজা হন দেখি করে ধড়ফড়ি।।
আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিতা দেখি তারে।
সর্বনাশ করে কুঁজী থাকে যার ঘরে।।
মরিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে সেই সে কারণে।।

তারপর মনে পড়ে বিভীষণের স্তবের বর্ণনা—

গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারিপাশে।
উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে।।

বরিষাতে চারিমাস থাকে অনশনে।
শিলা বরিষণ ধারা সহে রাত্রি দিনে।।
শীতকালের স্নিগ্ধ জলে থাকে নিরন্তর।
এইরূপে তপ করে নিযুত বৎসর ।।
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।।

বাপ্‌রে বাপ্‌! কী তপস্যা! অযুত নিযুত বৎসরের তপ। হিসেব করতে গিয়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল, করাণ অঙ্কে আমি চিরদিনই কাঁচা। সুতরাং অঙ্ক থাক, গানে যাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কবিকৃত মহিমা শুনি—

কৃত্তিবাসের গীত শুনি বড়ই মধুর।
শুনিআ গীতিকা পুণ্য পাপ হয় দূর।।
তালশব্দে বাজে নূপুর ঝন ঝন।
গীতশব্দে গাইল শুন রামায়ণ।।
ব্রাহ্মণে শুনিলে পায় গুরুর পূজা।
ক্ষত্রে শুনিলে হয় পৃথিবীর রাজা।।
বৈশ্য শুনিলে নানা ধনে বাঢ়য় ঘর।
শূদ্র শুনিলে হয় ভকতি বিস্তর।।
সংসারে ভ্রমিলে বুলে কৃত্তিবাস পাঁচালী।
যাহার প্রসাদে শুনি নানা অর্থ কেলি।।
যাহার প্রসাদে শুনি এই রামায়ণ।
হেন পণ্ডিতে আশিস করে দেব নারায়ণ।।
রামের গমনে রামায়ণ করি সঙ্কলি।
সাতকাণ্ডে পোথা গান রচিল পাঁচালী।।

রামায়ণ সম্পর্কে আর একটি স্মৃতি কোনোদিনই মন থেকে মুছে যাবে না। এই সময়েই স্কুলের বাংলা বইয়ে পড়েছিলাম এস. ওয়াজেদ আলির প্রবন্ধটি — 'ভারতবর্ষ'। চোদ্দ বছর আগে যে দৃশ্য কলকাতার এক গলিতে তিনি দেখে গেছেন, চোদ্দ বছর পরেও সেই দৃশ্য দেখলেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কলকাতাও অনেক বদ্‌লেছে। কিন্তু মুদীর দোকানে এক বৃদ্ধ আগের মতই সুর করে রামায়ণ-পুঁথি পড়ছে। আর সেতু বন্ধনের কাহিনীই তার পাঠ্যবিষয়। এই গল্পটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। লেখকের ভারতীয় ট্রাডিশনের নিরবচ্ছিন্ন ধারা লক্ষ্য করার ভঙ্গিটি আমায় মুগ্ধ করেছিল।

বস্তুত বাঙালির জীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রধান স্থান দখল করে আছে। এখানে বাল্মীকি রামায়ণের ঠাঁই নেই। স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বাল্মীকির প্রতিভা ও রামায়ণ সৃষ্টির কাহিনীর নবভাষ্য পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। এই

কবিতাটি আর দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' আমাকে বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন পুরুষোত্তম নরচন্দ্রমা কে? —

কোঽহ্যস্মিন্ প্রথিতো লোকে সদ্‌গুণৈর্গুণিসত্তমঃ।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ।।
উদারাচার-সম্পন্নঃ সর্বভূত-হিতে রতঃ।
বীর্যবাংশ্চ বদান্যশ্চ কশ্চাপি প্রিয়দর্শনঃ।।
জিতক্রোধো মহান্ কশ্চ ধৃতিমান্ কোং নসূয়কঃ।
সঞ্জাত রোষাৎ কস্মাচ্চ দেবতা অপি বিভ্যতি।।
ক উদারঃ সমর্থশ্চ ত্রৈলোক্যস্যাপি-রক্ষণে।
কঃ প্রজানুগ্রহরতঃ কো নির্বিগুণ সম্পদাম্।।

প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন নারদ মুনি একটি শব্দে — রামচন্দ্র।

এই প্রশ্নোত্তর রবীন্দ্রনাথের হাতে অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করেছে—

কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র মহাদৈন্যে কে হয়নি নত;
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা-মাঝে দুঃখ মহত্তম —
কহো মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।
নারদ কহিলা ধীরে অযোধ্যার রঘুপতি রাম।

বাল্মীকিকে বিধাতা দিয়েছিলেন অলৌকিক আনন্দের ভার, তাই তাঁর বেদনা অপার, তাঁর নিত্য জাগরণ, তাঁর নিত্য অন্বেষণ। সেই অন্বেষণের ফল রামায়ণ।

'ভাষা ও ছন্দে'র পর বাল্মীকি সম্পর্কে আমাকে সচেতন করে তুলেছিল দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'। এই বই আমার জন্মের পনের-বিশ বছর আগে প্রথম প্রকাশিত হয়, আজো তা হাতে পেলে নতুন করে পড়ি।

আর তুলসীদাসী রামায়ণ সম্পর্কে আমাকে সচেতন করে তোলেন পি. জি. হস্‌পিটালে আমার পাশের বেডে শয্যাবন্দী এক বৃদ্ধ বেহারী কনস্টেবল। জীবনের একটি মূল্যবান দুর্লভ অভিজ্ঞতা সেদিন লাভ করেছিলাম। এই অভিজ্ঞতা কোনোদিন স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবার নয়। আজো তুলসীদাসী রামায়ণ পড়তে বা আলোচনা করতে গিয়ে সেই মৃত্যুপথযাত্রীর ছবিটি মানসপটে ভেসে ওঠে। আজো সেই ছবিটি স্পষ্ট দেখতে পাই।

আমার বাঁ দিকের বেডে ছিলেন ঐ বেহারী কনস্টেবল, দু মাস পুলিশ হাসপাতালে, এখানে চার মাস। জানি না, আরো ক'মাস তিনি থাকবেন। জানি না তিনি সুস্থ হয়ে ফিরবেন কি না! শুধু জানি, তিনি অনমনীয়। স্বাভাবিক প্রস্রাবক্রিয়া তাঁর বন্ধ হয়ে গেছে, কৃত্রিম উপায়ে নল দিয়ে দু তিনটি পথে ঐ ক্রিয়া চলছে। এই অসহ্য রোগযন্ত্রণা নিয়ে তিনি প্রতি সন্ধ্যা আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। যখন 'ভিজিটার্স আওয়ার' শেষ হয়ে যেত, নির্জন বারান্দার সারি সারি বেডে আমরা প্রতি মুহূর্তে রোগযন্ত্রণা ভোগ করছি, তখন সে যন্ত্রণাকে ভুলে যাবার প্রধান পাথেয় জোগাতেন ঐ বৃদ্ধ। প্রথমে নানা রঙ্গ রসিকতা কিস্‌সা। তারপরই তুলসীদাসের রামচরিতমানস থেকে বৃদ্ধ অনর্গল সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন। শয্যাবন্দী রোগীর দল উৎকর্ণ হয়ে তা শুনত।

বস্তুত এই অল্পশিক্ষিত বেহারী কনস্টেবলের কাছে থেকে আমরা সেদিন তুলসীদাসী রামায়ণের পাঠ গ্রহণ করেছি। তুলসীদাসের দোহা আর চৌপাই আউড়ে যেতেন ঐ বৃদ্ধ। মাঝে মাঝে থেমে ব্যাখ্যা করতেন, টীকাভাষ্য করতেন। রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বনবাসজীবন তাঁর কথকতা ও আবৃত্তিগুণে জীবন্ত হয়ে উঠত। রাত ক্রমশ গভীর হত। বৃদ্ধ মৃদু ভারী গলায় তুলসীদাসী রামায়ণ শোনাতেন। শুনতে শুনতে চোখের সামনে দেখতাম রামচন্দ্রজী গুহক মিতার আশ্রয়ে, পম্পা সরোবরের তীরে, দণ্ডকারণ্যের পথে। দেখতাম জনকরাজসভায় তরুণ রামচন্দ্রের বীরমূর্তি, কনকলঙ্কায় দর্পী রাবণকে, অযোধ্যাপুরীতে শোকাকুলা কৌশল্যাকে।

বৃদ্ধ কথকতা-শেষে রামনামের মাহাত্ম্য শোনাতেন। ধর্মবিশ্বাসরিক্ত শ্রদ্ধাহীন সংশয়ী শ্রোতার মনেও সে মাহাত্ম্য— ক্ষণকালের জন্যও — মুদ্রিত হয়ে যেত। নিস্তব্ধ অন্ধকারে শুনতাম সেই গভীর ভক্তকণ্ঠের আবৃত্তি :

রাম নাম মণি দীপ ধরু, জীহ দোহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহিরো, জো চাহ সি উজিয়ার।।

রামনামের দীপ জ্বেলে ভিতর-বাহিরের অন্ধকার পথ উত্তীর্ণ হবার ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁর কণ্ঠে ঝরে পড়ত।

প্রীত্ রাম সো নীত্ পথ্ চলিয় রাগ রিস জীতি।
তুলসী মণ্ডন কে মতে, যহ্ ভক্তি কী রীতি।।

রোগযন্ত্রণাকে পরাস্ত করে সে কণ্ঠে বেজে উঠত অসীম আশ্বাসবাণী :

এক ভরোসো এক বল, এক আস বিশ্বাস।
এর রাম ঘনশ্যাম হিত, চাতক তুলসীদাস।।

শ্যামল মেঘের ধারাববর্ষণে যেমন চাতক স্নিগ্ধ হয়, তেমনই তুলসীদাস রামনাম অমৃতধারায় স্নিগ্ধ হবেন। রামনামের গুণের অন্ত নেই :

জড় চেতন গুণ দোষ ভয়, বিশ্ব কীন্হ করতার।
সন্ত হংস গুণ গহহিঁ পয়, পরিহরি বারি বিকার।।

এসো তৃষ্ণার জল, এসো শান্তির বারি, এসো রামনামের অমৃতধারা। হরণ করো সকল

পাপ-তাপ-বিকার।

ধীরে ধীরে সেই মৃদু সুরেলা গভীর কণ্ঠের আবৃত্তি থেমে যেত। সারা ওয়ার্ড ঘুমিয়ে পড়ত। সেদিন সংশয় পরাহত, পরিহাস লজ্জিত ও রোগযন্ত্রণা পরাজিত হত। সমস্ত রজনী ভরে থাকত সেই কথকতায়। মাঝে মাঝে নার্সদের হাই হীলের শব্দ ক্ষণকালের জন্য সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিত।

'রামায়ণী কথা' পড়েছি স্কুলের উঁচু শ্রেণীতে। সেদিন সমস্ত পড়া ও পরীক্ষা থেকে এ বইকে আলাদা করে দেখেছি। এ বই বারবার পড়েছি। ফিরে ফিরে পড়তে চাই। দীনেশচন্দ্র যদি বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনা নাও করতেন তথাপি এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ তাঁকে চিরজীবী করে রাখবে।

দীনেশচন্দ্র এখানে ধ্রুপদ রাগে গ্রন্থের সুর বেঁধেছেন। মনে হয়, বিষয়ের মহিমা তাঁর ভাষাকে মহিমা ও ভঙ্গিকে সংযতশ্রী দান করেছিল। বারবার পড়তে ইচ্ছে করে রাম-চরিত্র বর্ণনা :

"সঙ্গীতের ন্যায় মানবজীবনেরও একটা মূল রাগিণী আছে। সুগায়ক কণ্ঠের গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বীয় মূল রাগিণীর বাহিরে যাইয়া পড়ে না, মানবচরিত্রেরও সেইরূপ একটা স্বপরিচায়ক স্বাতন্ত্র্য আছে — সেইটিকে জীবনের মূল রাগিণী বলা যায়, জীবনের কার্যকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে উহা আবিষ্কৃত হয়। যিনি যাহাই বলুন, — সেই অভিষেকোপযোগী বিশাল সম্ভারের প্রতি অবজ্ঞার সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া অভিষেকব্রতোজ্জ্বল শুদ্ধ বস্ত্রধারী রামচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন —

এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।।

'তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনপূর্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনবাসী হইব'— সেই দিনের সেই চিত্রই রামের অমর চিত্র, — এই অপূর্ব বৈরাগ্যের শ্রী তাঁহাকে চিনাইয়া দিবে। প্রজাগণ জলভারাচ্ছন্ন আকুল চক্ষে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন —

যা প্রীতির্বহুমানশ্চ ময্যযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎ প্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্।।

'অযোধ্যাবাসিগণ, তোমাদের আমার প্রতি যে বহুমান ও প্রীতি তাহা ভরতের প্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি প্রীত হইব।' এই উদার উক্তিই রামচরিত্রের পরিচায়ক। লক্ষ্মণের ক্রোধ ও বাগ্‌বিতণ্ডা পরাভূত করিয়া ঋষিবৎ সৌম্য রামচন্দ্র অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক বলিলেন —

'সৌমিত্রে যোহভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ।
অভিষেকনিবৃত্তার্থে সোহস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ।।

'সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্য যে সম্ভ্রম ও আয়োজন হইয়াছে, তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্য হউক।' এই বৈরাগ্যপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি সমস্ত ক্ষুদ্রস্বর পরাজিত করিয়া

আমাদের কর্ণে বাজিতে থাকে।"

দীনেশচন্দ্র কয়েকটি অপূর্ব আলেখ্য অংকন করেছেন — দশরথ, রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা, হনুমান, বালী।

এই আলেখ্যগুলির মধ্যে সীতা ও ভরতের আলেখ্য কারুণ্যে ও বেদনায় আমাদের অভিভূত করে।

অনুতাপদগ্ধ ভরত চলেছেন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে। চিত্রকূটে উপনীত হয়ে তিনি পদব্রজে অগ্রসর হলেন। তখনকার বর্ণনা কী সুন্দর, আর ভরতের শোকমগ্ন চিত্তের পটভূমিরূপে এই রমণীয় দৃশ্যের কী বৈপরীত্য!

"তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আম্র ও লোধ্রদল পক্ক হইয়া শাখাগ্রে দুলিতেছিল। চিত্রকূটের কোন অংশ ক্ষতবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধূসর, নিম্ন অধিত্যকাভূমি পুষ্পসম্ভারে প্রমোদউদ্যানের ন্যায় সুন্দর, কোথাও পর্বতগাত্র হইতে একটি শৈলশৃঙ্গ উর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়া আছে — অদূরে মন্দাকিনী — কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও জলরাশির ক্ষীণ রেখা নীল তরুরেখার প্রান্তে বিলীয়মান। তরঙ্গ রাজি সুন্দরীর পরিত্যক্ত বস্ত্রের ন্যায় বায়ু কর্তৃক ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, কোথাও পার্বত্য ফুলরাশি স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতেছে।"

এই রমণীয় পটভূমিতে রামচন্দ্র ও ভরতের মিলনদৃশ্যটি বড় করুণ। দীনেশচন্দ্র অশেষ নৈপুণ্য ও করুণায় এই ছবিটি এঁকেছেন। অনশনকৃশ ও শোকের জীবন্ত মূর্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণাসনে উপবিষ্ট দেখে বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন ও বিলাপ করতে করতে অগ্রজের পদতলে পড়লেন। রামচন্দ্র সেই রোরুদ্যমান কৃশ বিবর্ণ ভরতকে অতি আদরে হাত ধরে তুললেন ও মস্তক আঘ্রাণ করে কোলে টেনে নিলেন।

দীনেশচন্দ্র ভরতের এই বিষণ্ণ মূর্তিখানি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। মনে পড়ে, প্রথম যখন এই ছবি দেখি তখন একটা অব্যক্ত বেদনায় মন ভারি হয়ে উঠেছিল, আর সেই বেদনাতেই দীনেশচন্দ্রের সৃষ্টি সার্থক হয়েছিল। রামচন্দ্রের পাদুকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাবল্কলধারী রাজর্ষি ভরতের আলেখ্য অঙ্কনশেষে দীনেশচন্দ্র বলেছেন,

"আমরা নিষাদাধিপতি গুহকের সঙ্গে একবাক্যে বলিতে পারি —

ধন্যস্ত্বং ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিচ্ছসি।।

অযত্নাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি ধন্য, জগতে তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যায় না।"

দীনেশচন্দ্র এইভাবেই রামায়ণের কারুণ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

সীতা-আলেখ্যদর্শন করেই আমার রামায়ণী কথা পরিক্রমণের সমাপ্তি ঘটবে। সীতার কথা মনে হলেই মনের মধ্যে মধুসূদনের একটি অবিস্মরণীয় চরণ গুঞ্জন করে ওঠে — 'অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, হে বৈদেহি।'

বৈদেহী জনকতনয়া পুণ্যবতী সীতা চরিত্র ভারতীয় জীবনাদর্শের অন্যতম প্রতীক। সহস্র সহস্র বৎসরের পরিবর্তন সত্ত্বেও এই চরিত্র অম্লান হয়ে আছে! দীনেশচন্দ্র অশেষ নৈপুণ্যে আলেখ্য অঙ্কন করেছেন।

বাল্মীকি রামায়ণ থেকে একটি করুণ-নিষ্ঠুর দৃশ্য সংকলন করে দীনেশচন্দ্র সীতাচিত্র এঁকেছেন।

"যখন রাম পিতা-মাতার ও সুহৃদ্‌গণের সমক্ষে জটাবল্কল পরিধান করিলেন, তখন সীতার পরিধানের জন্য কৈকেয়ী তাঁহার হস্তে একখানি চীরবাস প্রদান করিলে, সীতা সজলনেত্রে ভীতকণ্ঠে রামচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, চীরবাস কেমন করিয়া পরিতে হয়, আমি জানি না, আমাকে শিখাইয়া দাও।"

"পথ-পরিশ্রান্তা সীতার ভীত ও চকিত পাদক্ষেপ ক্রমশঃ মন্থর হইয়া আসিল। পরিশ্রান্ত হইয়া যখন ইঙ্গুদীমূলে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, তখন তৃণশয্যাশায়িনীর সুন্দর বর্ণ আতপতাপক্লিষ্ট ও অনশনজনিত মুখশ্রীর বিষণ্ণতা দেখিয়া রামচন্দ্র অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।"

"বক্র কেশকলাপ সীতার তেজোদৃপ্ত মুখের চতুর্দিকে তরঙ্গিত হইয়া পড়িয়াছে, ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া ফুল্লকমলপ্রভ রক্তিম বদনমণ্ডল উন্নমিত করিয়া সীতা যখন রাবণকে তীব্রভাষায় ভর্ৎসনা করিলেন, তখন আমরা সীতার প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখাবৎ মূর্তি দেখিলাম। ভারতের শ্মশানের প্রধূমিত অগ্নিচ্ছায়ায় স্বামীর পার্শ্বে বনফুলসুন্দর স্থিরপ্রতিজ্ঞ বদনে বিচ্ছুরিত যে সতীত্বের শ্রী আমাদের চক্ষে রহিয়াছে, শ্মশানের অগ্নি যে শ্রী ভস্মীভূত করিতে পারে না, ভারতের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নদীপুলিনকে এক অশরীরী পুণ্যপ্রবাহে চিরতীর্থ করিয়া রাখিয়াছে, মরণে যে গরিমা সীমন্ত উদ্ভাসিত করিয়া হিন্দু রমণীর সিন্দূরবিন্দুকে অক্ষয় সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে — আজ জীবনে সীতার সেই চিরনমস্য সীতামূর্তি দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।"

"বিশাল সৈন্যসঙ্ঘের সম্মুখে রাম সীতাকে অতি কঠোর কথা বলিলেন, লজ্জায় লজ্জাবতী যেন মরিয়া গেলেন, কিন্তু তেজস্বিনীর মহিমা স্ফূরিত হইয়া উঠিল — রামের কঠোর উক্তি প্রাকৃতজনোচিত, ইহা বলিতে সাধ্বীর কণ্ঠ দ্বিধা কম্পিত হইল না — তিনি পতির পদে অশেষ প্রণতি জানাইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং উদ্যত অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া অধোমুখে স্থিত স্বামীকে প্রদক্ষিণপূর্বক জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন।

তৎপরে কষিতসুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় এই দেবীকে অগ্নি রামের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, 'যিনি আজন্মশুদ্ধা, তাঁহাকে আর আমি কি শুদ্ধ করিব।'"

এইভাবে দীনেশচন্দ্র ছবির পর ছবি এঁকে অম্লান বৈদেহী-চিত্রকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। মনে পড়ে, এইসব ছবি দেখে আমার দৃষ্টি অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। সীতাচরিত্র দর্শনশেষে দীনেশচন্দ্র বদ্ধাঞ্জলি হয়ে সীতার উদ্দেশে বলেছেন, "এস মাতা! তোমার সুকোমল অলক্তকরাগ-রঞ্জিত পাদযুগ্মের নূপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত — তুমি কবির সৃষ্টি

নহ, তুমি ভগবানের দান।"

অশোকবনে বন্দিনী সীতা মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা-উৎস। তাঁর সম্পর্কে বাল্মীকি বলেছেন, 'সুখার্হা দুঃখসন্তপ্তা, মণ্ডনার্হা অমণ্ডিতা।' যিনি চিরসুখাভ্যস্তা, তিনি চিরদুঃখিনী, যিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর শ্রম সার্থক হয়, তিনি ভূষণহীনা। এই ছবি আমাদের হৃদয়কে তীক্ষ্ণ শরের মতো বিদ্ধ করে। এই ধূমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখা সীতার ছবিটি বাল্মীকি দেখিয়েছেন, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, দীনেশচন্দ্রও দেখিয়েছেন।

রামায়ণ আধুনিক খণ্ড বদ্ধ জীবনে কী ও কতটা? এই প্রশ্নের উত্তরে দীনেশচন্দ্রে 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকাচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা স্মরণ করে আমার সমস্ত জীবনের সঙ্গী রামায়ণ-পাঠ সাঙ্গ করি :

"রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানা-ঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মলবায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।"

মহাভারত

মহাভারত ভারতীয় মাত্রেরই চেতনায় নিত্যলগ্ন। তাকে বিস্মৃতির পরপারে ফেলা যায় না। স্মৃতির স্থির পটে ও জীবনের চলমান পটে মহাভারত উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমি যদি নিজেকে ভারতসন্তান বলে স্বীকার করি তবে আমার জীবন থেকে মহাভারতকে মুছে ফেলা যায় না। মহাভারত ভারতবর্ষের জীবনবেদ। ভারতের জীবনের সব কিছুরই পরিচয় আছে মহাভারতে। তার কারণ মহাভারত কেবলমাত্র ধর্মশাস্ত্র নয় — একাধারে কামশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্র।

এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে গঙ্গাতীরবর্তী যে জনপদে আমরা কৈশোর কাটিয়েছি, সেখানে আমার সহপাঠী ছিল ভগবতীচরণ। সে ছিল বাঁশবেড়ের কথক বাড়ির ছেলে। বিখ্যাত শ্রীধর কথকের বংশে তার জন্ম। তার দাদু তখনো — দ্বিতীয় বিশ্বসমর কালে — আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে — কথকতা করতেন। মনে আছে সন্ধ্যেবেলায় দুর্গাবাড়ির দালানে ভগবতীর দাদুর কথকতার আসর বসত। একদিন আমার বন্ধুই আমাকে ঐ আসরে নিয়ে গিয়েছিল। লোভ ছিল ফুলের মালার। আসরের আয়োজনকর্তা শ্রোতাদের সবাইকে ফুলের মালা পরাতেন। মনে আছে খুব গর্ব হয়েছিল মালা পরে। সবাই টিপ-টিপ্ করে ভগবতীর দাদুকে প্রণাম করছিল দেখে হাসি পেয়েছিল। ভগবতী সাবধান করে দিয়েছিল — এই, হাসিস্ না।

সেদিন কথক মহাভারতের প্রশস্তি কীর্তন করছিলেন। বলার ভঙ্গিটি এত চমৎকার যে সেদিনের শোনা দুয়েকটি শ্লোক আমার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

কথক বলছিলেন :

'মহাকবি বেদব্যাস মহাভারতের তুলনা করেছেন হিমালয় ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গে। এই তুলনা অতিশয় সার্থক। সত্যিই মহাভারত হিমালয়ের মতো অত্যুচ্চ ও সুমহান, এবং ভারত মহাসাগরের মতো বিরাট ও সুগম্ভীর। মহাকবি বলেছেন —

যথা সমুদ্রো ভগবান্
যথা হি হিমবান্ গিরিঃ।
উভৌ খ্যাতৌ রত্ননিধি
তথা ভারতমুচ্যতে।।

ভারতবর্ষের তিনটি রত্ননিধি — হিমালয় পর্বত, ভারত মহাসাগর ও মহাভারত।''

কথক এই শ্লোককে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, বলেছিলেন —''উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, দুয়ের মাঝে মহাভারতবর্ষ। এই দেশের নাম মহাভারত, ভৌগোলিক সত্তা, রাষ্ট্রিক ঐক্য এবং সাংস্কৃতিক সংহতির পরিচয় যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তার নামও মহাভারত।''

পঞ্চান্ন বছর আগে শোনা ভারত-প্রশস্তির স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কলকাতায় শোনা ভারতীকথা। গঙ্গাতীরবর্তী জনপদের কথকবাড়ির বৃদ্ধ কথক আর কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইন্স্টিটিউটে মহাভারত-ব্যাখ্যাতা আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী। বক্তা স্থান কাল ও পটভূমির পরিবর্তন হয়েছে সত্য, শ্রোতার মন পরিণত হয়েছে সত্য, জীবনের তাৎপর্য বদলেছে সত্য, কিন্তু শাশ্বত ভারতীকথার আকর্ষণ ও মূল্য কমে নি।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর মুখে ভারতীকথা শুনে শুনে কৈশোরের ভারতীকথা মনে পড়ে গিয়েছিল। এই ব্যাখ্যা অধ্যাপকের কণ্ঠে আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি নিয়মিত মহাভারত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন — একটানা ষোল বছর বসেছেন — সমগ্র মহাভারত দু বার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা শেষ করেছেন — তবু এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনতে কোনোদিন শ্রোতার অভাব ঘটে নি।

মহাভারতের ছবি ও জীবন অধ্যাপক চক্রবর্তীর বলার গুণে জীবন্ত হয়ে ওঠে। দরাজ গলায় তিনি ব্যাখ্যা করেন :

''মহাভারতের চরিত্র-সৃষ্টি ও চরিত্রাঙ্কন ঋষিকবির সৃজনশীল মনের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি। মহাভারতের চরিত্রগুলো কেবলমাত্র ঘটনার অন্ধ অনুসরণে রচিত হয় নি। মহাভারত যে ইতিহাস এ দাবী মহাকবি নিজেই করেছেন — 'ইতিহাসমিমং ভুবি।'

কিন্তু 'ঘটে যা, তা সব সত্য নহে' — এই নীতি অনুসারে মহাকবি বেদব্যাস তাঁর মনের রঙে রঞ্জিত করে মহাভাররতের চরিত্রগুলোকে রূপায়িত করেছেন। চরিত্রগুলো উঠেছে মহর্ষির মনরূপ সমুদ্রমন্থন হতে। শৌনক নৈমিষারণ্যে সৌতিকে প্রশ্ন

করেছিলেন—

মনঃ সাগর সম্ভূতাং
মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
কথয়স্ব সতাং শ্রেষ্ঠ
সর্বরত্নময়ীমিমাম্।।

যেমন সুদূর অতীতে সমুদ্রমন্থনে নানা রকমের রত্ন উঠেছিল তেমনি মহাকবির মনরূপ সমুদ্রমন্থনে মহাভারতের বিচিত্র রত্নসম্ভার আমরা লাভ করেছি।''

এই বিচিত্র রত্নসম্ভার অধ্যাপক চক্রবর্তীর দাক্ষিণ্যে দেখে মুগ্ধ ও ধন্য হয়েছি।

কিন্তু সে কথা পরে। তার আগে শৈশবের স্মৃতি। রংপুরের সেই শৈশবের প্রত্যুষে মহাভারতের স্বাদ পেয়েছিলেম শিশুসাহিত্যের ভগীরথ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা 'ছোটদের মহাভারত' পড়ে। আমার জন্মের আগে সে বই প্রকাশিত হয়েছিল, এখনো বর্ষে বর্ষে তার সংস্করণ হচ্ছে। 'ছোটদের মহাভারত' ও 'ছোটদের রামায়ণ' লিখে এই ভগীরথ বাঙালি শিশুকে পুণ্যতোয়া ভারত-কথা ও রাম-কথার আস্বাদ দিয়েছিলেন। মহাকাব্যের বিশালতা ও মহত্ত্বকে তিনিই ছোটদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

তারপর যে-কবি আমার স্মৃতিতে মহাভারত-কবি রূপে উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয় কাশীরাম দাস, যাঁর সম্পর্কে মধুসূদনের অমরোক্তি 'হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।'

আমাদের বাড়িতে পুরনো তোরঙ্গের মধ্যে ছিন্নপ্রায় কাশীদাসী মহাভারত ছিল। সেই ট্রাঙ্ক খুলে বইখানি বার করে নিয়েছিলেম। মনে পটে গ্রীষ্মাবকাশের দীর্ঘ দুপুরগুলি কাশীরামের সাহচর্যে কাটিয়েছিলেম। সন্দেহ নেই, গত তিনশ' বছর ধরে বাঙালির ভারত-রস-পিপাসা চরিতার্থ করেছেন কাশীরাম দাস। কাশীরাম কেবল কবি নন, তিনি কবিগুরু। এদেশে কাশীরামের পর যত কবি জন্মগ্রহণ করেছেন, সকলেই কাশীরামের নিকট অল্পবিস্তর ঋণী। মহাভারতের উপাখ্যান নিয়ে এদেশে যত কাব্য, নাটক, পাঁচালী, সঙ্গীত, যাত্রাভিনয়ের নাটক রচিত হয়েছে, তাদের উপকরণ উপাদান কাশীদাসী মহাভারত থেকেই সংগৃহীত। মূল মহাভারতের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক কখনই ঘনিষ্ঠ ছিল না, কাশীদাসী মহাভারতই বাঙালির বন্ধু ও সখা ছিল।

কাশীরামের মহাভারত পড়ে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেম। সেই মুগ্ধতা আজো মনে পড়ে। আজ নতুন করে যখন কাশীদাসী মহাভারতের পাতা উল্টোই তখনি সেদিনের মুগ্ধতা, বিস্ময় ও অনুরাগ ফিরে আসে।

ছেলেবেলায় মানুষমাত্রেই যুদ্ধের রোমাঞ্চকর বর্ণনায় উৎসাহিত হয়, কাশীরামের মহাভারতে তার অভাব ছিল না। আমার ঠাকুরমা বলতেন, — দুপুরবেলা দৌরাত্ম্য করিস্ না, মহাভারত পড়ে শোনা দেখি।

অমনি সোৎসাহে কাশীরামের মহাভারত নিয়ে বসে যেতাম। ঠাকুরমা বলতেন — মহাপ্রস্থান-বর্ণনা পড়ে শোনা দেখি।

আমি বলতাম — না, ঠাকুমা, ওটা ভালো না, শোনো যুদ্ধের বর্ণনা। বলেই শুরু করতাম কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বর্ণনা :

বহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি গেল যমঘর।।
নদীফেনসম শ্বেত ছত্র ভাসি যায় স্রোতে।
শুশুকসমান গজ ডুবিছে তাহাতে।।
গ্রহসম মৃত অশ্ব ভাসি যায় বেগে।
হস্তপদ তৃণসম ভাসে চতুর্দিগে।।
শোণিতের নদী বেগে বহে ভয়ঙ্কর।
অস্ত্রগণ বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর।।

ঠাকুরমা বলতেন — এবার যুদ্ধ ছেড়ে অন্যকিছু পড়!

তখন পড়তাম দ্রৌপদী স্বয়ংবর-সভার বর্ণনা। অর্জুনকে দেখে দ্বিজগণের উক্তি :

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি ধরিয়াছে শোভা।
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।।
দেখ চারু যুগ্মভুরু ললাট প্রসর।
কি আনন্দ গতি মন্দ জিনি করিবর।।
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিবর যুগবর জানু সুবলিত।।
মহাবীর্য যেন সূর্য মেঘে আবরিত।
অগ্নিঅংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত।।

উদ্ধৃত অর্জুন-রূপবর্ণনাটি আজো মনে আছে। কারণ, আমাদের স্কুলে অতুল নামে এক সহপাঠি ছিল, দুঃখের বিষয় তার নাসিকাটি ছিল কিঞ্চিৎ লম্বা। আমরা সবাই মিলে অতুলকে উদ্দেশ করে চীৎকার করে একটি লাইন আওড়াতাম :

খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।

মুহূর্তের মধ্যে অতুল ক্ষিপ্ত হয়ে দুঃশাসনে পরিণত হ'ত এবং 'দন্ত কড়মড়ি' হাই বেঞ্চি পেরিয়ে লাফিয়ে পড়ত। ব্যস্! সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যেত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটি অধ্যায়। হেডমাষ্টারমশায় ক্লাসে না আসা পর্যন্ত সে যুদ্ধের অবসান হ'ত না।

স্কুলের উঁচু ক্লাসে যখন পড়ি তখন হাতে এলো খ্যাতকীর্তি কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত অনুবাদ, সতেরো খণ্ডের 'পুরাণ-সংগ্রহ'। আমাদের বাড়িতে পুরনো তোরঙ্গ থেকেই ঐ বৃহদাকার মহাভারত আবিষ্কার করেছিলাম। মনে পড়ে তাতে আমার

পিতামহের নাম স্বাক্ষরিত ছিল। কতদিন আগেকার বই। ১৮৬০/৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। গ্রন্থের নামপত্রে ছিল পিতামহের স্বাক্ষর : শ্রীদুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ, ঘোড়াঘাট, রংপুর। কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি! তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয় নি। কারণ আমার জন্মের বহু পূর্বে তিনি স্বর্গারোহণ করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত মারফৎ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। এই পরিচয় সাক্ষাৎ পরিচয় অপেক্ষা কম মূল্যবান নয়। জানি না, তাঁর শিল্পরুচি ও ধর্মবিশ্বাসের কতটা আমার উপর বর্তেছে, কিন্তু ঐ মহাভারত বহু বৎসর যাবৎ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বাংলার নবজাগরণে কালীপ্রসন্ন সিংহের স্থান অবিচল হয়ে আছে। যতদিন বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন তাঁর সংস্কৃত মহাভারত-অনুবাদ তাঁকে অমর করে রাখবে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' যদি নাও লিখতেন, এই অমর অনুবাদ তাঁকে চিরজীবী করেছে। বহুব্যয়ে প্রস্তুত এই বিশাল মহাভারত মুদ্রণ করে তিনি লোকহিতায় বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। দানী অনেক আছেন, কিন্তু এ-রকম দানী আর আছেন কিনা সন্দেহ। মূল মহাভারতের সঙ্গে বাঙালির সাক্ষাৎ পরিচয়সাধন করে কালীপ্রসন্ন রেনেসাঁসের একটি মহৎ কর্ম সম্পাদন করলেন। কাশীদাসী মহাভারত ও পুরাণকথক-ব্যাখ্যাত ভারত-কথায় মূল মহাভারতের তত্ত্বজ্ঞান ও জীবননীতির অভাব লক্ষ্য করে কালীপ্রসন্ন এই দুঃসাধ্যতম কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই দুরূহ ব্রতের একমাত্র প্রেরণা স্বদেশের হিতসাধন।

মনে আছে মহাভারতের ভূমিকায় কালীপ্রসন্নের বক্তব্য পড়ে অভিভূত হয়েছিলেম, আজো হই। ভূমিকাটি আশ্চর্য সুন্দর!

"যাহাতে এদেশীয় লোকে অতীব আদরণীয় ভারত-গ্রন্থের মর্ম প্রকৃতরূপে অবগত হইয়া সুখী হইতে পারেন এবং যাহাতে ভারতবর্ষের গৌরব স্বরূপ মহাভারতের অবশ্যম্ভব মর্যাদা চিরিদিন বর্তমান থাকে তাহার উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই দুঃসাধ্য ও চিরসঙ্কল্পিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।....

স্বদেশের জ্ঞানোন্নতি সংসাধন ও জ্ঞানগৌরব রক্ষা করাই তাহার প্রকৃত হিতসাধন করা। সুদূরপ্রস্থিত প্রশস্ত পন্থাও কালেতে বিলুপ্ত হয়, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাও সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যুচ্চ প্রাসাদ কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে এবং পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গেরও ক্রমশ নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানচিহ্ন দেশ হইতে শীঘ্র অপনীত হইবার নহে, এই বিবেচনায় আমি স্বীয় যৎসামান্য শক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিস্তীর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করতঃ স্বদেশের হিতসাধন করিতে সাহসী হইয়াছি।..........

আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবন-সেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। মহাভারত অনুবাদ করিয়া লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এবিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি বাঙলা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্মানুধাবন করতঃ হিন্দুকুলের কীর্তি-

স্তম্ভস্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।"

এই নিবেদন পড়ে অভিভূত হতে হয়। কালীপ্রসন্ন নিশ্চিত জানতেন, তিনি এক অসাধারণ কাজে হাত দিয়েছেন এবং নিজ সামর্থ্য সম্পর্কে তাঁর সন্দেহমাত্র ছিল না, কিন্তু কী অসাধারণ বিনয় ও আত্মলাঘবতা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। মনে আছে, এই ভূমিকা পড়ে চমকে উঠেছিলাম। আজ লোভ ও লালসাতুর সাহিত্যজগতে এ কথায় চমকে উঠতে হয়। বস্তুতঃ মহাভারতের মহৎ শিক্ষা কালীপ্রসন্ন আপন জীবনে কিছুটা নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, তাই এই নিরাসক্তি ও বিনয়। কালের অমোঘ শাসন ও জীবনের অনিত্যতা কালীপ্রসন্ন মহাভারত-পাঠে লাভ করেছিলেন, এই ভূমিকায় তার ছাপ আছে।

মহাভারতের প্রথম ও শেষ কথা এই নিরাসক্তি। মানবকীর্তির অনিত্যতা ও কালের অমোঘ শাসনের কথাই মহাভারতে কীর্তিত হয়েছে। ষোড়শ পর্বে — মৌষল পর্বে — মানব ভাগ্য (হিউম্যান ডেস্টিনি) সম্পর্কে চরম কথা বলেছেন মহর্ষি বেদব্যাস। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর যাদব-রমণীদের নিয়ে অর্জুন যখন দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুর প্রত্যাগমন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে পঞ্চনদের আভীরগণের হাতে রমণীগণ লুণ্ঠিত ও অর্জুন নির্জিত হন। তখন অর্জুন নিতান্ত দুঃখিত হয়ে ব্যাসদেবের কাছে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণের পতন ও নিজের পরাজয়ে তিনি বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছিলেন। ব্যাসদেব তাঁকে বলেছিলেন — সবকিছুরই শেষ আছে, এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কৃষ্ণের কাজ শেষ হয়েছে, তিনি উত্তম স্থানে চলে গেছেন, এবার তোমরাও যাও, সেটাই ভালো। অর্জুন ফিরে গিয়ে সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে এ-কথা বলেছিলেন। এ-কথা শুনে যুধিষ্ঠির রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করে মহাপ্রস্থানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অর্জুনকে যে কথা বলেছিলেন, তা মানবভাগ্য সম্পর্কে চরম কথা :

কৃত্বা ভাবাবতরণম্ পৃথিব্যা পৃথুলোচনঃ
মোক্ষয়িত্বা তনুং কৃষ্ণঃ তত স্বস্থানামুত্তমম্
গমনং প্রাপ্তকালং বঃ ইদং শ্রেয়স্করং বিভো।।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী এইভাবেই ভারতীকথার মহত্ত্ব আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। আজো তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ আমার শ্রুতিপথে ধ্বনিত হচ্ছে।

নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ সৌতি সেখানে সমবেত ঋষিদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন যে তিনি জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞে গমন করেছিলেন। সেখানে ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়নমুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করেছেন। তখন ঋষিগণের অনুরোধে সৌতি সেই অপূর্ব মহাভারত কথা বর্ণনা করলেন।

মহাভারতের এই সূচনা হিন্দুমাত্রেরই পরিজ্ঞাত। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদের প্রথম অধ্যায় — পর্বসংগ্রহাধ্যায় — পড়ে সেদিন তা জেনেছিলেম। এক সময়ে — বিশ

শতকের গোড়ার দিকে — এই অধ্যায়টি সমেত আদিপর্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজ তা থেকে আমরা অনেক দূরে চলে গেছি। সৌভাগ্যক্রমে বাড়িতে কালীপ্রসন্নর মহাভারত ছিল বলে এই আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত হই নি।

নৈমিষারণ্যে সৌতি সমবেত ঋষিদের কাছে মহাভারত প্রশস্তি করে সমগ্র ভারত-কথার পরিচয় দিলেন। এটাই পর্বসংগ্রহাধ্যায়। এর শেষে তিনি বলেছেন (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) :

"হে মহর্ষিগণ! তোমাদিগের ধর্মে মতি হউক কারণ লোকান্তরগত জনের ধর্মই অদ্বিতীয় বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়ানুরাগ পূর্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠবিনির্গত, অপ্রমেয় পরম পবিত্র পাপনাশক মঙ্গলবিধায়ক পাঠ্যমান ভারত শ্রবণ করে, তাহংার পুষ্করজলে স্নান করিবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়গণ প্রভাবে যে পাপরাশি সঞ্চয় করেন, সন্ধ্যাকালে মহাভারত পাঠদ্বারা সেই সকল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়েন; আর নিশাকালে কর্ম, মন ও বাক্যদ্বারা যে সকল পাপ সঞ্চয় করেন, প্রাতঃকালে মহাভারত পাঠ করিয়া সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। য়ে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে কনকমণ্ডিতশৃঙ্গ গো শত দান করে, আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র কথা প্রত্যহ শ্রবণ করে, এই দুই জনের তুল্য ফল লাভ হয়।"

এই প্রশস্তি-বাচন ছোটবেলায় পড়েছি, আজো পড়ি। ভাবি এই পরম পবিত্র ভারতকথা শ্রবণ ও চর্চা কি আমাকে পাপমুক্ত করবে না?

একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে যাঁর মুখে ভারতীকথা শুনে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি, যাঁর কণ্ঠস্বরে ভারত-কাহিনী জীবন্তরূপ ধারণ করে, তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী। বহুদিন তাঁর মুখে ভারত-কথা শুনেছি। তার মধ্যে কোন্ বর্ণনা আমাকে সর্বাপেক্ষা অভিভূত করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর দান সুকঠিন। তবু মনে হয়, তাঁর মুখে গান্ধারীচরিত্র ব্যাখ্যা আমাকে সর্বাপেক্ষা অভিভূত করেছিল। স্পষ্ট মনে আছে, কথকের উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হৃদয়ের আকুতি। তার আশ্চর্য প্রভাবে শ্রোতৃহৃদয় বিগলিত হয়েছিল।

তখন উত্তর কলকাতার এক কলেজে আমি অধ্যাপনা করি। সেখানে অধ্যপক চক্রবর্তী 'এক্সটেনশন লেকচার' দিতে এসেছিলেন। কলেজের তরফ থেকে এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। তিনি জানতে চেয়েছিলেন কোন চরিত্র ব্যাখ্যা করবেন। আমি প্রার্থনা করেছিলাম, গান্ধারীচরিত্র-ব্যাখ্যা। তিনি হেসে সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। তাঁর মুখে এই ব্যাখ্যা বার তিনেক শুনেছি, আরো বহুবার শুনতে পেলে ধন্য হই। এই ব্যাখ্যার প্রায় সবটাই আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কারণ, আর কোনো ব্যাখ্যাই আমাকে এত গভীরভাবে বিচলিত করেনি। পরে এই অংশটি তিনি লিখেওছিলেন।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর সেই করুণ সুন্দর উজ্জ্বল ব্যাখ্যা আজো শ্রুতিপথে ধ্বনিত হয়।

এই মুহূর্তে সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর আমার হৃদয়কন্দরে বেজে উঠছে।

"মহাভারত অসংখ্য চরিত্রের চিত্রশালা। কিন্তু এই চিত্রশালার মধ্যে যে চিত্রের প্রতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস আমাদের দৃষ্টি সর্বাগ্রে আকর্ষণ করেছেন, সেটি হচ্ছে গান্ধারীর চিত্র। মহাভারতের ভূমিকায় মহাকবি সর্বপ্রথম উল্লেখ করছেন গান্ধারীর ধর্মশীলতার কথা — 'গান্ধার্যাঃ ধর্মশীলতাম্।' ধর্মশীলতা তাঁর চরিত্রেরসর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু। দীর্ঘদৃষ্টি প্রভাবে গান্ধারী বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্মের সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে সমস্ত বিশ্বজগৎ, ধর্মই ধারণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড — 'ধারণাৎ ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্ম ধারয়তে প্রজাঃ।' ধর্ম লঙ্ঘিত হলে কাউকে ক্ষমা করে না। ধর্ম রক্ষা পেলে মানুষ এবং সমাজ ব্যবস্থা রক্ষা পায়। 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।' ধর্মের অমোঘ শক্তি সম্বন্ধে এই প্রত্যয় গান্ধারীর মনে সুদৃঢ় হয়েছিল বলেই ধর্ম যেখানে পীড়িত হচ্ছে সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করেছেন।

"আমরা জানি যে গান্ধারীর পিতা যে মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহে সম্মতি দিলেন সেই মুহূর্তেই বাগ্দত্তা গান্ধারী পট্টবস্ত্র নিয়ে এবং সেই পট্টবস্ত্র বহু ভাঁজ করে নিজের দুই চোখ বেঁধে ফেলেছিলেন। পতিব্রতপরায়ণা গান্ধারীর যে চিত্র মহাভারতের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুপম বর্ণনার মধ্য দিয়ে, তার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। মহাকবি তাঁর নিজের চিত্তসমুদ্রকে মন্থন করে পরিস্ফুট করেছিলেন এই অনন্যসাধারণ মহীয়সী নারীর ছবি। তিনি তাঁর মনের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন এই চিত্রকে। মহাকবির বিরাট আদর্শ সর্বাগ্রে প্রতিভাত হয়েছিল গান্ধারীর চরিত্রে। তাই তিনি মহাভারতের ভূমিকায় সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন গান্ধারীকে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গান্ধারীর ধর্মশীলতার প্রতি। গান্ধারী চিরজীবন, এমন কি তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, এই সধর্মকে রক্ষা করে গেছেন, তাঁর গভীর বিশ্বাসের দ্বারা এবং বিশ্বাসানুরূপ আচরণের দ্বারা।

হস্তিনাপুরে প্রকাশ্য রাজসভায় সর্বজনসমক্ষে অক্ষক্রীড়া চলছে, যুধিষ্ঠির বার বার তাঁর সম্পত্তি পণ রেখে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। রাজসভায় সমাসীন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পার্শ্ববর্তী বিদুরকে ঔৎসুক্যের সঙ্গে এবং হর্ষের সঙ্গে বার বার প্রশ্ন করছেন, বিদুর এবার আমরা কী জিতলাম? নিজের আকারে এবং ইঙ্গিতে বার বার ধরা দিচ্ছিলেন যে ভ্রাতুষ্পুত্রদের সর্বনাশে জ্যেষ্ঠতাত আজ উল্লসিত।

ধৃতরাষ্ট্রস্তু সংহৃষ্টঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত।

পিতা যখন এই অশোভন উল্লাসে মত্ত, ঠিক তখনই অন্তঃপুরে মাতা গান্ধারী 'শোককর্ষিতা'। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে আবেদন জানালেন পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করবার জন্য। গান্ধারী বললেন —

তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ।

এ প্রত্যয় তাঁর হয়েছিল যে পাণ্ডবদের কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় কুরুকুলের ধ্বংসের কারণ হবে। তাই করজোড়ে স্বামীকে বলেচিলেন, 'মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং

ভবিষ্যসি।' বলেছিলেন নিজের দোষে যেন বিপদসমুদ্রে তিনি ডুবে না যান — 'মা নিমজ্জীঃ স্বদোষেণ মহাপ্সু ত্বং হি ভারত।' গান্ধারীর আবেদন সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল।

বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতচর্যার পর যখন পাণ্ডবেরা ফিরে এসে হৃতরাজ্য দাবী করলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র ভীত ও সন্ধিপ্রস্তাবে আগ্রহশীল। কিন্তু দুর্যোধন কোনো কথাই শোনেন না। পুত্রের অনমনীয় মনোভাব দেখে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে প্রকাশ্য রাজসভায় আনালেন — যদি মায়ের কথা শুনে দুর্যোধন বশীকৃত হয়। গান্ধারী সেদিন কিছুমাত্র দ্বিধা না করে দুর্যোধনকে তিরস্কার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ধর্মবিহীন ঐশ্বর্য প্রাপ্তির চেষ্টা পরিণামে মৃত্যু আনয়ন করে।

"তারপর আবার যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শান্তি সংস্থাপনের জন্য শেষ চেষ্টা করতে হস্তিনাপুরে কুরুসভায় এলেন, তখনও মহাপ্রাজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর ডাক পড়ল প্রকাশ্য কুরুসভায়। তিনি অনেক করে পুত্র দুর্যোধনকে বললেন, পুত্র, যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম নেই, অর্থ নেই, সুখ নেই। সব সময় যুদ্ধে বিজয়ও ঘটে না, যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হও।

ন যুদ্ধে তাত কল্যাণং ন ধর্মার্থৌ কুতঃ সুখম্।
ন চাপি বিজয়ো নিত্যং মা যুদ্ধে চেত আধিথাঃ।।

কিন্তু দুর্যোধন সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। যুদ্ধ অনবার্য হয়ে পড়ল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে গান্ধারীর মনে কোনও সংশয় ছিল না। দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী দেখতে পাচ্ছিলেন 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' — অর্থাৎ ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। ধর্মশীলা গান্ধারী যুদ্ধের আঠারো দিন ধরেই অবিকম্পিত কণ্ঠে পুত্রের কাছে একই কথা বলেছেন — যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

"যখন সব শেষ হয়ে গেল এবং আঠারো দিনের যুদ্ধে দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা নিশ্চিহ্ন হল, দুর্যোধনও ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধে ভগ্নজানু হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত ভয় হল। বিজয়োল্লাসের পরিবর্তে যুধিষ্ঠিরের মনে বিষাদ উপস্থিত হল। তাঁর চিন্তা হল — মহাভাগা তপসান্বিতা গান্ধারী তাঁর পুত্রবধের কথা শুনে কি ভাববেন। কে যাবেন তাঁর কাছে? শেষ পর্যন্ত গান্ধারীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত হলেন।

"তপস্যার বলে এবং ক্রোধদীপ্ত চক্ষু দ্বারা গান্ধারী সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করে ফেলতে পারেন — একথা শ্রীকৃষ্ণও বার বার উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে গান্ধারী স্বীকার করলেন যে শোকাগ্নি তাঁর চিত্তকে বিচলিত করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস বাক্যে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হলেন। কিন্তু তা হলেও তখনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নিজের পরিধেয়বস্ত্রের দ্বারা মুখ ঢেকে পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন।

"গান্ধারীর বিলাপ মহাভারতে এই প্রথম। একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে যে ধর্মপ্রাণা ধৃতব্রতা তপস্বিনী গান্ধারীও পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে রোদন করেন। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ শোককর্ষিতা মাতাকে বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে হস্তিনাপুর থেকে পাণ্ডবশিবির অভিমুখে রওনা হলেন।

কিন্তু গান্ধারী আবার ধৈর্য হারালেন। অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্র এবং শুক্লবস্ত্র-পরিহিতা পুত্রবধূদের নিয়ে, বদ্ধনয়না গান্ধারী কুরুক্ষেত্র-সমরপ্রাঙ্গণে এসেছেন পুত্র-পৌত্রদের খোঁজ নেবার জন্য। 'এবার পুত্রশোকার্তা গান্ধারী পাণ্ডবদের শাপ দিতে উদ্যত হলেন তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস উপস্থিত হলেন ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মতো তিনিও গান্ধারীকে বললেন, গান্ধারীর ভবিষ্যদ্‌বাণী — 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' — ফলেছে। এমন সত্যবাদিনী গান্ধারীর অসত্যভাষণ অসঙ্গত হবে। গান্ধারী পুনরায় আত্মস্থ হলেন এবং কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন — 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।'

''তখন যুধিষ্ঠির গান্ধারীর সামনে এলেন। গান্ধারী আর ধৈর্য রাখতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ আবার গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিলেন। তখন শোককর্ষিতা গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন। পুত্রশোকাতুরা জননীর সন্তানবিয়োগব্যাথা বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন এবং সেজন্যই সেদিন কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে সর্বজনসমক্ষে গান্ধারীর অভিশাপ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। এই অভিশাপ গ্রহণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীচরিত্রকে আরও সমুজ্জ্বল করে গেছেন।

'গান্ধারী বলেছিলেন -- জনার্দন, কেন তুমি এই বিনাশকে উপেক্ষা করলে ? কুরুপাণ্ডবেরা জ্ঞাতি-যুদ্ধে পরস্পরের সর্বনাশ করেছে। কেন তুমি তা দাঁড়িয়ে দেখলে? এই উপেক্ষার ফলে তোমাকেও জ্ঞাতি-বধ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। যেমন ভারতবংশের নারীরা রোদন করছে, তেমনি পুত্র হারিয়ে, স্বজন হারিয়ে, বন্ধু হারিয়ে, যদুবংশের রমণীদেরও ক্রন্দন করতে হবে। আর তুমিও মধুসূদন, আজ থেকে ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর পরে কুৎসিত ভাবে নিহত হবে।''

সত্যনিষ্ঠ গান্ধারীর এই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল।

পনেরো বছর হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের আশ্রয়ে কাটাবার পর ধৃতরাষ্ট্র নির্বেদাপন্ন হলেন।

''গান্ধারী ও বিদুরকে ডেকে ধৃতরাষ্ট্র পরামর্শ করলেন যে হস্তিনাপুরের রাজভোগ পরিত্যাগ করে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ের দিকে মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হবেন। গান্ধারী স্বামীর এই সিদ্ধান্তে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। ঠিক হোল যে কার্তিক মাসের পূর্ণিমার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর ও সঞ্জয় বেরিয়ে পড়বেন মহাপ্রস্থানের পথে। যাবার আগে ধৃতরাষ্ট্র শেষবার রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যেতে চাইলেন। বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মঞ্চের ওপরে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশে সেদিন 'বদ্ধনেত্রা বৃদ্ধা হতপুত্র' তপস্বিনী গান্ধারীও বিদ্যমান। ধৃতরাষ্ট্র নিজের ব্যক্তিগত কথা তো অনেক বললেনই, দুঃখ জানিয়ে প্রকৃতিপুঞ্জের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন! দুর্বৃত্ত পুত্রগণের হয়ে সর্বশেষে বললেন —

ইয়ং চ কৃপণা বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্বিনী।
গান্ধারী পুত্রশোকার্তা যুষ্মান্ যাচতি বৈ ময়া।

শেষ বিদায় নেবার আগে মাতা গান্ধারীও তাঁর পুত্রদের পক্ষ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা

চাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমরা দুজন বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধ মাতা, পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর, শোকবিহ্বল। তোমরা সকলে মিলে আমাদের বনগমন সমর্থন কর। তোমাদের কল্যাণ হোক। আমরা তোমাদের শরণাপন্ন হচ্ছি।

হতপুত্রাবিমৌ বিদিত্বা দুঃখিতৌ তদা।
অনুজানীত ভদ্রং বো ব্রজাবঃ শরণঞ্চ বঃ।।

আমরা কেনই বা আর হস্তিনাপুরের রাজৈশ্বর্য আঁকড়ে থাকব? বনগমনই আমাদের পক্ষে সর্বথা বিধেয়।

মম চান্ধস্য হতপুত্রস্য কা গতিঃ।
ঋতে বনং মহাভাগাস্তন্মান্ননুজ্ঞাতুমর্হথ।।

ধৃতরাষ্ট্রের এবং গান্ধারীর এই করুণ আবেদন শুনে পৌরজানপদ ব্যক্তি যে যেখানে ছিলেন সকলেই শোকপরায়ণ হয়ে বাষ্পসন্দিগ্ধ কণ্ঠে রোদন করতে আরম্ভ করলেন। মুখ দিয়ে বাক্য নির্গত হচ্ছে না। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন —

তেষামস্থিরবুদ্ধিনাং লুব্ধানাং কামচারিণাম্।
কৃতে যাচেহদ্য বঃ সর্বান্ গান্ধারীসহিতোহনঘাঃ।।

বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধ মাতা পুত্রদের অস্থির বুদ্ধি, লুব্ধ এবং কামাচারী বলে স্বীকার করছেন। কিন্তু স্বীকার করেও তাদের হয়ে মার্জনা চাইছেন প্রকৃতিপুঞ্জের কাছে। প্রজাবৃন্দ এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না। কোনও কথা তারা বলছে না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এসেছে। কেবল তারা পরস্পরের দিতে তাকিয়ে আছে —

নোচুর্বাষ্পকলাঃ কিঞ্চিদ্বীক্ষাঞ্চক্রুঃ পরস্পরম্।

অবশেষে বেদনার আবেগ আর বাঁধ মানল না। সমবেত জনগণ উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা এবং যাদের উত্তরীয় নেই তারা কর দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করে পিতামাতার বিরহে মানুষ যেমন কাঁদে তেমনি করে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করল।"

মনে আছে সেদিন কথকের সেই ব্যাখ্যা শুনে আমার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়েছিল এবং বেদনার আবেগ বাঁধ ভেঙেছিল।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর কণ্ঠ সেদিন সত্যই আবেগে ও বেদনায় কম্পমান হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠস্বরে সেদিন পঞ্চপ্রবীণের মহাপ্রস্থানের কাহিনী জীবন্তরূপ ধারণ করেছিল।

"কার্তিকী পূর্ণিমার পরে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে, বর্ধমানদ্বার দিয়ে নির্গত হয়েছেন — ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়। এই তীর্থযাত্রায় সর্বাগ্রে রয়েছেন কুন্তী। কুন্তীর কাঁধে হাত দিয়ে চলেছেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারী এবং গান্ধারীর কাঁধে হাত রেখেছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। ডানদিকে বিদুর, বাঁ দিকে সঞ্জয়। চলেছেন সকলে শেষযাত্রায় — মহাপ্রস্থানের পথে।

"পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁরা এলেন হিমালয়ে শতযূপ আশ্রমে। সেখানে কিছুদিন বাস করার পর ব্যাসদেবের আদেশে তাঁরা চারজন — ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় অগ্রসর হলেন আরো উত্তরে, হিমালয়ের গহন অরণ্যে। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর এর আগেই

যোগবলে প্রাণত্যাগ করেছেন। একদিন সঞ্জয় দৌড়ে এসে খবর দিলেন যে অরণ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছে। শীঘ্র পালানোর ব্যবস্থা করা উচিত। জীবনের শেষ দিনে ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃত মনীষার পরিচয় দিয়েছিলেন। সঞ্জয়কে বলেছিলেন, যেখানে তোমাকে অগ্নি দগ্ধ করবে না তুমি সেখানে চলে যাও। আমরা তিনজন — আমি, গান্ধারী এবং কুন্তী এই স্থান পরিত্যাগ করব না। আমরা এইখানেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে পরাগতি লাভ করব —
বয়মত্রাগ্নিনা যুক্তা গমিষ্যামঃ পরাং গতিম্।

সঞ্জয় তখনই চলে গেলেন হিমালয়ের আরও উত্তরের দিকে। সঞ্জয় সম্বন্ধে এই শেষ কথা মহাভারতে। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী তখনই পূর্বদিকে মুখ করে অগ্নি সামনে রেখে যোগাসনে উপবেশন করলেন। ধীরে ধীরে হিমালয় পর্বতের প্রজ্জ্বলিত দাবানল এগিয়ে এসে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে গ্রাস করে ফেলল এবং তাঁদের দেহ এক মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

"মৃত্যুর দিন গান্ধারীর মুখে একটি কথা নেই। ধৃতরাষ্ট্র কথা বলছেন, কিন্তু গান্ধারী নীরব। মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেন ইচ্ছে করেই এই নীরবতার ছবি এঁকেছেন। সত্যিই গান্ধারীর তো আর কিছু বলবার ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র হুতাশনে প্রাণ বিসর্জন করবার জন্য প্রস্তুত। পতিব্রতপরায়ণী গান্ধারী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন প্রজ্জ্বলিত হুতাশনকে আলিঙ্গন করে।"

মহাভারতের এই আলেখ্য আমার চেতনায় নিত্যলগ্ন হয়ে আছে।।

চাঁদের পাহাড়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী প্রথম পড়েছিলাম ছোটবেলায়। তারপর বারবার পড়েছি। এখনও পড়ি। চাঁদের পাহাড় পড়েছিলাম অল্প পরে। 'চাঁদের পাহাড়' প্রথম বেরিয়েছিল জানুয়ারি ১৯৩৭-এ — আমরা তখন রংপুরে। এবং তখন আমার বয়স সাত। সেই সময় রংপুরে বসে এ-বই হাতে আসার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা কলকাতায় আসি আগস্ট ১৯৩৮ সালে। গোড়ার দিকে রংপুরের জন্যে মন কেমন করত। তারপর যা হয়, কৈশোর ভুলে গেল বাল্যকে। রংপুরের জায়গা নিল কলকাতা। কালীধন ইনস্‌টিটিউশনে ভর্তি হয়ে ভুলে গেলাম রংপুরকে। প্রথমে ছিল লেক রোডে, পরে সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে স্কুল উঠে আসে।

আর সে-সময়েই আমার সেকশনে বাবলির হাতে প্রথম দেখি 'চাঁদের পাহাড়', এবং তারই দাক্ষিণ্যে বইটি প্রথম পড়ি। স্পষ্ট মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী আর বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় অধিকার করেছিল কিশোরচিত্তকে। সেদিনের বাবলি আজ

দর্শনের কৃতবিদ্য অধ্যাপক। কলকাতার উপকণ্ঠে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। সম্প্রতি অবসর নিয়েছে। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আজো অক্ষুণ্ণ। তার পোষাকী নামটা বলব না, সবাই এক ডাকে চিনে ফেলবে। সে আমার স্কুলে প্রাণের বন্ধু।

সেদিনের 'চাঁদের পাহাড়' প্রথম সংস্করণ ছেপেছিলেন এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স। ঠিকানা ছিল অ্যালবার্ট বিল্‌ডিঙ। পরে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদিত 'চাঁদের পাহাড়'-এর একটি ছাত্রপাঠ্য সুলভ সাধারণ সংস্করণ সিগনেট প্রেস প্রকাশ করেছিলেন। এখন আমার হাতে যে সংস্করণ আছে, সেটি পঞ্চম সিগনেট সংস্করণ, চৈত্র ১৩৭৬। দাম আড়াই টাকা। হায়, সেদিনের যে প্রথম সংস্করণ আমার মনোহরণ করেছিল তা আর ফিরে পাব না। যেমন ফিরে পাব না আমার কৈশোরকে।

মনে পড়ে চাঁদের পাহাড় গোগ্রাসে গিলেছিলাম। তখন অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছিল বিভূতিভূষণ কি আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। তখন তো ক্লাস ফোর-এ পড়ি। ভূমিকা পড়ে জেনেছিলাম, লেখক আফ্রিকা যাননি। লেখকের বক্তব্য আত্মকথায় প্রকাশিত হয়েছিল —"চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বইয়ের গল্প ও চরিত্র আমার কল্পনাপ্রসূত। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্য আমি স্যার এইচ. এইচ. জনস্টন, রোসিটা ফরবস্ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে এই গল্পে উল্লিখিত রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা মধ্য-আফ্রিকার অতিপ্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী এবং ডিঙ্গোনেক (রোডেশিয়ান মনস্টার) ও বুনিপের প্রবাদ জুলুল্যাণ্ডের বহু অরণ্যঅঞ্চলে আজও প্রচলিত।"

বিভূতিভূষণ এই ভূমিকা লিখেছিলেন ঠিক ষাটবছর পূর্বে (১লা আশ্বিন ১৩৪৪)। আজ অবাক হয়ে ভাবি সেদিন বিভূতিভূষণ কী অসাধ্য সাধন করেছেন।

ফিরে যাই সেদিনের কথায় -- চাঁদের পাহাড় পড়ার মধুর আস্বাদ ও অভিজ্ঞতায়। টিফিনে ঝালমুড়ি খেতে খেতে বাবলির সঙ্গে চাঁদের পাহাড় নিয়ে আমাদের আলোচনা হতো। বাব্‌লি তখন থেকেই মাতব্বর। গুরুগম্ভীরভাবে আফ্রিকার বর্ণনা দিত। বুঝতে পারতাম, কোনো ইংরেজি ভ্রমণ জার্নাল বা নেচার-জার্নাল পড়ে এইসব কথা বলছে। তবু তা শুনতে ভাল লাগত।

চাঁদের পাহাড় -এর নায়ক গ্রামের ছেলে শঙ্কর। এফ. এ পরীক্ষা দিয়ে গ্রামে বসেছে। ১৯০৯ সালের কথা। হুগলী জেলার গঙ্গার ধারে তাদের গ্রাম। সেখানে থেকে ভদ্রেশ্বর খুব একটা দূরের নয়। সেখানকার এক চেনাবাড়ির জামাই প্রসাদবাবু বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছিলেন আফ্রিকায় ইউগান্ডা রেলওয়ে হেড অফিস কনস্ট্রাকসন ডিপার্টমেন্ট, মোম্বাসা, পূর্ব-আফ্রিকায় রেললাইন পাতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ঐ কোম্পানির কর্মী। অনেকদিন বাদে তিনি দেশে ফিরে ভদ্রেশ্বরে শ্বশুরবাড়ি এসেছেন। শঙ্কর তার সঙ্গে দেখা করল। আফ্রিকায় একটা চাকরির জন্য অনুরোধ করে এলো। নৈহাটি বা জগদ্দলে

পাটকলে কেরানীর চাকুরি করার চেয়ে বিপদসঙ্কুল ইউগান্ডা রেলপাতার কাজে সে যেতে চায়। তাতে বিপদ আছে, উত্তেজনা আছে, রোমাঞ্চ আছে, অ্যাডভেঞ্চার আছে।

টিফিনে বাবলি গম্ভীর ভাবে বললে —ইউগান্ডা কোথায় জানিস? ইস্ট-আফ্রিকায়। চল তোকে ম্যাপ দেখাই।

স্কুলের দপ্তরীকে কিঞ্চিৎ খোসামোদ করে আফ্রিকার গোটানো মানচিত্র খুলে আমরা দুজনে দেখলাম। বাবলি ম্যাপ-পয়েন্ট দিয়ে দেখাল, বলল — এই দ্যাখ, মোম্বাসা, ভিক্টোরিয়া হ্রদ, নায়ানজা হ্রদ। এই দ্যাখ, এই শুঁয়োপোকার মতো রেখাগুলো পাহাড় — কিলিমাঞ্জারো পর্বতমালা, রিখটারস্‌ভেল্ড পর্বতমালা। এইটা টাঙ্গানিয়াকা, এইটা রোডেশিয়া, এইটা সাউথ আফ্রিকা।

বাবলিকে বললাম — আর জ্ঞান দিতে হবে না। চাঁদের পাহাড়-এ অনেক হ্রদ, পর্বত, অরণ্যের বর্ণনা আছে। দাঁড়া ভালো করে পড়ি। তারপর তোকেই আমি বুঝিয়ে দেব।

বাবলি চাঁদের পাহাড় পড়তে দিয়েছিল বলে সেদিনের ঝালমুড়ির পয়সা আমিই দিয়েছিলাম।

শঙ্কর ছেলেটি ডানপিটে। চাঁদের পাহাড়-এর নায়ক। লেখক তাকে আফ্রিকা পাঠাবার পূর্বে তৈরি করে নিয়েছিলেন। সে কেবল সাহসী অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় নয়, তা ছাড়া আরো গুণ আছে। সে ফুটবলে, সাঁতারে, বক্সিং-এ, শারীরিক কসরতে নিপুণ। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে দক্ষ। বড় বড় ভূগোলের বই পড়া, ভূগোলের অঙ্ক কষা, ম্যাপ পড়া, নক্ষত্রমণ্ডল চেনায় নিপুণ। ভূগোল, নক্ষত্রমণ্ডল আর অরণ্যপ্রকৃতি সম্পর্কে পুরনো ম্যাগাজিন সস্তায় কিনে এনেছে। গ্রামে বসে সেইসব পড়ে আর ভাবে কবে সে বিদেশে যাবে।

চাঁদের পাহাড় বইটা শুরু করলে ছাড়া মুশকিল। সেকথা যেদিন প্রথম পড়ি সেদিন মনে হয়েছিল। আজও মনে হয়। গ্রামের বাড়িতে সন্ধ্যায় প্রদীপের মৃদু আলোতে শঙ্কর পড়ছিল ওয়েস্টমার্কের ইংরেজিতে লেখা বড় ভূগোলের বইখানা। বইটির একটি অংশ শঙ্করকে মুগ্ধ করে, আবিষ্ট করে। প্রসিদ্ধ জার্মান ভূপর্যটক অ্যান্টন হাউপ্টম্যান লিখিত আফ্রিকার একটা বড় পর্বত মাউনটেন অফ দ্য মুন (চাঁদের পাহাড়) আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ। কতবার শঙ্কর এটা পড়েছে। কতবার ভেবেছে সে হাউপ্টমানের মতো সেও একদিন যাবে মাউনটেন অফ দ্য মুন জয় করতে।

সে রাতে শঙ্কর বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল। "চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনো হাতির দল মড় মড় করে বাঁশ ভাঙছে। সে আর একজন কে তার সঙ্গে। দুজনে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে উঠেছে। চারধারের দৃশ্য ঠিক হাউপ্টম্যানের লেখা মাউনটেন অফ দি মুনের দৃশ্যের মতো। সেই ঘন বাঁশ বন, সেই পরগাছা ঝোলানো বড়-বড় গাছ, নিচে পচাপাতার রাশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ের খালি গা, আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া শাদা ধবধবে চিরতুষারে ঢাকা পর্বত-শিখরটি এক-একবার দেখা যাচ্ছে। এক-একবার বনের

আড়ালে চাপা পড়ছে। পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে-ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতির গর্জন শুনতে পেলে....সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল .... এত বাস্তব বলে মনে হল সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার উপর উঠে বসল, ভোর হয়ে গিয়েছে। জানালার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেছে।''

লেখকের গল্পবিন্যাসের কৃতিত্ব এইখানে যে এই স্বপ্ন দেখার কয়েক মাসের মধ্যে শঙ্কর এই চাঁদের পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছেছে। সেই নিরুদ্দিষ্ট ভদ্রলোক প্রসাদবাবুর খোঁজ পেয়েছে তার শ্বশুরবাড়িতে। শঙ্কর তাকে চিঠি লিখেছে। তিনি শ্বশুরবাড়ি ভদ্রেশ্বর এসেছেন অনেককাল বাদে। শঙ্কর তার সঙ্গে দেখা করেছে। আফ্রিকায় রেলপথ পাতার কাজে যোগ দিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। চারমাস পরে শঙ্কর জাহাজে করে মোম্বাসা পৌঁছেছে। সেখান থেকে সাড়ে তিনশ মাইল পশ্চিমে ইউগান্ডা রেলওয়ের নুডসবার্ন স্টেশন থেকে বাহাত্তর মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে শঙ্কর কনসট্রাকশন ক্যাম্পের কেরানি ও সরকারি স্টোরকিপার হয়ে এসেছে। চারদিকে মাথা সমান উঁচু লম্বা লম্বা ঘাস। বহুদূরব্যাপী মুক্তপ্রান্তর। মাঝে মাঝে কয়েক শ বছর বয়সী বাওবাব গাছ। একটা খোলা জায়গায় চক্রকারে সাজানো তাঁবুর সারি। শঙ্কর সেখানেই থাকে।

শঙ্কর কোথায় থেকে কোথায় চলে এসেছে। তার মন নতুন দেশ, বিপজ্জনক পরিবেশে জেগে ওঠে। ইউগান্ডার এই নির্জন মাঠ, ঘাসভরা জমি আর অরণ্য তাকে এক নতুন আনন্দ দেয়।

লেখকের বর্ণনা এত বস্তুনিষ্ঠ যে মনে হয় তিনি সে জায়গায় অনেকবার গেছেন।

শঙ্কর তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ত, নির্জন মাঠ লম্বা ঘাস অরণ্যে তার স্বপ্নতে খুঁজে বেড়াত। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন — শোনো রায়, ওরকম বেড়িও না। বিনা বন্দুকে এক পা-ও যেও না। পথ হারিয়ে মারা যেতে পার। আবার সিংহের দেশ ইউগান্ডায় সিংহের কবলে পড়তে পারো।

ক'দিন বাদে রেলপাতার জায়গার তাঁবু থেকে কিছুদূরে লম্বা ঘাসের জমির মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠের কাতর আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই ছুটল। সাহেব বন্দুক নিয়ে গেল। কুলিদের নাম ডাকা হলো একজন নেই। সাহেব বন্দুক নিয়ে লোকজন সঙ্গে করে পায়ের দাগ দেখে অনেক দূর গিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলির রক্তাক্ত দেহ বার করলেন। সিংহ লোকজনের চিৎকারে শিকার ফেলে পালিয়েছে। সন্ধের আগেই কুলিটা মারা গেল।

শুরু হল শঙ্করের জীবনে এক নতুন অধ্যায়। ভয়ংকর সুন্দর বিপজ্জনক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

শঙ্করের জীবনে ঐ ভোরের স্বপ্ন কীভাবে সফল হল লেখক অনায়াসদক্ষতায় তা দেখিয়েছেন। মনে পড়ে সেদিন কৈশোরের রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে পড়েছি শঙ্করের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। আজ বুঝি বিভূতিভূষণ কী অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন 'চাঁদের পাহাড়'-এ। তিনি না-দেখা জায়গা পাঠকের সামনে জীবন্ত ছবির মতো তুলে

ধরেছেন।

আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, কৈশোরে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীগুলি গিলতাম। চাঁদের পাহাড়-ও গিলেছিলাম।

কোথায় পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলার গঙ্গাতীরবর্তী এক পশ্চাৎপদ গ্রাম আর কোথায় আফ্রিকার নির্জন বনভূমি। শঙ্কর একটার পর একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। স্পষ্ট মনে পড়ে বাবলি বইটি ফেরত চাইলে অনুনয় করে আরো কয়েকদিনের জন্য রেখেছিলাম। সিংহ আর সাপ-অধ্যুষিত নির্জন স্টেশনে একা স্টেশনমাস্টার শঙ্করের অভিজ্ঞতা সেদিন কিশোরচিত্তকে লুঠ করে নিয়েছিল। ইউগান্ডা রেলপথের কিসুমু থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোট স্টেশনে শঙ্কর স্টেশনমাস্টারের কাজ পেয়ে চলে গেল। এমন নির্জন স্থান শঙ্কর কখনো দেখেনি। সে-ই একমাত্র কর্মী। সে-ই কুলি, সে-ই পয়েন্টসম্যান।

স্টেশনের চারধার ঘিরে ধূ-ধূ সীমাহীন প্রান্তর, দীর্ঘ ঘাসের বন, মাঝে ইউকা, বাবলা গাছ, দূরে পাহাড়ের সারি সারা চক্রবাল জুড়ে। ভারি সুন্দর দৃশ্য।

শঙ্কর একা। আর কোনো মানুষ নেই। বিভূতিভূষণের সাদাসিধে বর্ণনা উত্তেজনার তুঙ্গে পৌঁছে দেয় রোমাঞ্চকর কিশোরমনকে।

"রাত বেশি না হতেই আহারাদি সেরে শঙ্কর স্টেশনঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে ডায়েরি লিখছে। স্টেশন ঘরেই সে শোবে। সামনের কাচ-বসানো দরজাটি বন্ধ আছে কিন্তু আগল দেওয়া নেই, কিসের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে চেয়ে দেখে দরজার ঠিক বাইরে কাচে নাক লাগিয়ে প্রকাণ্ড সিংহ। শঙ্কর কাঠের মতো বসে রইল। দরজা একটু জোর করে ঠেললেই খুলে যাবে। সেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। টেবিলের উপর কেবল কাঠের রুলটা আছে মাত্র।

সিংহটা কিন্তু কৌতুকের সঙ্গে শঙ্কর ও টেবিলের কেরাসিন বাতিটার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খুব বেশিক্ষণ ছিল না। হয়তো মিনিট দুই। কিন্তু শঙ্করের মনে হল সে আর সিংহটা কতকাল ধরে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সিংহ ধীরে ধীরে অনাসক্তভাবে দরজা থেকে সরে গেল। শঙ্কর হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার আগলটা তুলে দিল।"

আশ্চর্য, শঙ্করের অভিজ্ঞতা। তারচেয়ে আশ্চর্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশল উপস্থাপনা। মনে হয় কিছুদিন আগে ইউগান্ডা বেড়িয়ে এসে লিখছেন আর কিশোরচিত্তে অ্যাডভেঞ্চারের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। সহজ বিস্ময়দৃষ্টি। তার ভিত্তি সততা ও বস্তুনিষ্ঠা, সেই সঙ্গে কবিসুলভ এবং শিশুসুলভ নিসর্গরহস্য-অনুভূতি আর রহস্য-অভিযানের প্রতি আকর্ষণ — এই নিয়েই তো সৃষ্টি হয় শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য। চাঁদের পাহাড়-এ তা প্রচুর পরিমাণে আছে। সেদিন এভাবে নিশ্চয়ই বিচার করিনি, কিন্তু আজ বুঝি এইসব উপাদানই আমাদের মুগ্ধ ও আবিষ্ট করেছিল।

তাই শঙ্করের দুঃসাহসিক অভিযান ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় আমরা সাড়া দিয়েছিলাম। সেদিন স্টেশনমাষ্টার শঙ্করের অভিজ্ঞতা আমাদের কিশোরচিত্তে অনুরণন তুলেছিল।

"সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে স্টেশনঘরে ঢোকে — অনেক রাত পর্যন্ত বসে পড়াশুনো করে বা ডায়েরি লেখে। রাত্রের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে। প্ল্যাটফর্মের ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্য দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে, এক-একদিন গভীর রাতে দূরে কোথায় সিংহের গর্জন শুনতে পাওয়া যায় — অদ্ভুত জীবন।

ঠিক এই জীবনই সে চেয়েছিল। এ তার রক্তে আছে। এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি, অচেনা নক্ষত্রে ভরা আকাশ, এই বিপদের আশঙ্কা — এই তো জীবন। নিরাপদ শান্তজীবন নিরীহ কেরানির হতে পারে — তার নয়।"

আজ স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিন এইসব লাইন কিশোরচিত্তে আগুন জ্বালিয়ে দিত।

কেবল সিংহ নয়, ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ ব্ল্যাক মাম্বা আছে শঙ্করের আশেপাশেই। কীভাবে রাতে স্টেশনঘরের মধ্যে ব্ল্যাক মাম্বার মুখোমুখি হয়ে শঙ্কর রক্ষা পেল, তার রোমহর্ষক — সত্যিকারের রোমহর্ষক — বিবরণ পড়ে সেদিন কিশোরচিত্ত উদ্দীপ্ত হতো।

চাঁদের পাহাড়ে আছে পদে পদে রোমাঞ্চ, পদে পদে ভয়জাগানো শিহরন, পদে পদে অ্যাডভেঞ্চার, আর গল্পের প্রচণ্ড টান। সেদিন এতো কথা ভাল করে বুঝিনি। কিন্তু এইসব উপাদানের সমবায়ে বিভূতিভূষণ যে অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী পরিবেশন করেছিলেন, তা আমাদের জিতে নিয়েছিল।

এর পরই এলো শঙ্করের জীবনে নতুন পর্ব। স্টেশন থেকে একটু দূরে গাছের তলায় পড়েছিল মরণাপন্ন দিয়েগো আলভারেজ। জাতে পর্তুগীজ, পেশায় ছিল ধাতুবিদ ইঞ্জিনিয়ার, তার নেশা পর্যটন — চাঁদের পাহাড়ে স্বর্ণসন্ধান। তাকে গাছতলা থেকে তুলে নিয়ে এসে শুশ্রূষা করে বাঁচালো শঙ্কর। দিয়েগো আলভারেজের জীবনকাহিনী শুনে শঙ্কর বুঝলো আসল অ্যাডভেঞ্চার কাকে বলে। বাইশবছর আগে —১৮৮৮-৮৯ সালে আলভারেজ আরেক অভিযাত্রী জিম কার্টারের সঙ্গে কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনির সন্ধান করে বেড়িয়েছে। সেই কাহিনী শুনে শঙ্কর এতই উত্তেজিত হল যে স্টেশনমাস্টারের চাকরি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল, মাভো স্টেশনে বদলি-লোক পাঠাবার জন্য খবর পাঠাল।

তারপর দিন দশেক পরে দুজনে কিসুমু গিয়ে ভিক্টোরিয়া নায়নজা হ্রদে স্টিমার চড়ে দক্ষিণ মুখে মোয়ানজার দিকে রওনা হল। শুরু হল নতুন অ্যাডভেঞ্চার।

আমার বন্ধু বাবলি আফ্রিকার মানচিত্রে আঙুল রেখে গম্ভীরভাবে বলত — এই দ্যাখ নায়ানজা হ্রদ, ভিক্টোরিয়া হ্রদ, এই দ্যাখ মহাদুর্গম রিখটারসভেল্ড পর্বতশ্রেণী। শুঁয়োপোকার মতো দাগ — এটাই তো পর্বতমালা। আর সরু নীল রেখা নদী, সরু নীল ফুটকি বিশাল হ্রদ।

একদিন জিম কার্টার ও দিয়েগো আলভারেজ ঐ পর্বতমালার নীচে বনময় উপত্যকায় ছোটনদীতে ভেসেআসা হলদে রঙের ছোট পাথর পেয়েছিল। সেটাই সোনা। তার কিছুদিন পরে ঐ মহারণ্যে আফ্রিকার ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু বুনিপের ধারালো নখের আঁচড়ে মারা গেল কার্টার। বুনিপকে কেউ দেখে নি, কিন্তু তার নাম শুনলে কাফ্রিদেরও ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়।

চাঁদের পাহাড় লেখকের সবচেয়ে কুশলতা এই কিশোরচিত্তকে তিনি অজানা ভয়ংকরের পথে অবলীলায় টেনে নিয়ে যেতে পারেন। চাঁদের পাহাড় একা পড়ে মজাটা পুরো পাওয়া যায় না। বাবলি আর আমি ছুটির দিনে একসঙ্গে বসে পড়া শুরু করলাম। আজো সেই রোমাঞ্চের আস্বাদ মনে থেকে গেছে।

উজিজি বন্দর থেকে শঙ্কর আর আলভারেজ স্টিমারে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদে ভাসল। হ্রদ পার হয়ে অ্যালবার্টভিল নামের ছোট শহরে নামল। সেখান থেকে বেলজিয়ান গভর্নমেন্টের রেলপথে কাবালো। সেখান থেকে কঙ্গোনদীতে স্টিমারে চলে তিনদিনের পথ সানকিনি। সানকিনিতে নেমে কঙ্গোনদীর পথ ছেড়ে, দক্ষিণ মুখে বনজঙ্গল ও মরুভূমির দেশে দুজনে রওনা হল।

বাবলি আর ম্যাপে সব জায়গা নদী হ্রদ জঙ্গল মরুভূমি খুঁজে পায় না। আমরা বুঝলাম আমাদের স্কুলে ছোট অ্যাটলাসে এসব জায়গার নাম উল্লেখমাত্র নেই। ডিয়েগো আলভারেজের কাছে একটি ছোট ম্যাপ ছিল — হাতে আঁকা। সেইটা ধরে শঙ্কর আর আলভারেজ রিখটারসভেল্ড পর্বতমালার শিরা পেয়ে চলতে শুরু করল

পড়তে পড়তে আমরা দুই বন্ধু থেমে যাই। লেখকের মন্তব্য বারবার পড়ি :

"রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা ভারতের দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় নয় — এদেশের মাসাই, জুলু, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতোই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংস-লোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না।"

শঙ্কর আর আলভারেজ সানকিনি থেকে পায়ে হেঁটে নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানীতে প্রবেশ করল। নির্জন, বিশাল অরণ্য। একটা বড় পাহাড়ে পাদমূলে সে অরণ্য। এই পর্বত আসল রিখটারসভেল্ডের বাইরের থাক্। এই বিশাল অজানা অরণ্যের ঠিক কোন জায়গায় কার্টার আর আলভারেজ এসে ছোটনদীর বালিতে পাথরে আটকে থাকা হলদে হীরে পেয়েছিল, তা খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য। দুজনে সেই দুঃসাধ্য সন্ধানেই বেরিয়েছে। রোডেসিয়ার মনস্টার ডিঙ্গোনেকের গল্প শুনিয়েছে আলভারেজ। রাতে তাঁবুতে আলো জেলে রাইফেল হাতে সতর্ক হয়ে বসে গা ছম-ছম করা পরিবেশে শঙ্কর সেই গল্প শুনেছে।

আরো সাত দিন নিবিড় অরণ্যে চলবার পর টুসকঘাসের বন আর কুয়াশার মধ্যে হঠাৎই চোখের সামনে ভেসে উঠল খুব বড় একটা চড়াই। নিবিড় কুয়াশায় মেঘে তার উপরদিকটা আবৃত। আলভারেজ বলল—রিখটারসভেল্ডের আসল রেঞ্জ। যে নদীর ধারে হলদে হীরে পেয়েছিল আলভারেজ আর কার্টার, তার গতি পুব থেকে পশ্চিমে। তাকে

পেতে হলে এই পর্বত পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। শুরু হল দুজনের পাহাড়ে চড়া।

সাড়ে সাত হাজার ফিট উপরে রাতে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম নিতে নিতে শঙ্করের মনে হল, এ যেন সৃষ্টির আদিম যুগের অরণ্যানী। সাতদিন পরের রাতে ভয়ংকর হিংস্র অচেনা জন্তু বুনিপের হাতে মারা পড়ল আলভারেজ। প্রবল বর্ষণে ঘন আঁধারে পথহারা শঙ্কর বিপদসঙ্কুল পথের বন্ধু, একমাত্র সঙ্গী আলভারেজকে সমাধি দিল।

শঙ্কর এখন একা, দুঃসাহসে মরিয়া। হাতে আছে কম্পাস। আর টোটাভরা দুটি রাইফেল। কীভাবে এই ঘন অরণ্য পেরোবে। হঠাৎ তার মনে পড়ল আলভারেজের একটা কথা। সলসবেরি এখান থেকে পুব-দক্ষিণ কোণে আন্দাজ ছশো মাইল।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার রাজধানী সলসবেরি। শঙ্করকে সেখানে পৌঁছতেই হবে। নইলে সে এই অরণ্যে মারা পড়বে। দুটো-তিনটি ছোট পাহাড় পেরিয়ে, রাতে গাছের ডালে শুয়ে বেবুন আর হায়েনার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে শঙ্কর এগোতে লাগল। পঞ্চম দিনে একটা পাহাড়ের তলায় এসে একটা প্রকাণ্ড গুহার মুখে পৌঁছল। একটি ক্ষীণ জলস্রোত গুহার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। সেই গুহার অন্ধকারে ঢুকে শঙ্কর চলতে শুরু করলে। অনেক নুড়িপাথর নিয়ে পথচিহ্ন রাখল, যাতে সে ফিরতে পারে। দুদিন দুরাত পরে গুহা থেকে শঙ্কর পেরোতে পারল। যেগুলি নুড়িপাথর ভেবেছিল, সেগুলিই হীরে।

গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ম্যাপ দেখে শঙ্কর বুঝল সে রয়েছে কালাহারি মরুভূমির এক প্রান্তে। এটা পেরোতে পারলেই সে সলসবেরি পৌঁছবে। খাদ্য নেই, জল নেই, পথচিহ্ন নেই, ভয়ঙ্কর মরুভূমি। রাতে আলো জ্বেলে সে যখন বসে থাকে তখন দেখে নেকড়ের দল অদূরে বসে আছে। তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। এই বিপদ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত শঙ্কর রক্ষা পেল। ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক জরিপ করবার দল কালাহারি মরুভূমির উত্তর-পূর্বকোণে তাঁবু ফেলেছিল। শঙ্করের ভাগ্যক্রমে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে সে রক্ষা পেল। তারপর সলস্‌বেরি।

শঙ্কর বেঁচে ফিরে এল। সঙ্গে কয়েকটি হীরে। দেশে ফিরল। কিন্তু সে ভাবে আবার আফ্রিকায় যাবে। লেখক এই দুঃসাহসিক অভিযানকাহিনীর শেষে একটি প্রাচীন চীনা ছড়া শুনিয়েছেন —

''ছাদের আল্‌সের চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফটিক পাথর হয়ে ভেঙে যাওয়া অনেক ভালো, অনেক ভালো, অনেক ভালো।'

চাঁদের পাহাড় বা রিখটারসভেল্‌ড পর্বতে জীবনমৃত্যু নিয়ে শঙ্কর যে ছিনিমিনি খেলেছিল, সেই কাহিনী কৈশোরে আমাকে উজ্জীবিত করেছিল, আজো করে।।